

182. Pr. 928-4.

ভারত অতীত ও বর্তমান

569

11.2.29.

928.4.

স্বামী অভেদানন্দ



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত

বাঁধাই ১০ পাঁচসিকা]

[মূল্য ১৮ এক টাকা]

182. Pr. 928-4.

ভারত অতীত ও বর্তমান

569

11.2.29.

928.4.

স্বামী অভেদানন্দ



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত

বাঁধাই ১০ পাঁচসিকা]

[মূল্য ১৮ এক টাকা]

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির-হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত

Copy-righted by
THE SWAMI ABHEDANANDA,
President,
Ramakrishna Vedanta Society.



কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

বসুমতী-বৈদ্যতিক-রোটারী-ঘন্টে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত



স্বামী অভেদানন্দ



উৎসর্গ

ভারতের প্রাচীন গৌরব

এবং

জাতীয় স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে

পাক্ষীর সহানুভূতি।

এবং

ঐকান্তিক প্রার্থনা সহকারে

ভারতবাসীর করকমলে

উপহৃত হইল :

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রথম ছয়টি প্রবন্ধ ‘ক্লকলিন ইন্সটিটিউট অফ্‌ আর্টস্‌ এণ্ড সায়েন্সেস’র গৃহ-প্রাঙ্গনে বক্তৃতাকারে পঠিত হইয়াছিল। হিন্দুনারীর আদর্শ সম্বন্ধে তখন বিস্তৃতভাবে বলিবার অবকাশ না পাওয়ায় আমি “হিন্দুধর্মে নারীর স্থান” শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র বক্তৃতা সংযোজিত করিয়া আমার বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসীবৃন্দ সম্বন্ধে আমেরিকা-বাসীর মনে যে ভ্রান্ত-ধারণা বিद्यমান, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য আমি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ন্যায় সকল বিষয়ের তথ্য বিবৃত করিয়াছি—আমার উহাই প্রধান উদ্দেশ্য। আমি হিন্দু, আমেরিকান এবং যুরোপীয়গণের উক্তি আমার বিবৃতির স্বপক্ষে উদ্ধৃত করিয়াছি। এ জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট ঋণী। বিশেষতঃ মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, মহোদয়ের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। তিনি তাঁহার রচিত “প্রাচীন ভারতের সভ্যতা” “ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাস” এবং “ভিক্টোরিয়া যুগের ভারতবর্ষ” প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইংলণ্ডে বসিয়া যে সকল মূল্যবান তথ্য প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি অনেক ক্ষেত্রে তাহা আমার বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

নিউইয়র্ক ;
১৫ই মে, ১৯০৬

গ্রন্থকার

পূর্বাভাষ

ভারতবর্ষ এবং সমুদ্রপারবর্তী দেশসমূহে ধর্মের নব অভ্যুদয় আন্দোলনের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই স্বামী অভেদানন্দের নামের সহিত সুপরিচিত। সমুদ্রপারে বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তপ্রদেশে স্বামীজী তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ বেদান্ত-ধর্মের ব্যাখ্যা, শিক্ষা ও প্রচার-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল! তিনি যে জনপ্রিয় প্রচারক, বেদান্ত-দর্শনের সুবিজ্ঞ শিক্ষক এবং বিশিষ্ট গ্রন্থকার, এ সম্বন্ধে তাঁহার মার্কিনে ও ইউরোপে প্রভূত সুনাম আছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতা ও ভাবধারার বৈশিষ্ট্যরক্ষার পক্ষপাতী, তিনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন মহা শক্তিধর এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। তাঁহার হৃদয় সর্বক্ষণই ভারতের কল্যাণ-কামনায় অবহিত। বিক্রমদলের তীব্রতন্ত্র সমালোচনা, বর্ণ ও জাতি-বিদ্বেষ এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিক্রমবাদিতার সহিত স্বামীজী নিভীক-হৃদয়ে বিপুল উৎসাহভরে মাতৃভূমির জন্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা, গীতা, উপনিষদ, দর্শনশাস্ত্র—অধ্যাপনাকালের সুচিন্তিত ব্যাখ্যা এবং বৈঠকী আলোচনার ফলে আমেরিকাবাসীর ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে বন্ধমূল ও ভ্রান্ত সংস্কার বহুলাংশে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

তঁাহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান ও বাগ্মিতা সমগ্র আমেরিকায় এত দ্রুত প্রচারিত হইয়াছিল যে, অনেক সময় তঁাহাকে তত্রতা বিশ্ববিদ্যালয়, সমিতি, ক্লাব, ধর্মমন্দির (Church) প্রভৃতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ আসিত। তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলে শ্রোতৃবৃন্দ আগ্রহভরে ও শ্রদ্ধাসহকারে তঁাহার বক্তব্য শ্রবণ করিত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে ক্রকলীন ইন্সটিটিউট অফ্‌ আর্টস্‌ এণ্ড সায়েন্সের ডিরেক্টর দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীজী ভারতীয়-দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-সভ্যতার হিন্দু-সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই আলোচনা কালে তিনি তথাকথিত সত্যবাদী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ও তঁাহাদের সুযোগ্য মতানুবর্তী ভারতীয় খৃষ্টানগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে যঁাহারা কদর্য্য ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিত এবং জঘন্য উক্তি দ্বারা হিন্দুর নিন্দাবাদ প্রচার করিত, তিনি যুক্তি ও প্রজ্ঞাবলে তাহাদিগের সকল প্রকার বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করিয়া নির্বাক করিয়া দিয়াছিলেন। তঁাহার সুস্পষ্ট এবং অখণ্ড যুক্তির নিকট সকলকেই নত হইতে হইয়াছিল। তঁাহার বক্তৃতা, আলোচনা শুনিবার পর মার্কিণগণ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। ভারতমাতার ভক্ত সন্তান, নিজ জন্মভূমির দুর্দশা দর্শনে অনাচার-নিপীড়িত দেশবাসীর

শোচনীয় অবস্থায় মর্মে মর্মে বেদনা বোধ করিয়া আমেরিকা-বাসীর নিকট প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেন। তাহার ফলে বহু আমেরিকাবাসীকে তাঁহাদের দীর্ঘকালের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সাধারণ ধারণার সংস্কার সাধন করিতে হইয়াছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের উল্লিখিত বক্তৃতানিচয় ও “হিন্দুধর্মে নারীর স্থান” শীর্ষক একটি বক্তৃতা সংগ্রহ করিয়া ‘নিউইয়র্কের’ বেদান্ত-সমিতি “ভারত ও ভারতবাসী” (India and Her People) নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন।

“ভারত অতীত ও বর্তমান” নামক গ্রন্থখানি সেই মার্কিন সংস্করণের মূল গ্রন্থখানির অনুবাদ। এই গ্রন্থে বহু রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ নানা অবস্থার ভিতর দিয়া পরিবর্তিত হইতেছে, সুতরাং সে সকল প্রতিষ্ঠানের অবস্থাও তদনুরূপ। ব্যক্তি, পক্ষা এবং প্রতিষ্ঠান-সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল মন্তব্য তখন প্রচার করিয়াছিলেন, এখন সম্ভবতঃ তাহা সুপ্রযুক্ত বলিয়া মনে হইবে না ; কিন্তু তথাপি সে সকল মন্তব্য অব্যাহতই আছে—পরিবর্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই, কারণ, উহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং স্বামীজীর মতামত জনৈক সমসাময়িক ভারতীয় দেশ-প্রেমিকের মন্তব্য বলিয়া সেগুলি অনুধাবন-যোগ্য। উল্লিখিত অংশগুলি অব্যাহত রাখিবার আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, ভারতমাতার অন্যান্য ভক্ত-সন্তানের ন্যায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য ভ্রমপ্রমাদশূন্য। কারণ, দেখা

যাইতেছে যে, স্বামীজী দেশের শাসননীতির পরিবর্তনসাধনের
জন্য যে সকল হেতুবাদ দেখাইয়াছিলেন, আমাদের শাসকগণ
অম্লরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া বর্তমানে শাসনযন্ত্রের সংস্কার
করিয়াছেন।

আমরা আশা করি, এ দেশের পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ সাদরে
গ্রহণ করিবেন, কারণ, ইহাতে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে বহু মূল্যবান
সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক ভারত-সন্তানের সে
সকল সংবাদ জানা প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সমিতি
৬ই জুলাই, ১৯২৮
কলিকাতা

ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্য

ভারত—অতীত ও বর্তমান

প্রথম অধ্যায়

প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ

খৃষ্টীয় যুগের বহু শতাব্দী পূর্বে, এমন কি, ইহুদী প্রবর্তকের (Moses) আবির্ভাব ও তাঁহার ধর্মপ্রচারেরও বহু পূর্বে, যখন বর্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব-পুরুষগণ গুহামধ্যে এবং অরণ্যময় ভূভাগে বাস করিতেন, বিবিধ বর্ণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিয়া অপক পশুমাংস ভক্ষণ করিতেন, পশুচর্মে দেহাচ্ছাদন করিতেন,—সেই সুদূর অতীতেও ভারতে প্রকৃত সভ্যতার দিব্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভারতই তখন ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইত।

তৎপূর্বেই প্রাচীন বৈদিকযুগের ঋষিগণের প্রসাদে, তাঁহাদের প্রণীত মহান্ নীতিবিজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া

যখন মোজেস (Moses) ঈজ্রেলের (Israel) উদ্যম ভ্রমণপরায়ণ গৃহহীন জাতিগণের নৈতিক সংস্কার হেতু জাভের (Jahveh) উচ্চারিত দশবিধ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বেই ভারতীয় নীতিবিজ্ঞানের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, নীতি প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। যখন সেমিটিক (Semetic) জাতীয় মনীষিগণ চ্যালডিয়া, ফিনিসিয়া, বাবিলোনিয়া ও পারস্যবাসিগণের সংগৃহীত সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় উপকথা পরম্পরা হইতে মানবজাতির উদ্ভব ও বিশ্বসৃষ্টির বর্ণনায় প্রয়াস পাইতেছিলেন, তৎপূর্বেই ভারতের আর্য্য-বংশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ আত্মশক্তি প্রকৃতি হইতে জগতের ক্রম-বিকাশ এবং নিম্নশ্রেণীর পশুযোনি হইতে ক্রমশঃ মানবের উৎপত্তির বিবরণ প্রচার করিয়াছিলেন।

অনেকের ধারণা, ভারতের অধিবাসিবৃন্দ পৌত্তলিক ; ইহাদিগের দর্শন, নীতিশাস্ত্র, বিজ্ঞান কিংবা ধর্মশাস্ত্র আদৌ নাই ; এ বিষয়ে ইহারা খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের প্রসাদলাভেই ধন্ত হইয়াছেন। কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো নগরে যে দিন পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসভ্যের বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই এ দেশের (আমেরিকা) শিক্ষিত নর-নারী সে ভ্রান্ত ধারণা বিসর্জন দিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ভারতবর্ষই পৃথিবীর যাবতীয় দার্শনিক তত্ত্বের মূল

উৎসস্বরূপ এবং ভারত হইতেই জগতের সর্বপ্রকার ধর্মচিন্তা প্রথম উদ্ভূত হইয়াছে। অধ্যাপক মোক্ষমূলার (Max Muller) এবং পল ডাসেন (Paul Duesson) প্রমুখ প্রাচ্য বিজ্ঞাবিৎ মনীষিগণ এবং আমেরিকার শিক্ষিত সম্প্রদায় এক্ষণে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতই এক বিরাট দার্শনিক জাতির জন্মভূমি, এবং পৃথিবীর কি প্রাচীন কি আধুনিক যাবতীর দার্শনিক তত্ত্বই অত্যাপি ভারতে বিद्यমান। ইউরোপীয় দর্শনতত্ত্বের ইতিহাসজ্ঞ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুজঁয়া (Victor Cousin) লিখিয়াছেন :—

“যখন আমরা প্রাচীর বিশেষতঃ ভারতের কাব্য ও দর্শনের গৌরবময় অমরতত্ত্ব সমূহ পাঠ করিয়া থাকি, যে সকল তত্ত্ব ক্রমশঃ ইউরোপে এক্ষণে প্রচারিত হইতেছে, তখন আমরা তাহাতে এমন মহান্ ও গভীর সত্য সকল দেখিতে পাই যে, তাহাদের তুলনায় অধিকাংশ স্থলেই ইউরোপীয় প্রতিভার শ্রমলব্ধ ফল অতীব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় এবং আমরা বাধ্য হইয়া প্রাচ্য দর্শনের সম্মুখে নতজানু হই, ও মনুষ্যজাতির প্রথম আবাসভূমি এই প্রাচীতেই মহত্তম দর্শনের বিকাশ দেখিতে পাই।”

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, “দর্শনের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সার এক ভারতেই প্রাপ্তব্য।”

জাতীয় জীবনে ধর্ম ও দর্শন যেক্রমে প্রভাব বিস্তার
করিয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোন দেশে
নাই। একমাত্র এই ভারতেই খৃষ্টপূর্ব প্রায় দুই সহস্র
বৎসর পূর্বে সাধারণ সভায়, দার্শনিক তত্ত্বের বিচার-
স্থলে ধর্মসম্বন্ধে নৃপতিগণ সভাপতির স্থান অলঙ্কৃত করি-
তেন। এই সকল সভা ও সম্বন্ধে কেবল ধর্মযাজকগণ,
দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণই যোগদান করিতেন না,
রাজগণ, সেনানায়ক ও সৈনিকগণ, বণিক, কৃষক, এমন
কি, উচ্চশ্রেণীর বিদুষী মহিলাগণ পর্যন্ত আসিয়া সোৎ-
সাহে সভার কার্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। খৃষ্ট-
পূর্ব ৫০০০ বৎসর হইতে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বৎসরমধ্যে
অর্থাৎ সেই সুদূর বৈদিকযুগেও যোগমার্জিতবুদ্ধি প্রাচীন
ঋষিগণ যে সকল গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন,
তাহার মীমাংসায় ও সমাধানে সর্বযুগের দর্শনবেত্তা
পণ্ডিতগণের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। তাঁহারা
কি প্রকার ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, পদার্থের প্রকৃত সত্তা
ও প্রকৃতি বিষয়ে তাঁহাদিগের কিরূপ গভীর জ্ঞান ছিল,
ঐ সকল প্রশ্ন হইতেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি।
তাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“যখন কাল সমগ্র জগৎ
গ্রাস করিবে, তখন কোন্ দেবতা আসিয়া কালকে গ্রাস
করিবেন?” “মনুষ্যের কোন্ অংশ তাহার মৃত্যুর পরেও
থাকিয়া যায়?” “মৃত্যুর পর মনুষ্যের জীবনী-শক্তির কি

অবস্থা হয় ?” * “আত্মার স্বরূপ কি ?” “ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও স্থিতির কারণ কোথায় ?” “সত্তার মূল তত্ত্ব কি ?” “সকল পদার্থের নিয়ন্তা হইয়াও যে স্বয়ং নির্লিপ্ত, সে কে ?” এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও এই শ্রেণীর সমস্তার সমাধান হেতু প্রাচীন যুগের মনীষিগণ প্রতিপদে ন্যায়ের যুক্তি, তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিন্তার প্রকৃতি ও নীতি এবং ঘটনা ও কার্য্যপরম্পরার কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন ।

ভারতে ইহাই দর্শনের আদি বা প্রথম অবস্থা, এই তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের মনে কোন প্রকার বিশেষ মত, নীতি বা সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না । ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে কাহার কি মত, কতটা বিশ্বাস, এ সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও প্রশ্ন করিতেন না, কিরূপে এই

* বৈদেহ জনক রাজার যজ্ঞ সত্তায় আর্তিভাগ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন,—“যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যোরন্নং কাশ্বিৎ সা দেবতা যশ্চা মৃত্যোরন্নমিতি ।” বৃহদারণ্যক্ উপনিষৎ ৩।২।১০

আর্তিভাগ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যজ্ঞায়ং পুরুষোন্মিয়ত উদম্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি” বৃহদারণ্যক্ উপনিষৎ ৩।২।১১

অথ হ কহোলঃ কৌবীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রক্ষ য আত্মা সর্বান্তরন্তং মে ব্যাচক্ষেতি ।” বৃহদারণ্যক্ উপনিষৎ ৩।৫।১

এই বিচারে বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বচক তনয়া গার্গী প্রভৃতি যাজ্ঞ-

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, ইহার উৎপত্তি এবং কারণ কোথায়, আত্মার প্রকৃত পরিচয় কেমন, জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য ভেদ কিরূপে সম্ভব, এই সকল বিষয়ই তখন আলোচ্য ছিল। অধুনা পাশ্চাত্য দেশে যেরূপ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা তীব্র ও সার্বজনীন, প্রাচীনযুগে ভারতেও সেইরূপ ছিল। তৎকালীন উদার-নীতিক মনীষিগণ যে ভাবে ইহার কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেই হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মনে হয় যেন এই সকল তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষগণ এই সকল বিষয়ে প্লেটো (Plato), স্পাইনোজা (Spinoza), বার্কলে (Berkeley), হিউম (Hume), হেগেল (Hegel), সোপেনহর (Schopenhauer), হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) হেকেল (Haeckel) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্বেই অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ যুগের পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে বহু প্রকার দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছিল, যথা—নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, শূন্যবাদ, জড়বাদ। ইহা ব্যতীত বহুত্ববাদ (বহু দেবদেবীবাদ), দ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, প্রেততত্ত্ববাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। এই মতগুলি বর্তমানকালে ইউরোপ এবং

আমেরিকায় প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু দার্শনিক ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য পদার্থের তত্ত্বাশ্বেষী। এই পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর আদি- কারণ কি, জীবনের পরম পুরুষার্থ কোথায়, জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি প্রকার, ইহাই হিন্দুর আলোচ্য বিষয় ছিল। ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। এই প্রাচীন যুগের মনীষিগণের সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অচলা ভক্তি ছিল, সত্যান্বেষণে তাঁহাদের তীব্র অনুরাগ ছিল। তাঁহারা বহু প্রাকৃতিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া যুক্তি দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন; কখনও তাহার খণ্ডন বা তজ্জন্ত কোন প্রকার নির্যাতনের ভয়ে ভীত হইতেন নাই। কারণ ভারতে চিরদিনই সর্বশ্রেণীর মধ্যেই স্বাধীন চিন্তার চলন ছিল।

একই আদিভূত মৌলিক পদার্থ হইতে এই শৃঙ্খলা-পূর্ণ জগতের গঠন ও ক্রমবিকাশ এবং দৃশ্যপরম্পরার উদ্ভব তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের অগোচর ছিল না। শূন্য হইতে একেবারে পৃথক্ পৃথক্ জীবাদি ও পদার্থ-নিচয়ের সৃষ্টি তাঁহারাও স্বীকার করেন নাই। উপনিষদের এক স্থানে জনৈক ঋষি তাঁহার পুত্রকে সৃষ্টিরহস্ত বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—“প্রিয় পুত্র, অনেকের বিশ্বাস, শূন্য হইতে এই জগতের উৎপত্তি, বলিতে পার, কেমন করিয়া জানার (নালি) হইতে স্রষ্টাবের (অস্তির) উৎপত্তি

সম্ভব?" * ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে, হিব্রুগণের
 জ্ঞায় প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ শৃঙ্খলাপূর্ণ পূর্ণাবয়ব জগতের শূন্য
 হইতে হঠাৎ উৎপত্তি স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা জগ-
 তের ক্রমবিকাশ (gradual evolution) স্বীকার করিয়া
 গিয়াছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই ক্রমোৎপত্তি-
 বাদ আধুনিক দার্শনিকগণের প্রতিভাপ্রসূত, প্রাচীন যুগে
 ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু যাহারা প্রাচীন হিন্দু
 সাহিত্যে সুপণ্ডিত, তাঁহারা জানেন, জগতের এ ক্রম-
 বিকাশতত্ত্ব বৈদিকযুগের হিন্দুগণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল; †
 অধ্যাপক হাক্সলিও (Huxley) এ কথা স্বীকার করিয়া
 গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ‡ :—“হিন্দুগণের কথা আর
 কি বলিব, ইহারা ‘পল অফ তারসাসের (Paul of
 Tarsus)’ বহু যুগ পূর্বে জগতের এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব
 বুঝিতে পারিয়াছিলেন।” সার মনিয়ার উইলিয়ামস্
 (Sir Monier Williams) তাঁহার “Brahminism and
 Hinduism” নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন—“আমার এ

* “তৈজসক আহরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাধিতীয়ং তন্মাদসতঃ
 সজ্জায়েত। কুতস্ত খলু সোমৈবং স্তাদিতি”। ছান্দোগা উপনিষৎ,
 ৬ প্রপাঠক, ২য় খণ্ড ॥

† তন্মাদা এতন্মাদান্নন আকাশঃ সত্ত্বঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ।
 বায়োরগ্নিঃ। আগ্নেরোপঃ। অস্ত্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধী-
 তোহরম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ॥ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ,
 ব্রহ্মানন্দবল্লী।

‡ “Science and Hebrew Tradition, p. 150.

কথা কালাতিক্রমদোষে দুষ্ট হইলেও আমি বলিব যে, হিন্দুগণ স্পাইনোজার (Spinoza) জন্মগ্রহণের দুই সহস্র বৎসর পূর্বেই স্পাইনোজার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, ডারউইনের (Darwin) বহু শতাব্দী পূর্বে তাঁহারা ডারউইনের মতাবলম্বী ছিলেন, এবং কোনও দেশের কোনও ভাষায় “জগতের ক্রমবিকাশতত্ত্বের” “evolution” কথা বা ধারণা প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণ কর্তৃক এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব গ্রাহ্য হইবার বহু শতাব্দী পূর্বে এই হিন্দু মনীষিগণ এই ক্রমবিকাশতত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।” এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। যদি আমরা প্রাচীন ঋষিগণের গবেষণা প্রস্তুত গুঢ় দার্শনিকতত্ত্ব সকল বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিব, তাঁহারা দর্শন জগতে যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, জগতের কোথাও তাহার তুলনা নাই।

এই প্রত্যক্ষগোচর জগতের রহস্য ভেদ করিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ ষড়দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেকটির আবার বহু শাখা-প্রশাখা। - বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, অণু-পরমাণুর সংযোগেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব নিহিত। মহর্ষি কণাদ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ছয়টি পৃথক পৃথক পদার্থ বা ব্যাপক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই জগৎ এবং বিষয়সমূহ উক্ত পদার্থগুলি হইতে

সৃজিত হইয়াছে। ইহার। যথাক্রমে :—(১) দ্রব্য পদার্থ, (২) গুণ, (৩) কৰ্ম্ম, (৪) সামান্য অর্থাৎ জাতি, (৫) বিশেষ অর্থাৎ পদার্থের ব্যক্তি, এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থের পার্থক্য জ্ঞাপক চিহ্ন, (৬) সমবায় বা নিত্য-সম্বন্ধ, অর্থাৎ অবিভাজ্যত্ব। কাহারও কাহারও মতে অভাব অর্থাৎ অনস্তিত্ব ৭ম পদার্থ।

ইহাদিগের প্রত্যেকটি আবার বহু ভাগে বিভক্ত, যথা :—দ্রব্য নয় প্রকার—(১) ক্ষিতি, (২) অপ, (৩) তেজ, (৪) বায়ু, (৫) আকাশ, (৬) কাল, (৭) দিক্ অর্থাৎ স্থান, (৮) আত্মা, (৯) মন। গুণ ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নহে; এই সকল পদার্থ গুণযুক্ত; গুণ চতুর্বিংশতি প্রকার। যথা :—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, ব্যাপকত্ব বা পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রেষত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, শব্দ। পদার্থ সকল পাঁচ প্রকার কৰ্ম্মের অধীন, যথা ;—(১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকৃষ্ণন, (৪) প্রসারণ, (৫) গমন। যাহাই জ্ঞানগ্রাহ্য, তাহাই পদার্থ, গুণ কিংবা কৰ্ম্ম। সামান্য দ্বিবিধ, পর ও অপর। তন্মধ্যে যাহা দ্রব্যগুণে সমবেত অথবা যাহা গুণকৰ্ম্মে সমবেত হইয়া আছে, সেই সত্তার নাম পর। এবং অপর শব্দে দ্রব্যাদি। বিশেষ সকলের অন্ত নাই।

এবং সমবায়েরও দ্বিতীয়ত্ব নাই, উহা একমাত্র স্বরূপ। সেই জন্য এই উভয়ের বিভাগ সম্ভব নহে।

মহর্ষি কণাদেব মতে প্রথম চারিটি পদার্থ সমষ্টিভাবে ধ্বংসপ্রবণ ; কিন্তু তাহাদের উপাদান সূক্ষ্ম ও দৃষ্টির অগোচর অণুগুলি নিত্য। তাহারা জান্তব, উদ্ভিজ্জ কিম্বা ধাতব পদার্থের উপাদানস্বরূপ, অথবা ইন্দ্রিয়লভ্য অনুভূতির যন্ত্রবিশেষ। মহর্ষি কণাদ বলেন, অণুসকল পদার্থের অবিভাজ্য অংশ ; ইহাদের চক্ষুর গোচর কোন প্রকার ব্যাপকত্ব নাই। এ বিষয়ে তিনি আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের সহিত একমত ; গ্রীক দার্শনিকগণের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই ; গ্রীক দার্শনিকগণ অণুসকলকে চক্ষুর গোচর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ দুইটি পরমাণুর সংযোগে যে অণুর সৃষ্টি, তাহাও চক্ষুর অগোচর, ইহাকে দ্বি-অণু (দ্ব্যণু) বলা হইয়াছে। এইরূপ তিনটি দ্বি-অণুর সংযোগে যে বৃহৎ ত্রসরেণুর উৎপত্তি, তাহা দৃষ্টিগোচর বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। অণুর এই সমষ্টি ধ্বংসপ্রবণ ও অনিত্য, কিন্তু ইহাদের অবিভাজ্য উপাদানভূত যাহা সূক্ষ্ম অণু, তাহা নিত্য। এমপিডোক্লিস (Empedocles) ও ডিমোক্রিটাসের (Democritus) বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতের এই অণু-পরমাণুতত্ত্ব কত বিস্ময়কর, তাহা

বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতের সিদ্ধান্ত হইতে এক পদ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

পরমাণু সকল ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে বলিয়া বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে। ইহারাও ঈশ্বরের চায় নিত্য সনাতন। কিন্তু যে শক্তির প্রভাবে দুইটি বা ততোধিক পরমাণুর সংযোগ ঘটিয়া থাকে, তাহা ঐশ্বরিক। ঈশ্বর সত্ত্ব, জ্ঞানময়, এবং ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। ঈশ্বরই পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের একমাত্র প্রভু এবং শাসনকর্তা। মহর্ষি কণাদের মতে আকাশ, কাল, দিক স্থান, আত্মা এবং মন এই প্রকৃতিরাজ্যের নিত্য পদার্থ। মন কণাদের মতে অণুর চায় অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। * কিন্তু ইহা আত্মা নহে, আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; আত্মা বিরাট ও বিভূ। মন এবং আত্মা নিত্য হইলেও অসংখ্য। + আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক; ইহা বুদ্ধি (জ্ঞান), সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম—এই নবগুণযুক্ত। পঞ্চম পদার্থ “বিশেষ” হইতে এই বৈশেষিক দর্শনের নামকরণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগতের কারণপরম্পরার প্রকৃত জ্ঞানলাভ দ্বারা

* জীবাত্মা এবং সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষের করণের নাম মন।

+ “বাবস্থাতো নানা” বৈশেষিক দর্শন, ৩ অ। ২ আ। ২০ সু।
জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা। আত্মা দুই প্রকার—পরমাত্মা বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা। ক্রিতি ও অঙ্কুরাদির কর্তারূপে ঈশ্বর অনুমেয়। জীবাত্মা এক নহে, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন।

সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং আত্মার কৈবল্যমুক্তিলাভই বৈশেষিক দর্শনের চরম লক্ষ্য ।

বৈশেষিক দর্শনের পর মহর্ষি গৌতমের শ্রায়দর্শন । যদিও সাধারণতঃ এই শ্রায়দর্শন অর্থে তর্কশাস্ত্র বা ইংরাজী Logic বুঝাইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে ইহা তর্কশাস্ত্র এবং দর্শন । অগ্গাণ্ড হিন্দু দর্শনের শ্রায় ইহারও লক্ষ্য জড়জগৎ, আত্মা এবং ঈশ্বর বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া চরমে মুক্তিলাভ । এই শ্রায়দর্শনের ভিত্তিও মহর্ষি কণাদের পরমাণুতত্ত্বের উপর স্থাপিত । ইহার আলোচ্য বিষয় ষোড়শ পদার্থ । (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প অর্থাৎ কুতর্ক, (১২) বিতণ্ডা অর্থাৎ আপত্তি, (১৩) হেত্বাভাস অর্থাৎ ভ্রান্ত যুক্তি, (১৪) ছল, (১৫) জ্ঞাতি অর্থাৎ ভ্রমাত্মক সাদৃশ্য, (১৬) নিগ্রহস্থান অর্থাৎ তর্কে অসামর্থ্য । এইগুলির প্রত্যেকটির অভ্রান্ত তত্ত্বগ্রহণই শ্রায়শাস্ত্রের লক্ষ্য । গৌতমের মতে জ্ঞানের উপায় চারিটি ;—(১) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতি, (২) অনুমান, (৩) উপমান বা সাদৃশ্য এবং (৪) শব্দ বা আপ্তবাক্য অর্থাৎ বাচনিক

জ্ঞেয় বা জ্ঞানগ্রাহ্য পদার্থ দ্বাদশটি,— আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (বস্তুর অনুভূতি), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ এবং অপবর্গ। এই সকল পদার্থ এবং জ্ঞানের উপায়গুলি পৃথক পৃথক ভাবে এবং অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ইহারাই গৌতম-প্রণীত ন্যায়দর্শনের মূলতত্ত্ব। অবশিষ্ট পদার্থগুলি তাঁহার ন্যায়দর্শন বা তর্কশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত; তর্কশাস্ত্রে ইহাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং গৌতমের ন্যায়দর্শন একসঙ্গে তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র বলিতে হইবে। গৌতমকে ভারতের এরিষ্টটল (Aristotle) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি হিন্দু তর্কশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার সময় হইতেই তর্কশাস্ত্রের ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে এবং অন্যান্য হিন্দু তর্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তর্কশাস্ত্রের সম্পূর্ণতা আনয়ন করিয়াছেন। গৌতমপ্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—যুক্তিতর্কের একটা অভ্রান্ত প্রণালীর সৃষ্টি। তিনি শুদ্ধ বা অভ্রান্ত অবয়ব-বাক্যের সাহায্যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রয়াস পাইয়াছেন। হিন্দু অবয়ব-বাক্যের পাঁচটি অংশ, যথা ;—(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় এবং (৫) নিগমন। ইহা হইতে দুইটি অংশ ত্যাগ করিলে ইহা এরিষ্টটলের (Aristotle) অবয়ববাক্যে পরিণত হয়। এরিষ্টটলের অবয়ববাক্যের মূল বাক্যই হিন্দু তর্কশাস্ত্রে

ব্যাপ্তি বা পূর্বপক্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিত্য সহ বিদ্যমানতা। মিঃ ডেভিজ (Mr. Davies) হিন্দু তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—“যুক্তিতর্কের নিয়মগুলি প্রাচীন হিন্দু তর্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।” ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকে গৌতম-প্রণীত তর্কশাস্ত্র এবং গ্রীক তর্কশাস্ত্রের এই প্রকার সাদৃশ্য দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীকগণ তর্ক ও দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলি হিন্দুদিগের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ দত্ত (Mr. R. C. Dutt) বলেন, “সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মতপ্রকাশ করিতে হইলে আমাদেরকে বলিতে হইবে যে, হিন্দুগণ তর্কশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, তবে গ্রীকগণ ইহার বহু উৎকর্ষসাধন করিয়া ইহাতে সম্পূর্ণতা আনয়ন করিয়াছেন ; অত্যাণ্ড অনেক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। * পিথাগোরাসের (Pythagoras) কাল হইতেই হিন্দু ও গ্রীকগণের মধ্যে একটা মিলন আরম্ভ হইয়াছিল ; ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পিথাগোরাস হিন্দু দর্শনাদির অধ্যয়ন জন্মই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বাদশাহ সেকেন্দার (Alexander the Great) হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রতি এমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদের

সহিত পরিচিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি অনেক হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতকে গ্রীসে লইয়া আসিয়াছিলেন। বৈশেষিক এবং ন্যায়দর্শন পরম্পর পরম্পরের অনুপূরক। অত্যাপি ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এবং জৈনগণের মধ্যে অনেকে বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনের মতাবলম্বী।

ইহার পর কপিলের সাংখ্যদর্শন। সম্ভবতঃ খৃষ্টের ৭০০ বৎসর পূর্বে কপিলের সময়। ভারতে ক্রমবিকাশবাদের জন্মদাতা এই কপিল। বিলাতের সুবিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) মতের সহিত কপিলের মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কপিল পরমাণুবাদ স্বীকার করেন নাই। ইনি বলেন, পরমাণু এই সুব্যবস্থিত জগতের আদিভূত কারণ নহে; জগৎপত্তির মূল প্রকৃতি বা আত্মশক্তি। লাতিন ভাষায় “প্রকৃতি” (Procreatrix) শব্দে জগৎপত্তিকারিণী শক্তি বুঝাইয়া থাকে। কপিলের মতে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; এ শক্তি নিত্য। কপিল অণুগুলিকে শক্তির কেন্দ্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহা-কেই Ions এবং Electrons কহে। আকর্ষণ (attraction) ও বিকর্ষণের (repulsion) ফলেই যে জগতের উৎপত্তি, এ তত্ত্ব কপিলই সর্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন।

ইহাকেই আবার এম্পিডক্লিস (Empedocles) অণুর প্রেম ও ঘৃণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । *

মূল প্রকৃতি অর্থাৎ আত্মস্থহীনা শক্তি হইতে ক্রম-বিকাশের ফলে এই সুব্যবস্থিত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, কপিল ইহাই জায় ও বিজ্ঞানের যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন । + মহর্ষি কপিলের সাংখ্যবাদের নিকট ঋণী নহে, পৃথিবীর প্রাচীন যুগে এমন কোনও দর্শনই নাই । গ্রীকগণের এবং প্লেটোর মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিতগণের (Neo-Platonists) ক্রমবিকাশবাদের উপর ভারতের এই সাংখ্যবাদের পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । অধ্যাপক ই, ডবলিউ, হপকিন্স (E. W. Hopkins) বলেন,—“প্লেটোর দর্শনশাস্ত্রে অনেক সাংখ্যমত পাওয়া যায় । সে ভাবগুলি তিনি পিথাগোরাস (Pythagoras) হইতে গ্রহণ করিয়া নিজের মত বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন । খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর

* “রাগবিরাগয়োর্বোগঃ সৃষ্টিঃ ।” সাংখ্যসূত্র ২।৯ ।

+ “সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ । একুতের্মহান্, মহতোহহঙ্কারোহহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেষুঃ স্থলভূতানি ।” সাংখ্যসূত্র ১।৬১

সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি । ইহা অনাদি ও অনন্ত । প্রকৃতি হইতে ক্রমবিকাশ নিয়মে মহতের উৎপত্তি হয় । মহৎ হইতে অহঙ্কার । অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণ । তন্মাত্র হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥

পূর্বে পিথাগোরাসের সকল দার্শনিক মতই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল।”—(L. Schroeder, Pythagoras) যদি মতের এইরূপ ঐক্য কেবল দুই এক স্থলে দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহা প্রাধান্য যোগ্য নহে বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারিত, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ও গ্রীসদেশীয় দার্শনিক মতের এতটা ঐক্যের বিশেষ কোন কারণ নাই এমন কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। তিনি আবার বলেন :—“প্লেটো এবং তাঁহার শিষ্যগণ কথিত প্রাচ্য-ভাবাপন্ন দার্শনিক তত্ত্বসমূহ কিংবা খৃষ্টীয় জ্ঞানযোগ (Christian Gnosticism) প্রধানতঃ ভারতেরই বস্তু। পাশ্চাত্য জ্ঞানযোগীগণের স্বর্গের এবং আধ্যাত্মিক জগতের বহুত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা তাহাও ভারতীয়। সাংখ্য মতে আত্মা ও জ্যোতি একই পদার্থ। গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতগণ কর্তৃকও আত্মা ও জ্যোতির একত্ব কথিত হইয়াছে, কিন্তু এ তত্ত্ব তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাংখ্যোক্ত গুণত্রয় হইতেই পাশ্চাত্য জ্ঞানযোগীগণের (Gnostic) ‘তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব’। *”

জন ডেভিস্ তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে (Hindu Philosophy) বলিয়াছেন :—“কপিলের এই সাংখ্যবাদই জগতের প্রথম দর্শন। জগতের মূল কারণ কি, প্রকৃতি কি, মনুষ্যের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার ভবিষ্যত

ভাগ্যই বা কি এই সকল বিষয়ে সাধারণতঃ মনুষ্যের মনে যে সকল প্রশ্ন উদ্ভূত হয়, বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা সে সকল রহস্যের মীমাংসা একমাত্র মহাশি কপিলই সর্বপ্রথমে চেষ্টা করিয়াছিলেন।” জার্মান দার্শনিক পণ্ডিত সপেনহর (Schopenhaur) এবং হার্টম্যানের (Hartman) কথিত দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে মিঃ ডেভিস্ আরও বলেন যে, কপিলের দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে যেটুকু জড়বাদ ইহারা তাহারই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাঁহারা কপিলের চিন্তাধারাই অনুসরণ করিয়াছেন, সুতরাং বুঝিতে হইবে এ বিষয়ে ২ সহস্র বৎসর পূর্বে মনুষ্যের চিন্তার ধারা যে পথে ধাবিত ও পরিচালিত হইয়াছিল, এতদিন পরেও ঠিক সেই পথে ধাবিত হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, এ বিষয়ে বিশেষ কোন অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নের মীমাংসায় মনুষ্যের চিন্তা বরং নিম্ন-মুখেই প্রবাহিত হইয়াছে। কপিল মনুষ্যের মধ্যে আত্মার সত্তা পূর্ণভাবে উপলব্ধি এবং আত্মাই যে মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত সারভূত পদার্থ এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই আত্মাকে জার্মানদেশীয় দার্শনিক ফিচ্টেও (Fichte) নিম্প্রপঞ্চ, অমর ও পারমার্থিক সত্তা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা ও জার্মান দেশীয় আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ সেই আত্মার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য

ক্রমবিকাশজনিত একটি উচ্চ শ্রেণীর ভৌতিক শৃঙ্খলা ভিন্ন অন্য কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পান না।

সাংখ্যদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চরমসিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রকৃতই বিশ্ব্বের বিষয়। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত—(১) অসৎ বা পূর্ণ অভাব হইতে কোন পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব নয়; (২) কার্য্য কারণ-মধ্যে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত অর্থাৎ কার্য্য কারণের অভিব্যক্তি বা রূপান্তর মাত্র; (৩) কার্য্য যখন কারণের অবস্থায় লম্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফিরিয়া যায়, তাহার নাম নাশ; (৪) প্রাকৃতিক নিয়ম সকল সর্বাবস্থায় এক ও অপরিবর্তনীয়। (৫) এই মূল প্রকৃতিই জগতের উপাদান, এবং ইহার ক্রমবিকাশে জগতের সৃষ্টি। ভূয়োদর্শন, পরীক্ষা ও অতি সূক্ষ্ম তর্কযুক্তির সহায়ে কার্য্য হইতে কারণের অনুসন্ধান করিয়া মহর্ষি কপিল এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

(১) “নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।”—সাংখ্য সূত্র, ১।১১৪।

(২) “উপাদাননিয়মাৎ।”—ঐ, ঐ, ১।১১৫।

(৩) “নাশঃ কারণলয়ঃ।”—ঐ, ঐ, ১।১২১।

(৪) “পারম্পর্য্যোহপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ।”—সাংখ্যসূত্র ৬।৩৫।

অর্থাৎ “জগতের সকল পদার্থের উপাদান কারণ প্রকৃতি। সূত্রাং রমাণুর স্থায় প্রকৃতি সর্বত্র সমান নিয়মে কার্য্য উৎপন্ন করে।”

(৫) “সমুদায়িকসংগে প্রকৃতিসংগতঃ।”—ঐ, ঐ, ১।১১৬।

যদিও কপিল এক জন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব * স্বীকার করেন নাই, তথাপি তাঁহার দর্শন নাস্তিকমতানু-
 দায়ী নহে, কারণ, ইহাতে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, নিত্য,
 অব্যয় “পুরুষ” + বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।
 এই “পুরুষ” বা আত্মা প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। †
 বিভিন্ন বৌদ্ধ দর্শনের মত সকল কপিলের এই সাংখ্যবাদের
 উপর প্রতিষ্ঠিত। জৈন দর্শনের অজ্ঞেয়বাদও এই সাংখ্য-
 তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। (ভারতে জৈনগণও সাংখ্য
 কম নহেন।) আধুনিক ভারতে জনসাধারণের মধ্যে
 যে সকল প্রতীক বা প্রতিমা পূজার প্রথা প্রচলিত
 আছে, তাহারও অন্তরালে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষ
 প্রভৃতি তত্ত্বগুলি নিহিত।

ইহার পর পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র। কপিলের বর্ণিত
 ক্রমবিকাশতত্ত্ব পতঞ্জলি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে,
 এই অনন্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ মূল প্রকৃতির ক্রমবিকাশ
 হইতে উদ্ভূত। তাঁহার মতে এই স্বতন্ত্র আত্মা বা পুরুষ
 বহু এবং প্রত্যেকেই নিত্য, অনন্ত ও অমর। কিন্তু
 পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র ও কপিলের সাংখ্যবাদের মধ্যে প্রভেদ
 এই যে, যোগশাস্ত্রে এ সকলের অতীত এক বিশ্ব

* “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।”—

সাংখ্য। সূত্র ১।২২।

† “শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্।”—

ঐ, ঐ, ১।১৩৯।

পুরুষের * (ঈশ্বরের) অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতে ঈশ্বর নিরাকার, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, ক্লেশাদিসম্পর্ক-রহিত, নিষ্ক্রিয়, নিম্পৃহ এবং নিকাম। পতঞ্জলি সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন এবং অতি বিশদভাবে চিত্তবৃত্তিনিচয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কপিল এবং পতঞ্জলি উভয়েই মনকে প্রকৃতির সূক্ষ্ম কার্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহা অচেতন প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। এ সম্বন্ধে তাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তসকলের পূর্বসূচনা করিয়া গিয়াছেন। কেবল প্রভেদ এই, হিন্দু দার্শনিকগণের মতে চিত্ত বা মন শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ হইতে ভিন্ন পদার্থ।

এই যোগশাস্ত্রে উচ্চতম মনোবিজ্ঞান (Higher psychology) আলোচিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্র মতে চিত্তের বৃত্তিগুলি পঞ্চভাগে বিভক্ত যথা :—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি †। প্রমাণ ‡ যথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ বা আগম। এই সকল এবং অন্যান্য মানসিক বৃত্তিনিচয় পতঞ্জলি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কি প্রক্রিয়া দ্বারা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং

* “ক্লেশকর্ম্মবিপাকানুরৈরপরানুষ্ঠৈঃ পুরুষবিশেষো ঈশ্বরঃ।”

পাতঞ্জল সূত্র. ১।১৪।

† “প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিষঃ।”— ই, ই ১।৬।

‡ “প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।”— ই, ই ১।৭।

চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা যায়, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত পুরুষ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হইয়াছেন। সেই পুরুষকে প্রকৃতিও তাহার গুণাবলীর বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করাই পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি।

একাগ্রতা, ধ্যান, প্রাণায়াম, দিব্যশক্তি * অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় শব্দ সকল শ্রবণ, পরচিত্তজ্ঞান + এবং অন্তঃকৃত্ত বহু প্রকার বিভূতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তি কিরূপে লাভ করা যায় এবং কিরূপে এই জীবনেই সমাধি লাভ করা সম্ভব, এ সকল বিষয় পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বিবৃত করিয়াছেন।

পতঞ্জলি-প্রণীত এই মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান এমন সম্পূর্ণ - মনোবিজ্ঞান পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। আধুনিক ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানকে প্রকৃতপক্ষে (Psychology) আত্মা দেওয়া যায় না। কারণ, Psyche অর্থে আত্মা বুঝায় অথচ ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সোপেনহার

* “কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরগুহিকরূপসঃ।”— পাঃ সূঃ ২।৪৩।

কায়সিদ্ধিঃ—অনিমাদ্যাঃ, তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাৎ শ্রবণদর্শনাদ্ভেতি ভাষা।

+ “প্রত্যয়ন্ত পরচিত্তজ্ঞানং।”— পাঃ সূঃ ৩।১২।

(Schopenhaur) বলেন,—“Psyche” শূন্য Psychology অধ্যয়নাদি বৃথা। ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানকে বরং শারীরধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীর মনোবিজ্ঞান কিংবা শুদ্ধ শারীরধর্ম বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। আমার বন্ধু কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (Cornell University) অধ্যাপক হিরাম করসন (Prof. Hiram Corson) এই কথাই বলেন। পতঞ্জলি-প্রণীত মনোবিজ্ঞানকেই প্রকৃত মনোবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এখনও ভারতের নানা প্রদেশে এই যোগশাস্ত্রের মতাবলম্বী অনেকে আছেন।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসা হিন্দু-দর্শনের অন্ততম। “মীমাংসা” অর্থে তত্ত্বান্বেষণ ও “পূর্ব” অর্থে পূর্ববর্তী বুঝায়। পূর্বমীমাংসার বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের উপদেশ ও ক্রিয়াদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, সর্বতোভাবে এই সকল উপদেশাদির অনুসরণই মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। * জৈমিনির মতে বেদবাক্যগুলি যেমন নিত্য, সেই বাক্যগুলি ও তাহাদিগের অর্থের মধ্যেও তেমনি নিত্য সম্বন্ধ বিद्यমান। অতএব বেদ অপৌরুষেয়। কি উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে, ভাব ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কিরূপে ভাব হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে বা

* “মীমাংসায় বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের উপদেশ ও ক্রিয়াদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, সর্বতোভাবে এই সকল উপদেশাদির অনুসরণই মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।”

এই জগতই ভাবের অভিব্যক্তি, ইহাই জৈমিনি বুঝাইয়াছেন। আমরা গাভী দেখিতে পাই, ইহার কারণ, বেদে “গো” শব্দ আছে। যদি বেদে এ শব্দ না থাকিত, তাহা হইলে সৃষ্টিরাজ্যে গাভী বলিয়া কিছু থাকিত না। অধুনা একুপ সিদ্ধান্ত শুনিলে আমরা হাস্যসংবরণ করিতে পারি না, কিন্তু যদি আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি এবং শব্দ ও ভাবের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে মহর্ষি জৈমিনির সিদ্ধান্ত আর অদ্ভুত বলিয়া বিবেচনা করিব না। সূর্য্য আছে, কারণ বেদে সূর্য্যের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বিশ্ব-আত্মায় এই শব্দ বা ভাব নিত্য আছে বলিয়াই সূর্য্য তাহার অভিব্যক্তিমাত্র রহিয়াছে।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে দ্বাদশটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে চারি পাদ আছে; তন্মধ্যে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্ৰ, স্মৃতি নামধেয়ার্থক শব্দরাশির প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারি পাদ আছে। উহাতে কৰ্ম্ম-ভেদ, উপোদ্ঘাত, প্রমাণ, অপবাদ ও প্রয়োগ ভেদরূপ অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আটটি পাদ আছে। উহাতে ঋতি, লিঙ্গ, বাক্যাদি বিরোধ, প্রতিপত্তি কৰ্ম্ম, অনারভ্যাধীত বহু প্রধানোপকারক প্রযোজাদি যাজ্ঞমান চিন্তন বর্ণিত

চতুর্থ অধ্যায়ের চারি পাদে প্রধান প্রযোজকত্ব, অপ্রধান প্রযোজকত্ব, জুহপর্ণতাди ফল, রাজস্বয়গত অক্ষদ্যুতাди আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের চারি পাদে শ্রুত্যাদিক্রম, তদ্বিশেষবৃদ্ধি, অবর্দ্ধন, প্রাবল্য ও দৌর্বল্য চিন্তা নিরূপিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অষ্ট পাদ আছে। উহাতে ধর্ম, দ্রব্য-প্রতিনিধ্যার্থ লোপন, প্রায়শ্চিত্ত, সত্রদেয়, বহিবিচার সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ের চারি পাদে প্রত্যক্ষ বচনাতিদেশে নাম-লিঙ্গাতি-দেশ বিচারিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ের চারি পাদে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রবল-লিঙ্গাতিদেশ অপবাদ বিচারিত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়ের চারি পাদে উহা বিচারের আরম্ভ, সামোহ, মস্তোহ ও তাহার প্রসঙ্গগত বিচার ব্যবস্থিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে অষ্ট পাদ আছে। উহাতে বাধ-হেতুদ্বারলোপবিস্তার, বাধের কারণ ও কার্যের একত্ব গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণ নঞর্থ বিচারিত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ের চারি পাদে তত্ত্বোপোদ্যাত, তত্ত্বা-বাঁপ, তত্ত্বপ্রপঞ্চন ও আবাপপ্রপঞ্চন আলোচিত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের চারি পাদে প্রসঙ্গ-তত্ত্বের নির্ণয়,

মীমাংসা-দর্শনের প্রথম সূত্রে—“অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা” অর্থাৎ তৎপরে ধর্ম কাহাকে বলে, এইরূপ জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিয়া প্রথম অধিকরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকরণে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পাঁচটি অবয়ব নিরূপিত হইয়াছে। পূর্বমীমাংসাতে পাঁচটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) অর্থাপত্তি, (৫) শব্দ। কুমারিল ভট্টের মতে ‘অভাব’ ষষ্ঠ প্রমাণ। এই সকল প্রমাণ দ্বারা যে উপায়ে মনুষ্য অপৌরুষেয় বেদবাক্যের অনুশাসন অনুযায়ী অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিয়া স্বর্গাদি পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, তাহাই মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য।

পূর্বমীমাংসাকে কর্ম-দর্শনও বলা যাইতে পারে। ইহাতে মানুষের দৈনন্দিন কর্তব্য—যজ্ঞ, পূজা, ক্রিয়াকাণ্ড-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের প্রকৃত কর্তব্য কি এবং কিরূপে তাহা সম্পাদন পূর্বক আমরা বাঞ্ছনীয় ফল লাভ করিতে পারি, পূর্বমীমাংসা পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়, যথা,—যদি স্বর্গ আমাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে আমাদেরকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে; এই সকল ক্রিয়া রীতি-মত সম্পাদিত হইলে যে অজ্ঞাত এবং অননুভব ফল (অপূর্ব) প্রসূত হইবে, তাহারই প্রভাবে আমরা

স্বর্গলোকের অধিকারী হইব। জৈমিনির মতে ঈশ্বর কৰ্মফল দেন না। “অপূৰ্বে”র দ্বারা কৰ্মই কৰ্মফল আনয়ন করে। এই জন্তই জৈমিনিকে কেহ কেহ নিরীশ্বরবাদী বলেন। এখানে আর একটি কথাও বলা আবশ্যক,—বেদ-বর্ণিত দেবতা শরীরী বা সচেতন পদার্থ নহে, যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দেবতা সেই মন্ত্রস্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতার কোন প্রমাণ নাই।

যজ্ঞাদি কৰ্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি কি প্রকার? এবং যদি সেই কৰ্মই অন্য কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারই বা কি দোষ হইবে? এই সকল সূক্ষ্ম বিচারে পূৰ্ব্বমীমাংসা পূর্ণ। কেহ কেহ হয় ত নিতান্ত অসার বলিয়া এ সকল বিধি-ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু প্রার্থনার সফলতায় (efficacy of prayers) যাহাদিগের বিশ্বাস আছে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিধি (Law of action and reaction) এবং কার্য কারণ (Cause and Sequence) সম্বন্ধে যাহাদের দৃঢ় ধারণা আছে, তাঁহারা এই আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলিকে নিতান্ত অসার বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কারণ, ইহার মধ্যেও কিছু সত্য আছে। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

আছে,—তখন এ সকল ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই নিফল হইতে পারে না। এ সকল ক্রিয়ার ফল কি? আমাদের জীবন ইহা দ্বারা কি ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে? এ প্রশ্নগুলি এখন আমরা সাংসারিক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় আলোচনা করিতে চাহি না সত্য, কিন্তু এখনও এমন অনেক মনীষী ও তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ আছেন, যাহারা এ সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্নিহিত গূঢ় সত্য সকল উপলব্ধি করিয়াছেন। পূর্বমীমাংসার যুক্তিতর্ক সম্বন্ধে অধ্যাপক কোলব্রুক (Prof. Colebrook) বলেন,—“মূল তত্ত্বের উপর লক্ষ্য রাখিয়া- প্রত্যেক ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া তাহা হইতেই সত্য নির্ধারিত হইয়াছে। এই প্রকার শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা হইতেই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মের (Philosophy of Law) উৎপত্তি এবং “মীমাংসায়” ইহারই আলোচনা আছে।” যদিও পূর্বমীমাংসাকে দর্শন বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে বেদের ভাষ্য বলা যাইতে পারে, কারণ, জৈমিনি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণেরই প্রকৃত অর্থ যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই পূর্বমীমাংসা বৈদিক মতাবলম্বীদিগের নিকট, বিশেষতঃ হিন্দু-পুরোহিতদিগের অতি প্রিয় বস্তু।

এই বেদান্তই ব্রহ্মসূত্র, বাদরায়ণসূত্র ও ব্যাসসূত্র নামে প্রচলিত আছে। শ্রীভগবান বাদরায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস একই ব্যক্তি কি না সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও সাধারণের বিশ্বাস দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে প্রাদুর্ভূত বেদ বিভাগকারী মহাভারত পুরাণাদি রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসই ব্রহ্মসূত্র প্রণেতা শ্রীভগবান বাদরায়ণ। বেদের জ্ঞানকাণ্ড, উপনিষদ্ সমূহের বিভিন্ন উপদেশগুলি একত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াই মহর্ষি ব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। মহর্ষি জৈমিনি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের কৰ্মকাণ্ডানুশাসিত বিধি প্রয়োগ ইত্যাদির সামঞ্জস্য করিয়া পূৰ্ব মীমাংসা দর্শন রচনা করেন। মহর্ষি বেদব্যাস আরণ্যক ও উপনিষদের উপদেশগুলির পারস্পর্য্য, ভাব ও গূঢ় অর্থের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য বেদান্তদর্শনকে চারি অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায়কে চারিটি পাদে বিভক্ত করিয়াছেন।

ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে পাণিনি গুরু ভগবান্ উপবর্ষ-রচিত ভাষ্য অতি প্রাচীন। শ্রীভগবান্ বোধায়নও :একটি “বৃত্তি” রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপবর্ষ-রচিত ভাষ্য ও বোধায়নবৃত্তি অধুনা লুপ্ত। বৌদ্ধযুগের অবনতিকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে

ভাষ্য রচিত হয়। বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত অদ্বৈত-মত স্থাপন দ্বারা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদবিরোধী, নাস্তিক ও শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া বেদের মহিমা পুনঃপ্রকাশে ভারতে সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী আচার্য্যগণ তাঁহার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ মতপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেও ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তায় সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই ভারতে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈবাদি ধর্মসম্প্রদায় এবং অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত-মতাবলম্বী দার্শনিকদের গুরু। জ্ঞানী গুরু শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত পরে আলোচনা করিব। আপাততঃ অন্যান্য বেদান্তমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে প্রয়াস পাইব। ভারতের ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ ও বৈদান্তিক আচার্য্যগণ স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ ব্যাখ্যানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য ইহাদের অন্যতম। তিনি বোধায়নকৃত “বৃতি” অবলম্বনে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন। দক্ষিণ-ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলে শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে এই মত বিশেষ প্রচলিত। শ্রীরামানুজের মতে আমাদের জড়জীবময় জগৎ মিথ্যা নহে। ইহা অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং অচিন্ত্য শক্তিপূর্ণ ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম সত্ত্বগুণ অর্থাৎ “তিনি কখনো নষ্ট হয় না।”

আকর, এবং তজঃ, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীৰ্য্য, শক্তি প্রভৃতি গুণের সমষ্টি। নিজ শক্তির কণামাত্রে তিনি সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতম, পরাৎপর ; তাঁহাতে কোন দোষ বা ক্রেশের লেশমাত্র নাই।” * সেই নিমিত্ত ব্রহ্মকে নিগুণও বলা যাইতে পারে।

তিনি সবিশেষ অর্থাৎ স্বশক্তি দ্বারা শুদ্ধচিৎ, চিদ-চিৎ ও অচিদ্রূপে প্রকাশমান। শুদ্ধচিৎকে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর (Personal God) বলা যায়। জীব অচিৎ-যুক্ত। শুদ্ধচিৎস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তার সহিত কেবল চিদংশে অভিন্ন। এ মতে চিদ্রূপে জীব পরমেশ্বরের সহিত অভেদ হইলেও পরমেশ্বর চিদ্ব্যন আর জীব চিৎ-কণা মাত্র। আর এই জড়জগতই অচিৎ (matter)। জীব (চিৎ) জড় (অচিৎ) উভয়েই সেই চিন্ময় পরমেশ্বরের শরীর। “সগুণ ব্রহ্মই সকলের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ও অন্তর্য্যামী +।” “স্থাবর জঙ্গম তাঁহার অধীনে ‡।”

- * সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ভূতভূতবর্গঃ ।
 তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধম্বীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ॥
 পরং পরাণাং সকলা ন যত্র রেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥

ব্রহ্মসূত্র ৩২।১১ সূত্রের শ্রীভাষ্য ।

+ এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্য্যামী । মাণ্ডুক্য ৬ ।

• ‡ বশী সর্বস্ত লোকস্ত স্থাবরস্ত চরাচরস্ত । শ্বেত ৩।১৮ ।

তিনি লোকপাল, লোকের অধিপতি, সর্বেশ্বর, সকলেরই আত্মা * । তিনি অংশী, সর্বজীবের নিয়ন্তা ও জীব তাঁহার অংশ । তিনি স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবর্জিত । তাঁহাতে কেবল স্বগতভেদ বর্তমান । ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা রামানুজদর্শন । শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, বিবর্ত বা অধ্যাসবাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও পরিণামবাদ স্থাপন এবং জীবব্রহ্মে ভেদাভেদ ও জড়জগতের সত্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ।

আচার্য্য রামানুজ ভেদাভেদবাদ প্রচার করিলেও তিনি জীব ও ব্রহ্মে স্বগতভেদ অস্বীকার করেন নাই—পরন্তু চিত্তপে জীব ব্রহ্মের অংশ—ব্রহ্মস্বরূপ নহে । আচার্য্য শ্রীবল্লভ + (বিষ্ণুস্বামী মতানুযায়ী) প্রকৃত ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের “অনু” ভাষ্য প্রণয়ন করেন । তাঁহার মতে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম । তিনি প্রপঞ্চাতীত ও পরমতত্ত্ব । প্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিষুক্ত জীব তাঁহার বিভূতি । তিনি আপন ইচ্ছাতেই নানাক্রমে প্রকাশ হইয়াছেন । পরমব্রহ্ম নিরবয়ব—

* এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিরেষ সর্বেশ্বঃ স মে আত্মোতি বিদ্যাৎ । কোষী । ৩।৮

তাঁহার কোন অংশ হয় না; সুতরাং তাঁহার অংশ কল্পনা করাও অনুচিত। বদ্ধাবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও মুক্তিতে দ্বৈতবিবর্জিত হইয়া ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভ করে ও শুদ্ধ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। মুক্ত অবস্থাতে অংশাংশিভাব বা স্বগতভেদ থাকে না। ইহাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদ বলে। এই মতাবলম্বিগণ বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত। গুজরাট, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, মালোয়া, আজমীর, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এই সম্প্রদায়ের অনেক বড় বড় আখড়া (মঠ) আছে।

শ্রীবল্লভের পূর্ববর্তী আচার্য্য শ্রীমধ্ব কিন্তু জ্ঞানাংশে বা চিদংশেও জীবব্রহ্মে অভিন্নত্ব অস্বীকার করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার মতে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, তিনি সগুণ এবং জীব ও জড়জগৎ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন।

তাঁহার মতে ব্রহ্ম-জীবে ও জীব-জড়ে বিজাতীয় ভেদ নিত্যসিদ্ধ। এই ভেদ পাঁচ প্রকার :—(১) জীব ও পরমেশ্বর ভেদ, (২) জীবগণের পরস্পর ভেদ, (৩) জড়-জগৎ ও পরমেশ্বর ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ। জীব সামীপ্যমুক্তি পাইলেও এই সকল ভেদ বর্তমান থাকে, সুতরাং এই মতে একত্ব দর্শনের কোন আশা নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্যের এই দ্বৈতবাদী ভাষ্য ‘পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন’ নামে অভিহিত হয়।

দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের অনুবর্তী ব্রহ্মসূত্রের “গোবিন্দ-ভাষ্য”-প্রণেতা। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বী হইলেও স্বীয় ভাষ্যে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা বাসুদেবের অংশ। সমুদ্রে ও তরঙ্গে, অগ্নি ও অগ্নিস্থূলিঙ্গে এবং সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণে যে সম্বন্ধ, জীবের সহিত ব্রহ্মেরও সেই সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ। ব্রহ্মনের হেতু অচিন্ত্য শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় স্ব স্বরূপত্ব বিস্মৃতি। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই অংশ জীব, এই তত্ত্বের উপলক্ষিতে মুক্তি হয়। মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত স্বরূপতঃ অভেদ ; কিন্তু পরিচ্ছিন্নত্বভেদও অনাদি ও নিত্যসিদ্ধ। স্বরূপগত শক্তিপ্রভাবেই ব্রহ্ম যেন আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ভাবে দর্শন করেন। এই শক্তি অচিন্ত্য, সুতরাং ভেদাভেদও অচিন্ত্য। বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদ বিশেষ প্রচলিত।

দ্বৈতাদ্বৈত মতের প্রবর্তক শ্রীনিম্বার্কস্বামী * “বেদান্ত-

* নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কস্বামী পূর্বে নিম্মামলাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি নারদ ঋষির শিষ্য হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। কথিত আছে যে, কোন সময়ে তিনি তাঁহার আশ্রমস্থ নিম্ববৃক্ষের উপর শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্র আবাহন করিয়াছিলেন। ঐ চক্রে রাত্রিকালে সূর্য্যের মাস পক্ষায়াস হইল। তখন দেগিয়া প্রভাগত যতিগণ তাঁহাকে

পারিজাত-সৌরভ" নামে বেদান্তসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন। জগতের সৃষ্টি ও লয়কর্তা ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত, সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদসম্বন্ধ স্থাপিত। আবার ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন উপাদান নাই, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভেদ। বস্তুতঃ জগৎ গুণাত্মক ও ব্রহ্ম গুণী। গুণী হইতে গুণের পৃথক অস্তিত্ব অসম্ভব অথচ গুণী গুণাতীত বা গুণাতিরিক্ত। ব্রহ্ম সগুণ এবং নিগুণ উভয়ই, নিম্বাদিত্যের মতে ব্রহ্ম (১) অক্ষর, (২) পরমেশ্বর, (৩) জীব, (৪) জড় এই চারি প্রকারে অভিব্যক্ত। জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধ—ইহাই নিম্বার্কাচার্য্য-প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈত বেদান্তমত স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করের পরবর্তী কালের দার্শনিক মতালোচনায় শ্রীরামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উপর তাঁহার চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্ব ভিন্ন প্রায় সকল বৈষ্ণবাচার্য্যগণই জীবব্রহ্মে স্বরূপগত অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ জীব-ব্রহ্মে স্বগতভেদ বা অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও অধিকাংশের মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম নিরবয়ব, অখণ্ড,

জীব-ব্রহ্মে কোন স্বগতভেদ কিরূপে থাকিতে পারে ? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্তিত “জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ” অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে মতের সহিত ভেদা-ভেদবাদ, শুদ্ধাঈতবাদ প্রভৃতি মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কৃত বিভিন্ন ভাষ্য পাঠে অব-ধারণ করা যায় যে, দার্শনিকতত্ত্ব বিচারে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরোক্ষে বা অপরোক্ষে শঙ্করমতকেই সমর্থন করিয়া-ছেন। শ্রীরামানুজ হইতে নিম্বার্কীচার্য্য পর্য্যন্ত সকল বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের পরম্পরের মতের যে পার্থক্য বর্তমান, শ্রীশঙ্করের সহিত তাঁহাদের মতের তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশে শঙ্করদর্শনের আলোচনার অভাবে এবং অঈতজ্ঞান ও মায়াবাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় সাধারণের মনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। আশা করি, ইহা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে।

জ্ঞানাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্ভুত বিচারশক্তি-বলে প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া দৃঢ়ভিত্তিতে অঈত-মত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সৎ, চিত্ত, আনন্দ-স্বরূপ, নিত্যসত্য, এক অদ্বিতীয় নিগুণ ব্রহ্মই পরমার্থসত্তা ; সুতরাং জীবজগৎ ও ঈশ্বর পরমার্থসত্তার ব্রহ্ম হইতে

নাই। ব্রহ্ম নিজ মায়াশক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-
কর্তা সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হন। জগতের মহা-
প্রলয় অবস্থায় মায়া অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে লীন বা সুপ্ত
থাকে। “একোহং বহু শ্চাম্” আমি এক বহু হইব,
সগুণ ব্রহ্মে এই সঙ্কল্প উঠিবামাত্র শক্তির বিকাশ ও
স্বাবরজ্জন্মাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আরম্ভ। মায়াশক্তি-
সমন্বিত সগুণ ব্রহ্মই নিজ মায়া বা প্রকৃতি হইতে এই
জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন—“তৎ সৃষ্টা
তদেবানুপ্রাবিশৎ।” মিথ্যা অবিদ্যারূপিণী এই শক্তি,
প্রকৃতি বা মায়া “সৎ”ও নহে অথবা শশশবৎ “অসৎ”ও
নহে। মায়া অনির্বচনীয়রূপা *। ব্রহ্মজ্ঞানে অঘটন-
ঘটনপটীয়সী মায়ায় নাশ হয়—যেমন রজুজ্ঞানে সর্পভ্রম

• “অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-

রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।

কার্যানুমেয়। সুধীর্থেব মায়া।

যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে ॥ বিঃ চূ ১১০।

সন্নাপ্যসন্নাপ্যভয়াত্মিকা নো,

ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যভয়াত্মিকা নো।

সজাপ্যসজা হ্যভয়াত্মিকা নো।

মহাভূতানির্বচনীয়রূপা ॥” বিঃ চূ ১১১।

অব্যক্তনামধেয়া পরমেশ্বরের শক্তি অনাদি অবিদ্যারূপিণী সঙ্ক-রজ-
স্তমোগুণময়ী মায়া সমস্ত জগৎ প্রসব করেন। সুধী কার্য দেখিয়া এই
মায়ায় অস্তিত্ব অনুমান করেন। এই মায়া সৎও নহে অসৎও নহে।
সদসৎও নহে। ভিন্ন নহে, অভিন্ন নহে, ভিন্নাভিন্নও নহে। সজ নহে,
অসজ নহে সজাসজও নহে। ইনি অকাল জন্মকাল এবং অনির্বচনীয়

বিদূষিত হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ ত্রিগুণময়ী মায়ার
বিকারমাত্র। মায়ার দুইটি শক্তি—(১) আবরণ ও
(২) বিক্ষেপ। “আবরণ”শক্তিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ
নিগুণ ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং “বিক্ষেপ”-
শক্তিতে এক অদ্বিতীয় সত্তা বহুরূপে প্রতীয়মান হয়।
ইহাই শঙ্করের মায়াবাদ।

প্রকৃতির পরিণাম হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণামী।
ব্রহ্মে মায়ার গুণত্রয় অধ্যস্ত হইয়া, এক অখণ্ড সত্তাই
খণ্ডরূপে প্রতীত হয়। এক জ্ঞানই সত্য, বহু জ্ঞান
কাল্পনিক বা মিথ্যা। এই তত্ত্বই শঙ্করের অধ্যাসবাদ।

ব্রহ্ম নিগুণ ও দেশ-কাল-নির্মিত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন
হইয়াও মায়াবশতঃ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় মায়াধীন সত্ত্ব
ঈশ্বর, জীব ও জগৎরূপে বিবর্তিত হন। তিনিই আবার
মায়াতে আপন বশে রাখিয়া জগৎরূপে ইন্দ্রজাল *
দেখান এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মস্বরূপবিশ্বত অবিষ্টাপাশ-
বদ্ধ মায়াধীন জীব হন। অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্মের প্রথম
বিবর্ত মায়াধীন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরবিবর্তই মায়াবদ্ধ জীব।
ইহাই শঙ্করের বিবর্তবাদ। বদ্ধ জীব আত্মস্বরূপকে

* ইন্দ্রো মায়াতিঃ পুরুরূপ ইয়তে। বৃহদারণ্যক উপ ; ২।৫।১৯

অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়ার দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন।

অগতে আপনার রূপ প্রকাশার্থ তাঁহার সেই সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়া-

জানিলে অজ্ঞানের কার্য্য দূর হয় ও আপনাকে অথও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্ঞানে কৃত-কৃত্য হইয়া মোক্ষলাভ করে। শ্রুতি বলিয়াছেন, “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।”

প্রকৃতপক্ষে জীব অথও ব্রহ্ম হইতে কখনও ভিন্ন নহে, কেবল মিথ্যা জ্ঞান বশতঃ আপনাকে ভিন্ন মনে করে। যত দিন এই মিথ্যা জ্ঞান ও ভেদবুদ্ধি থাকে, তত দিন জীব জন্ম-মৃত্যু ভোগ করে। শ্রুতিও বলিতেছেন—“নেহ নানান্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যু-মাপ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি।” * শঙ্করের অদ্বৈতবাদ জীবব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দার্শনিক চিন্তার চরম স্তরে লইয়া যায়, এই জন্য ইহা অন্যান্য বেদান্তমত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়টি একটু বিশদরূপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

শঙ্করের মতে পারমার্থিক বা নিরপেক্ষ সত্তাই (Absolute Reality) নিত্যসত্য ব্রহ্ম এবং ব্যবহারিক বা সাপেক্ষ সত্তা (Relative Reality) অসত্য, জগৎ বা মায়া। মায়াশক্তিপ্রভাবে নামরূপাদি বিকারগুলির

* অর্থাৎ সান্ত্বনাপক্ষে নানারূপ ভেদ নাই। যিনি নানারূপ

উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহাদের নিত্য সত্তা নাই * ; সুতরাং উহা অসত্য, কল্পিত বা মিথ্যা হইলেও যে ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া নামরূপাদি উপাধি বর্তমান থাকে, সেই সত্তা মিথ্যা বা কল্পিত নহে । ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ । জগতের উপাদান সত্তা ব্রহ্ম প্রত্যেক পদার্থে অনুশ্রুত রহিয়াছে । নামরূপের নাশেও জগতের উপাদান সত্তা ব্রহ্মের নাশ হয় না—যেমন, নামরূপ নষ্ট হইলে ঘট নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে উপাদান মৃত্তিকার নাশ হয় না । + ঘটের অস্তিত্বের পূর্বেও নামরূপ ছিল না এবং পরেও তাহা থাকিবে না, কিন্তু মৃত্তিকা পূর্বেও ছিল, পরেও থাকিবে । সেইরূপ জগতের নামরূপই মিথ্যা, কিন্তু নামরূপের অন্তর্নিহিত সত্তা বা কারণ অসৎ নহে । এই সত্তাই অপরিণামী সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত হয় । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি । এক প্রকৃতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত নানা আকারে পরিণত হইয়াছে । মনুষ্য

* “তদ্বৈদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে ।”

বৃহঃ উপ, ১।৪।৭

সৃষ্টির পূর্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ নামরূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল । পরে বীজরূপে অবস্থিত জগৎ নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইল ।

ইন্দ্রিয়াদি ও বহির্জগতের বাবতীয় বস্তু কেবল ব্রহ্মসত্তাকে প্রকাশ করিবার জন্য । জগতের প্রত্যেক পদার্থে যে ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে অনুশ্রুত রহিয়াছে, তাহা অনুভব না করিয়া প্রত্যেক পদার্থের ভেদজ্ঞানই শ্রীশঙ্করের মতে অবিদ্যা । অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর দ্বিতীয় নিত্যবস্তু নাই “একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।” সুতরাং জগতের পারমার্থিক (Absolute) সত্তা নাই, কেবল ব্যবহারিক (Relative) সত্তা মাত্র আছে ।

মায়াবরণে দেশকালনিমিত্তাতীত অথও ও অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই দেশ, কাল, নিমিত্ত (Time, space and Causation) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বিষয় ও বিষয়িরূপে প্রতিভাত হয় । জগৎ অলীক (Illusion) নহে । দেশ, কাল, নিমিত্তের রাজ্যে ইহার আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে । এই দেশ, কাল ও নিমিত্তের অপর নামই মায়া । নামরূপ উপাধি-বিশিষ্ট পদার্থের পৃথক অস্তিত্ব লোপ হইয়া সমস্ত খণ্ডজ্ঞান এক অখণ্ডজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় । ইহাই শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব ।

সর্বাবয়বসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ও বিশদ তর্কযুক্তি দ্বারা পর-মত (ভেদবাদ, শূন্যবাদ ইত্যাদি) খণ্ডনে ও স্বমত স্থাপন করিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বিতীয় । তাঁহার যুক্তির বিকটী কবর, সকল মতের মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন ।

“তাবৎ গর্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা ।

ন গর্জতি মহাশক্তির্যাবৎ বেদান্তকেশরী ॥”

আধুনিক ভারতে বেদান্তের বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকিলেও একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমতই জ্ঞানী-দিগের নিকট অতীব আদরণীয় । ভগবান্ শঙ্করাচার্যের অদ্ভুত বিচারশক্তির নিকটে ভারতের নিরীশ্বরবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, জৈন এবং সাংখ্য, বৈশেষিকাদি মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়াছিলেন । তাঁহার ভাষ্যপাঠে আধুনিক জড়বাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়াছেন । প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত পল ডয়সেন (Paul Duessen) ও ম্যাক্সমুলার (Max-muller) প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভগবান্ শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্যকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই ।*

ষড়্দর্শনের মধ্যে অদ্বৈতমতই দার্শনিক চিন্তার চরম অভিব্যক্তি । ভারতে বৌদ্ধযুগের অবসানে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের উপর বেদান্তের প্রভাব

* Paul Duessen বলিয়াছেন :—“Sankara's commentaries are equal in rank to Plato and Kant.”

Max-muller বলিয়াছেন :—“Sankara the author of the great commentary knows how to reason accura-

ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপরও বেদান্তের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সকল হিন্দুধর্মসম্প্রদায়েরই মূল ভিত্তি এই বেদান্তমূত্র। মানবের চিন্তা অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব অপেক্ষা আর উচ্চতর স্তরে যাইতে পারে নাই। অভিনিবেশ সহকারে ষড়্দর্শন পাঠে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ভারতের বেদান্তদর্শনে গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagoras) ও ইলাটিক্ (Eleatic) সম্প্রদায়ের বাবতীয় দার্শনিক মতের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। প্রফেসার হপকিন্স (Hopkins) বলেন :— থেলস্ (Thales) ও পারমেনাইডেসের (Parmenides) সকল তত্ত্বই হিন্দুদার্শনিকেরা বহু পূর্বে অবগত ছিলেন। গ্রীক ইলাটিক্ (Eleatic) দর্শন উপনিষদেরই ছায়া। খুব সম্ভবতঃ এনেক্সামেন্ডার (Anexamender) ও হিরাক্লিটাস (Heraclitus) এর দার্শনিক মত গ্রীকদেশে প্রথমে প্রচলিত ছিল না। “ফ্রেড্রিক স্লিগেল” (Fredrick Schlegel) বলেন, “বেদান্তপ্রতিপাদ্য জীব-ব্রহ্মের একত্ববাদ মানুষকে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তাহার প্রকৃতস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও অমরত্ব লাভে সদা-উৎসাহিত করিতেছে। ভারতীয় দর্শনের সহিত তুলনায় পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রতিভার পূর্ণবিকাশ গ্রীকদর্শনও মধ্যাহ্ন-সূর্যের সম্মুখে খণ্ডোতপ্রভার ন্যায় হীনপ্রভ ও অসিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে।”

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বেদান্তমতে দেশ, কাল ও নিमित্তের অতীত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় সম্বন্ধরহিত সচ্চিদানন্দের অনন্ত উৎসস্বরূপ জগদতিরিক্ত এক অদ্বিতীয় সত্তা আছে। সংস্কৃতভাষায় তাহাকে ব্রহ্ম (অর্থাৎ বৃহৎ, অনন্ত) আখ্যা দিয়া থাকে। প্লেটো (Plato), ক্যান্ট (Kant) প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ ও পৃথিবীর সকল দেশের তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সেই এক অনাদি ~~স্বরূপ~~ পরম ব্রহ্মের সন্ধান করিয়া তাহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্য, অবিকারী, চিৎসত্তাকেই প্লেটো (Plato) পরম মঙ্গলস্বরূপ (Good) বলিয়াছেন। তিনিই সোপেনহারের (Schopenhauer) ইচ্ছাশক্তি (Will)। স্পিনোজা (Spinoza) তাহাকেই জগতের মূল সত্তা (Substantia) বলিয়াছেন। ক্যান্টের অতীন্দ্রিয় প্রকৃত সত্তা (Thing in itself), ইমার্সনের (Emerson) পরমাত্মা (Oversoul), হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) অজ্ঞেয়তত্ত্ব (Unknowable) এই সমস্তই বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মেরই বিভিন্ন আখ্যা। এই পরম-ব্রহ্মই খ্রীষ্টিয়ানদিগের “স্বর্গীয় পিতা” (Father in Heaven), মুসলমানদিগের “আল্লা”। নিত্যমুক্ত চিৎসত্তাই বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রকৃত স্বরূপ। এক ব্রহ্মই জগতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। পরমব্রহ্ম অচ্ছেদ্য এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ ও প্রকৃত ভিত্তি।

দার্শনিকতত্ত্ববিচারে বেদান্ত কান্টীয় দর্শন অপেক্ষা অনেক গভীর ও সূক্ষ্মতত্ত্বের সমাধান করিয়াছে। ক্যান্ট-কথিত উপাধি (Categories) আত্মার স্বভাবজাত জ্ঞান (Forms of intuition) ও বিষয়ী (Ego) এ সমস্তই মনোবুদ্ধির গোচর। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের পরমার্থ সত্তা “অবাঙ্মনসোগোচরম্” বাক্য-মনের অগোচর। অন্য দিক্ হইতেও ক্যান্ট অপেক্ষা বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায়। ক্যান্ট (Kant) পরিদৃশ্যমান আধি-ভৌতিক জগতের প্রকৃত সত্তা (Thing in itself of the Objective Reality) ও আধ্যাত্মিক পারমার্থিক সত্তা (Thing in itself of the Subjective Reality) দুইটি সত্তার পরস্পর ঐক্যস্থাপন করিতে পারেন নাই। বৈদান্তিক ভিন্ন জগতের কোনও দার্শনিকই পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তার অভিন্নত্ব এমন স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইখানেই বেদান্তের বৈশিষ্ট্য। এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়াই মোক্ষমূলর বলিয়াছেন, “পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনের তুলনায় বেদান্ত সমকক্ষ-হীন। পরোক্ষে বা অপরোক্ষে বেদান্তের প্রভাব পরি-লক্ষিত হয় না, এমন দর্শন নাই *।” অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও জীবাত্মা (Ego) ও ইন্দ্রিয়ের (Senses)

প্রতীয়মান অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে সাহসী হন নাই।
জগতের একমাত্র বেদান্তদর্শন দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত
বলিয়াছে,—

“মনোবুদ্ধাহংকারচিত্তাদি নাহং” ।

“অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভূক্ষ্যাপী সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়ানাম্ ।”

বেদান্তদর্শন ভিন্ন জগতের অন্য কোন দর্শনে আত্মার
মহিমা বা আত্মতত্ত্ব একরূপভাবে আলোচিত হয় নাই।
এ বিষয়ে গ্রীশকরের অদ্বৈত বেদান্ত এক অসাধারণ স্থান
অধিকার করিয়াছে। অন্যান্য দার্শনিকগণের কথা দূরে
থাকুক, প্লেটো (Plato), ক্যান্ট (Kant), স্পিনোজা
(Spinoza), হিগেল (Hegel), সোপেনহাউজার (Schopen-
hauer) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দার্শনিকবৃন্দও
মনোরাজ্যের একরূপ উচ্চতম সোপানে উঠিতে পারেন
নাই। অদ্বৈততত্ত্ববিৎ ঋষিগণ মনোরাজ্যের শেষ স্তর
অতিক্রম করিয়া “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা
সহ” । সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করি-
তেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলর (Maxmuller) বেদান্ত-
দর্শনের আলোচনাকালে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, “চিৎ-
স্বরূপ এক সত্তাকে ভিত্তি করিয়াই ভয়সন্দেহাদি

উন্নতশীর্ষ চিন্তারাজ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় মিলিত হইয়াছে। আমাদের (পাশ্চাত্য) দার্শনিকগণ, এমন কি প্লেটো, হিরাক্লিটাস, ক্যান্ট ও হিগেল পর্যন্তও চিন্তাজগতের এরূপ উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারেন নাই।”

স্বর্গ, মর্ত্য, জীব, ঈশ্বর এবং আত্মা ও পরমব্রহ্মের মিলনভূমি বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব, পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও তত্ত্বই উপেক্ষা না করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহকে সেই এক অদ্বিতীয় পরম সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া স্বীকার করে। বহিজ্জগতের ঘটনাপরম্পরার কার্যাকারণসম্বন্ধ নির্ধারণ দ্বারা কেবলমাত্র সার্বভৌমিক নিয়মাবিষ্কারেই ক্ষান্ত না হইয়া সূত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধান নির্ণয় করাই দর্শন-শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ মানব-মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানভূমিতে বিচরণ করে, সুতরাং বহিজ্জগতিক বা প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানই দর্শনের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করে না। মানব-মনকে বিষয়-জ্ঞানে আবদ্ধ না রাখিয়া অসীমের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করাই প্রকৃত দর্শনের কর্তব্য। পরিদৃশ্যমান বহিজ্জগতের সমস্ত তত্ত্বের সন্ধান দিয়া মানবাত্মাকে ক্রমে সূত্র জগতের বহু উর্দ্ধে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান প্রদানই দর্শন-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। জগতের একমাত্র বেদান্তদর্শনই মানব-মনকে বিষয়

জ্ঞানের পারে অদ্বৈত ভূমিতে লইয়া যায়—সেখানে “ছিদ্রন্তে সর্বসংশয়াঃ” সকল সংশয় বিচ্ছিন্ন হয় ও সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয়। বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্তি করিয়া ভারতের অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তর্কযুক্তি সহায়ে জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় এবং সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

প্রকৃত দর্শন এক সরল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে জড়বিজ্ঞান যে সমুদয় তত্ত্বের মীমাংসা করিতে অপারগ, সেই সমস্ত অপরিহার্য সমস্যার সমাধানে সার্বজনীন ধর্মের সহিত সমস্ত দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য করিয়া মানবাত্মার সকল প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির সুযোগ প্রদান করে। ব্যাপকভাবে দর্শনশাস্ত্রের তিনটি কার্য :—(১) জড়বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন পূর্বক কতকগুলি নিয়মাবিষ্কারে জগদ্রহস্যের বিশ্লেষণ। দর্শনশাস্ত্রের এই কর্তব্যটি স্পেন্সার (Spencer) অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু জীবনের যে সমস্ত জটিল গূঢ় সমস্যার সমাধানে বড় বড় মনীষিগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন, হার্বার্ট স্পেন্সার সেগুলির মীমাংসা করা দূরে থাকুক, তাহাদের আলোচনা পর্যন্ত করেন নাই। অথচ এই সমস্ত তত্ত্বের সমাধানের উপরই মানব-জীবনের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে।

প্রশ্নের মীমাংসাক্ষম দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপন ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করা কর্তব্য। (২) দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের উৎপত্তি ও সীমা নির্ধারণও দর্শনশাস্ত্রের একটি কার্য। পাঠক জ্ঞাত আছেন যে, এই স্থলে বসিয়া এই গ্রন্থ পাঠ শুনিতেছেন। কিন্তু এই জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা হইতে? সে সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। জগতের চিন্তাশীল মনীষিগণও এই প্রশ্নের সমাধানে বিভ্রান্ত। মন কতটা পরিমাণে ও কি ভাবে এ জগৎকে জানিতে পারে, এ জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা হইতে, জ্ঞানের সীমাই বা কোথায়—দর্শনশাস্ত্রের যে শাখা এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে, তাহাকেই জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) নামে অভিহিত করা হয়। ক্যান্ট (Kant), হিগেল (Hegel), ফিচ্টে (Fichte) প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রের এই শাখা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক জর্জ ক্রুম রবার্টসন (George Croom Robertson) তাঁহার গ্রন্থে (Elements Of General Philosophy) লিখিয়াছেন :—

“জ্ঞানতত্ত্বই (Epistemology) প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র। কারণ, দর্শনের এই শাখাই বস্তু ও বস্তুর সত্তা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান, বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়—এ সমুদয় বিষয় আলো-

অধ্যাত্ততত্ত্ববিৎ (Metaphysician) । জ্ঞানতত্ত্ববিৎকেও (Epistemologist) জড়বিজ্ঞানের সীমাবহিভূত অতীন্দ্রিয় সত্তার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে জ্ঞানের উৎপত্তি, স্বরূপ ও সীমা নির্ধারণ করিতে হয় ।” বহু শাখা-প্রশাখা-বিভক্ত বিজ্ঞানও অপরোক্ষ-জ্ঞানের সন্ধান দিতে অক্ষম । বিজ্ঞানের (Science) পরিসমাপ্তিতেই দার্শনিক তত্ত্বালোচনার প্রারম্ভ । পরিদৃশ্যমান জগতে প্রত্যক্ষজ্ঞানে সীমাবদ্ধ মানবমনকে অনির্বচনীয় অনন্তসাপেক্ষ ও বাক্য-মনের অগোচর ভূমিতে পরিচালিত করা দর্শনশাস্ত্রের তৃতীয় কর্তব্য । জড়জগতের মূল কারণ, জীবের উৎপত্তি, জাগতিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য ও জন্ম-মৃত্যু-রহস্য প্রভৃতি সমস্তার সমাধান অন্তোন্মোচ্য জগতে অসম্ভব । এক নিরপেক্ষ অদ্বৈততত্ত্ব জানিলে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় ।

কেবলমাত্র অধ্যাত্তরাজ্যের তত্ত্বালোচনাই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় ; পরন্তু জগতের ত্রিবিধ দুঃখের মূল—অবিद्या ও আমি আমার এই জ্ঞান হইতে মানব-মনকে বিমুক্ত করিয়া অপরিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি স্থাপনও দর্শনশাস্ত্রের অন্ততম লক্ষ্য । সত্যের দিকে চালিত করা এবং সমস্ত বন্ধন হইতে জীবাত্মাকে মুক্ত করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য । বেদান্তদর্শন ভিন্ন অন্য কোন

দর্শনশাস্ত্রই দক্ষতার সহিত এই ত্রিবিধ কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে না। এই কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম ও দার্শনিক মতমধ্যে একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তই সর্বোৎকৃষ্ট সম্পন্ন।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মে ও দর্শনে কোনও বিরোধ নাই। পরন্তু সামঞ্জস্যই আছে। ধর্ম ও দর্শনে সামঞ্জস্যস্থাপনে প্রয়াসী খ্যাতনামা পণ্ডিত হিকেল (Ernest Haeckel) তাঁহার “জগৎ প্রহেলিকা” (Riddle of the Universe) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে জগতের মূল উপাদান এক অচেতন পদার্থ স্বীকার করিয়া অদ্বৈতমূলক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু জগতে চৈতন্য পদার্থ পরমাাত্রার অস্তিত্ব অস্বীকার করাতে তাঁহার মতও একদেশদর্শী হইয়াছে। হিকেলের (Ernest Haeckel) চেতনাবিহীন মূল কারণের সহিত সাংখ্যের “প্রকৃতির” অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি নিত্য ও অচেতন ; কিন্তু বেদান্তমতে অথও সচ্চিদানন্দই জগতের মূল উপাদান। বস্তুতঃ যাহা জীবাত্মার মূল কারণ, তাহা চৈতন্যময়, জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত অচেতন বস্তু হইতে পারে না। অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তাকে ভিত্তি করিয়া বেদান্ত এক সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাংখ্যপ্রতিপাদ্য

শব্দশূন্য কোন একটা অলীক পদার্থ বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু মায়ার অর্থ তাহা নহে। দেশ, কাল, নিমিত্ত এবং কার্য্যকারণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চাত্মক জগৎ যে অনির্বচনীয়রূপা ব্রহ্মশক্তি দ্বারা ব্যবহারিক অবস্থায় প্রকাশিত হয়, তাহাকেই মায়ী বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বেদান্ত এক দিকে যেমন দর্শনশাস্ত্র, অপর দিকে তেমনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচার করেন। কারণ, দর্শন ও ধর্ম্ম একই জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফুল ও ফলস্বরূপ। দর্শনের অমুষ্ঠান ভাগকেই ধর্ম্ম বলে; এবং দর্শন ধর্ম্মের তত্ত্ব সমূহকে বিচার করিয়া দেয়।

কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাসী বা চিন্তাশীল তार्কিক বা পণ্ডিত হইলেই ভারতে দার্শনিক আখ্যা পায় না। ভারতীয় দার্শনিক প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু পুরুষ এবং তিনি আপন জীবনে তাঁহার মতের সাধন করিয়া জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়েন। এখন পর্য্যন্ত একমাত্র ভারতেই সাধনানুষ্ঠিত দর্শনশাস্ত্র বিद्यমান আছে। যথা,—এক পরমেশ্বরে বিশ্বাসী কণাদমতাবলম্বী দার্শনিকগণ কেবল দর্শনালোচনায় জীবন অতিবাহিত না করিয়া বৈশেষিক প্রতিপাদ্য সত্য দৈনন্দিন জীবনে সাধন করিতে সচেষ্ট। বৌদ্ধ দার্শনিকগণও কুট দার্শনিক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ মতগুলি সাধনা করিয়া থাকেন। সাংখ্য বেদান্ত-

তৎপর। ভারতীয় দার্শনিকগণ বিভিন্ন দর্শন-নির্দারিত তর্ক-বিচারে ক্ষান্ত হন না। কিন্তু তাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকায় আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত বিন্দুমাত্র সংস্ক না রাখিয়াও কেবল চিন্তাপ্রসূত কতকগুলি তত্ত্ব পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেই দার্শনিক নামে পরিচিত হওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জীবনশূন্য চিন্তাশীল সংসারাসক্ত লেখক ভারতে—দার্শনিক নামে অভিহিত হয় না।

আমেরিকার এমার্সনের (Emerson) মত দার্শনিক ভারতে জন্মিয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে আমার জন্মক বন্ধু বলিয়াছিলেন, “আমেরিকায় মাত্র এক জন এমার্সনই (Emerson) জন্মিয়াছে, আর ভারতে প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর এক এক জন এমার্সন (Emerson) এখনও বর্তমান।” কথাটি অতিরঞ্জিত নহে। কারণ, ভারতে দার্শনিকগণ কেবল পণ্ডিত নহেন, তাঁহারা প্রকৃত সাধু ও দর্শনশাস্ত্রের জীবন্ত-মূর্তি।

হিন্দুগণ সাধারণতঃ জ্ঞানানুমোদিত তর্ক-যুক্তি ভাল-বাসে। যুক্তিবিরুদ্ধ অজ্ঞায় বা অসঙ্গত কোন তত্ত্বই তাঁহারা গ্রহণ করেন না বলিয়া, অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রে

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈদিক যুগ হইতে হিন্দুগণ স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ অবৈজ্ঞানিক যুক্তি-বিচারবিরুদ্ধ অশ্রাব্য মতবাদের প্রচার করিতে গিয়া পদে পদে শ্রাব্য-যুক্তি-সমন্বিত প্রতিবাদ পাইয়া ক্ষান্ত হন। যেমন বাইবেল-কথিত ছয় দিনের সৃষ্টি বিবরণ ও খৃষ্টধর্মাবলম্বী ভিন্ন ধাবতীয় নরনারীর অনন্ত-নরকের ব্যবস্থা প্রভৃতি গোঁড়ামিপূর্ণ মত শুনিয়া হিন্দুরা হাস্য করেন এবং শ্রাব্যযুক্তিবিহীন অবৈজ্ঞানিক প্রলাপবাক্য জ্ঞানে খৃষ্টধর্মসাজকদিগের মতকে উপেক্ষা করেন।

সার্বভৌমিক অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনের সহিত সকল দার্শনিক মতসমূহের, এমন কি, আধুনিক জড়বিজ্ঞানের চরমসিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য আছে। এ বিষয়ে ইহা অদ্বিতীয়। এক বেদান্তশাস্ত্রেই হিন্দুগণ পৃথিবীর ধাব-তীয় ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সকল তত্ত্বগুলি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদান্ত জন্ম-মৃত্যু রহস্য মানবাত্মার পরিণাম প্রভৃতি জটিল সমস্যার মীমাংসা করিয়া সর্বজনপ্রিয় হইয়াছেন। বেদান্ত মতে নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মা স্বভাবতঃই অমর না হইয়া যদি মরণশীল হইত, তাহা হইলে কেহ অমরত্ব লাভ করিতে পারিত না। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, কারণ, সৃষ্ট পদার্থমাত্রই বিনাশশীল। এই

করিয়াছে যে, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াও মরণশীল আত্মাকে
যীশুখৃষ্ট অমরত্ব প্রদান করেন, এ কথা হিন্দুরা বিশ্বাস
করিতে অসমর্থ। তাঁহারা বলেন, জীবমাত্রই পরমে-
শ্বরের অংশ বা সন্তান।

ভারতে বেদান্তই প্রচলিত দার্শনিক মত ও বেদান্ত-
বাদীর সংখ্যাই অধিক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধ-
ধর্মের অবনতিকালে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পৃথিবীর
শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্তৃক পুনঃ
প্রচারিত বেদান্তদর্শন অন্যান্য দার্শনিক মতকে ছায়াচ্ছন্ন
করিয়া, আসমুদ্র-হিমাচল অবধি ভারতের এক প্রান্ত
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর
লোকের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পণ্ডিত
মাক্সমুলার (Max-muller) ষড়দর্শন (Six
system of Hindu Philosophy) নামক গ্রন্থের
ভূমিকায় লিখিয়াছেন—“ভারতে অন্যান্য দর্শনের প্রভাব
আছে সত্য—কিন্তু বেদান্তের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক
ও অধিকসংখ্যক লোক বৈদান্তিক।” তিনি আরও
বলিয়াছেন যে, “বেদান্ত—দর্শন ও ধর্ম, উভয়ই। ব্যব-
হারিক অবস্থায় বৈদান্তিকমাত্রই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ-
তের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থই সত্য বলিয়া স্বীকার করে
(সাধারণে “সত্য” বলিতে ষাহা বুঝে, সেইরূপ সত্য);
বৌদ্ধদিগের মত জগৎ কেবল শূন্যময় বলে না।

বেদান্তমতে জীব ও জগতের অস্তিত্ব সাপেক্ষ হইলেও
 নিরর্থক নহে। বেদান্ত মানবজীবনের কার্য্যসমূহের ষথার্থ
 সার্থকতার বিস্তৃত ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং এই ক্ষণস্থায়ী
 জীবনে তাহাকে কঠোর নিয়মের অধীনে রাখিতে ক্রটি
 করে না। ইহা জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য করিয়া অন্তান্ত
 ধর্ম্মের ন্যায় এক সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের উপাসনা
 করে। বেদান্তের সহিত কোন ধর্ম্মের বিরোধ নাই।
 পরন্তু ইহাতে সকল ধর্ম্মেরই স্থান আছে।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্তমান ভারতের ধর্ম

পূর্ব অধ্যায়ে ভারতের ষড়দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর বহু শাখা ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত সনাতন হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিতে প্রয়াস করিবার পূর্বে ভারতের আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া উচিত। কারণ, অনেকেই ভারতের বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত মনে করিলে, আয়তনে ভারত রুসিয়া ভিন্ন সমগ্র যুরোপের তুল্য, কিংবা উত্তর-আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ, অথচ লোকসংখ্যায় সার্কি ত্রিগুণ। এখানে বিভিন্ন জাতি ও ভাষার অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই ভারতের তায় জাতি ও ভাষাগত এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, পার্শী, বৌদ্ধ, জৈন যাবতীয় ধর্মমতাবলম্বীর আবাস এই বিশাল ভারতে। ১৯০১ সনে ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর

	১৯০১ সালে	বর্তমানে
খৃষ্টান	২,৯,২৩,২৪১	৩৮,৭৬,১৯৬
মুসলমান	৬,২৪,৫৮,০৭৭	৬,৬৫,৯৩,৬৭২
ইহুদী	১৮,২২৮	২২০০০
পার্সী	২৪,১৯০	১,০০,০৫৯৬
বৌদ্ধ (প্রধানতঃ ব্রহ্মে)	২৪,৭৬,৭৫৯	১,০৯,২১,২২৮
জৈন	১৩,৩৪,১৪৮	১২,৯৮,১৮৭
শিখ	২১,৯৫,৩৩৯	৩০,১৪,৪৩৭
হিন্দু	২০,৭১,৪৭,০২৬	২১,৭৫,৯৫,৪৯৫

ইহুদীগণ বিক্ষিপ্তভাবে বোম্বাই, পুনা বা কলিকাতার
কায় প্রধান প্রধান নগরে বাস করে। পার্সীগণ সাধা-
রণতঃ বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী। ভারতে বৌদ্ধ-
ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা খুবই কম। এতদ্ব্যতীত ভারতে প্রায়
এক কোটি আদিম অনার্যের বাস। ইহারা পূর্বপুরুষ
অথবা প্রেতের উপাসনা করিয়া থাকে।

ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু। তাহাদের
ধর্ম সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত হয়। “হিন্দু”
ও “হিন্দুধর্ম” উভয় নামই সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয় জাতির
দ্বারা প্রদত্ত। প্রাচীনকালে যখন পারস্য ও গ্রীকজাতি
ভারত আক্রমণ করে, সেই সময়ে তাহাদিগকে ভারতের
উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে হইয়া-
ছিল। বর্তমান ভারতের অধিবাসীরা ইহাদের নাম হিন্দু

(The Indus)। পারস্য ও গ্রীক ভাষায় ইহা হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইত। সে জন্য পারসীক ও গ্রীক-গণের দ্বারা সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণের নাম ও বাসভূমি যথাক্রমে “হিন্দু” ও “হিন্দুস্থান” হয়। সুতরাং ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ ধরিলে “হিন্দু” শব্দ দ্বারা আর ভারতবাসীকে বুঝায় না। * ভারতের অধিবাসিগণ প্রকৃতপক্ষে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া কখনও পরিচয় প্রদান করেন নাই। ইঁহারা আপনাদিগকে “আর্য্য” বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা প্রধানতঃ মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন—কাহারও কাহারও মতে উত্তর-মেরু-প্রদেশ অথবা ইউরোপ হইতে তাঁহারা আসেন। কিন্তু আর্য্যজাতির পূর্বপুরুষগণের যথার্থ আদিনিবাস পৃথিবীর কোন্ স্থানে ছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

সুতরাং “হিন্দু” শব্দে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির বংশ-ধরগণকে বুঝাইয়া থাকে, যাঁহারা এখন ভারতে বাস করেন ও আপনাদিগকে “আর্য্য” বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহাদের ধর্ম্মের নাম “আর্য্যধর্ম্ম” বা সনাতন ধর্ম্ম (যাহার অনাদি হইতে অনন্তকাল অস্তিত্ব থাকিবে) কারণ, হিন্দুগণের মতে এই ধর্ম্ম চিরস্থায়ী। কেহ হয় তা বলিবেন, হিন্দুধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্মমাত্র; কিন্তু যদি আমরা

পৃথিবীর তথাকথিত অপ্রাকৃতিক (Super-natural) ধর্মসমূহের কারণ ও উৎপত্তি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এই ভারতের সহিত তাহাদের কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ ও সংশ্রব রহিয়াছে, কারণ পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মমতের জন্মস্থান এই ভারত ; বিশেষতঃ যখন অন্য দেশে ধর্মের নামগন্ধও ছিল না, সেই সুদূর অতীতেও ভারতে তথাকার সনাতন “আর্য্য-ধর্ম” শুধুমাত্র প্রচলিতই ছিল না, পরন্তু সম্যকভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল ।

বর্তমান ভারতে প্রচলিত হিন্দুধর্মে পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন ধর্মভাব ও ধর্মতত্ত্ব নিহিত । এই হিন্দুধর্ম সুবিশাল বটবৃক্ষের দীর্ঘ শাখা-প্রশাখার ন্যায় শত শত সম্প্রদায় মতবাদ বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে । ইহার অসংখ্য পত্র-দ্বারা যেন যাবতীয় সাধনা ও পূজাপ্রণালী আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে । দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনা, অবতারের উপাসনা, বীরপূজা, সাধুপূজা, মূর্তিপূজা, পূর্বপুরুষের পূজা, প্রেত-পূজা, হিন্দুধর্মে এ সকলই আছে । সকল মতকে উদার-ভাবে গ্রহণ করাই ইহার মূলভিত্তি । সমস্ত মতই ইহার নিকট গৃহীত হয় । ঈশ্বর বিশ্বাসী ও মুক্তিকামী উন্নত, অথবা সাধারণ যে কোন শ্রেণীর উপাসক হউক না

দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। মনুষ্যের চিন্তা ও গবেষণাপ্রসূত সর্বপ্রকার ধর্মতত্ত্ব ও আরাধনাপ্রণালী মণিমণিক্যবৎ প্রচলিত হিন্দুধর্মের রমণীয় দেহে খচিত রহিয়াছে।

মনুষ্য কিরূপে চিন্তা ও গবেষণার ফলে ক্রমশঃ অতি নিম্নস্তরের পূজা হইতে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের আরাধনায় উন্নত হইয়াছে, আরাধনার এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব যদি কেহ জানিতে চান, তাহা হইলে তিনি ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীর আচার-ব্যবহার : উপাসনাপ্রণালী লক্ষ্য করুন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর (Maxmuller) বলেন ;—“ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘোর কুসংস্কার হইতে জ্ঞানের চরমবিকাশ পর্য্যন্ত যাহা কিছু সম্ভব সকলই ভারতে আছে।”

এই সার্বজনীন ধর্মকে প্রকৃতপক্ষে Hinduism (হিন্দুধর্ম) বা Brahminism (ব্রাহ্মণধর্ম) অন্ত কোনও নামে অভিহিত করা উচিত নহে। ইহাকে “ব্রাহ্মণধর্ম” বলিব কেন? খৃষ্টীয় মিশনারিগণ এই শব্দের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই শব্দ দ্বারা হিন্দুধর্মের কিছুই বুঝায় না। কারণ, কোন ব্রাহ্মণই হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নহেন। বস্তুতঃ এই সনাতনধর্মের নামকরণ অসম্ভব। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কেহই নাই।

জোরাষ্ট্রাধারের বা পার্শীদিগের ধর্ম উল্লেখ্যাত্মক ধর্ম

ছিল এবং এই সকল ধর্ম ইহাদিগের প্রতিষ্ঠাতাগণের
 জীবনী ও কার্যকলাপ অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে।
 কিন্তু হিন্দুদিগের সনাতনধর্ম কোন ধর্মপুস্তক, অথবা
 কোন মহাপুরুষের জীবনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। যদি
 আমরা অতি প্রাচীনতম বৈদিকযুগের সত্যদ্রষ্টা ও ঋষি-
 গণের উপদেশসমূহ পাঠ করি, তাহাতেও দেখিতে
 পাইব যে, তাঁহারাও পূর্ব ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদিগের নিকট
 হইতে সেই সকল মহাসত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই
 জন্মই বলিতে হয় যে, ভারতীয় আর্যগণের ধর্ম কোনও
 ধর্মমত বা নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িকমত, ধর্মনীতি, অন্ধবিশ্বাস
 কিংবা ধর্মশাস্ত্রবিশেষের নির্দেশে চলে না। প্রাচীন
 ঋষি কথিত সনাতন নীতির সহিত যাহার সামঞ্জস্য
 দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ভারতীয় আর্যগণ
 সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম চিরদিনই
 মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ গতি বায়ুর ন্যায় সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতার
 বন্ধনমুক্ত। বায়ু যেমন নানা পুষ্প হইতে সুগন্ধ আহরণ-
 পূর্বক চারিদিকে তাহা ছড়াইয়া দেয়, সেইরূপ এই
 সনাতনধর্ম যাহা সত্য ও মনুষ্যের হিতকর, তাহাই
 গ্রহণ করিয়া থাকে। সর্বব্যাপী আকাশের মত এই
 হিন্দুধর্ম সকল জাতির সকল দেশের আধ্যাত্মিক
 আকাশে ব্যাপ্ত। এ কথা সর্বজন বিদিত সত্য যে,

of God) হিন্দুদিগের এই সনাতন ধর্ম পাশী, ইহুদী, খৃষ্টান ধর্মকে অতিক্রম করিয়াছে। এই সনাতন ধর্মের ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অনন্ত প্রেমময় এবং নিরাকার ও নিগুণ হইয়াও সাকার ও সঙ্গুণ। খৃষ্টধর্ম অনুসারে এই বিশ্বসৃষ্টিকর্তা তাঁহার সৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত। কিন্তু হিন্দুদিগের মতে সৃষ্টিকর্তা এই সৃষ্টিরাজ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। হিন্দুর এই সৃষ্টিকর্তা ইজরায়েলের বংশধরগণের পূজ্য দেবতা জাভে অপেক্ষা ক্ষমাশীল, ন্যায়বান, পক্ষপাতশূন্য এবং দয়ালু। আর্য্য-ধর্মের ঈশ্বর জোরাস্ট্রীয়ানদিগের পূজ্য অউরা মাজদা অপেক্ষা করুণাময়, শক্তি ও গৌরবসম্পন্ন। একেশ্বরবাদই সর্বধর্মের ভিত্তি-স্বরূপ। কিন্তু ভারতের আর্য্যগণ পৃথিবীর অগ্ন্যাগ্ন জাতির ন্যায় এই একেশ্বরবাদেও সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহাদের চিন্তার গতি আরও উর্দ্ধে।

বর্তমানে ভারতীয় আর্য্যগণের অনুসৃত ধর্ম প্রধানতঃ তিন শ্রেণীভুক্ত :—দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ। প্রথম দুই শ্রেণী অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণপতি ও সূর্য্য উপাসনার সৃষ্টি। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুই শ্রেণী আধুনিক ভারতে প্রায় বিলুপ্ত। অধিকাংশ হিন্দুই অধুনা বিষ্ণু, শিব কিংবা শক্তি-উপাসক।

সর্বজ্ঞ, সর্বভূতে প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, বিশ্বেশ্বর, জগৎ-

তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুশব্দের অর্থ সর্ব-
ব্যাপী, সর্বভূতে বর্তমান ঈশ্বরকে বুঝায়। ইনি হিন্দুদিগের
ত্রিদেবের মধ্যম দেবতা। হিন্দুদিগের মতে এই বিশ্বপতি
বিষ্ণু সাকার এবং নিরাকার। নিরাকারভাবে তিনি এই
চরাচর ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী; তিনি প্রত্যেক অণুপরমাণুতেও
অবস্থিত; তেজঃসম্পন্ন সূর্যের রশ্মির ন্যায় তিনি এই অনন্ত
স্থান ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন সাকার বিষ্ণু
উচ্চতম স্বর্গবাসী। এই সাকার বিশ্বপতি যুগে যুগে
অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধর্মের রক্ষা ও মানবের
মঙ্গলবিধান করেন। প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—“যখনই
ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম প্রবল হয়, তখনই
আমি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও পাপের উচ্ছেদ হেতু অবতাররূপে
আবির্ভূত হই।” *

কেহ কেহ মনে করেন, হিন্দুদিগের এই অবতারবাদ
সৃষ্টিয়ানদিগের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু হিন্দুদিগের
এই অবতারবাদ যীশুর জন্মগ্রহণের বহু যুগ পূর্বেও ভারতে
প্রচলিত ছিল, এ কথা প্রমাণিত সত্য। বস্তুতঃ ভারতই এই
অবতারবাদের জন্মভূমি। অগ্ন্যাশ্ব ধর্ম এই ভারত হইতেই
অবতারবাদ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু মতে ঈশ্বর সৃষ্টির পর
বহুবার অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং

ভবিষ্যতেও হইবেন । অতীতের বহু অবতারই হিন্দু স্বীকার করেন এবং এখনও বহুবার ঈশ্বর অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, এ কথাও হিন্দু বলেন । খৃষ্টানগণ বলেন, ঈশ্বর একবারমাত্র অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সেই প্রথম এবং সেই শেষ অবতার ।

হিন্দুদিগের মতে ঈশ্বর যে কোন কালে যে কোন স্থলে অবতাররূপে আবির্ভূত হইতে পারেন ; কারণ, তিনি সর্ব-শক্তিমান্ । যদি আমরা বলি, তিনি একবারমাত্র অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় । কিন্তু যিনি অনন্ত শক্তিমান, অনন্ত তেজঃসম্পন্ন, অনন্ত ভাবে প্রকাশমান, তাঁহাকে কি স্থান, কাল বা জাতিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা উচিত ? অনন্ত প্রেমস্বরূপ তিনি, সকল জাতির প্রতিই তাঁহার সমান প্রেম ; যখন যেখানে তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়, তখন স্বভাবতঃই তিনি সেইখানে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বরের এইরূপ আবির্ভাবকে অবতার বলা হয় । অবতার শব্দের অর্থ মানবের মঙ্গলহেতু পৃথিবীতে ঈশ্বরের আবির্ভাব ।

মহাকাব্য রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অবতারগণের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন । অধুনা এই দেশের নানাস্থানে, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম পাদদেশগুলিতে এবং মধ্য-ভারতে রামচন্দ্রকে

মানবজাতির পরিত্রাতা বলিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহারা রামচন্দ্রকে আদর্শ পুত্র, আদর্শ নরপতি, আদর্শ পিতা এবং আদর্শ স্বামী বলিয়া মনে করেন এবং গভীর প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁহার নাম জপ করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্নে রামনাম-মহিমা ও রামচন্দ্রের কীর্ত্তি-কলাপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; ইঁহারা প্রতিদিন সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষায় অথবা অন্য কোন চলিত ভাষায় লিখিত রামায়ণের কিয়দংশ পাঠ এবং সনাতন সত্যের অবতার এই রাম-চরিত্রের মহান্ নৈতিক আদর্শ এবং তাঁহার উপদেশবাক্য অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া থাকেন। সত্যের মর্যাদারক্ষার জন্য রাম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। চতুর্দশবর্ষব্যাপী বনবাসকালে রামচন্দ্র মহান্ আদর্শের সৃষ্টিকরণার্থ অশেষ দুঃখ সহ ও শারীরিক নির্যাতন অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী সীতা আজ কি বৃদ্ধা কি যুবতী হিন্দু স্ত্রীমাত্রেয়ই আদর্শস্থানীয়া। এই সীতার জ্ঞায় এমন গৌরবময়, এমন পবিত্র, এমন সম্পূর্ণ আদর্শ ভারতের নারী-সমাজে বিরল। যাঁহারা রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, জগতে এই অনন্তসাধারণ সীতা-চরিত্রের তুলনা নাই। ভাৰ্য্যাক্রপের বা মাতৃক্রপের এমন আদর্শ স্ত্রী-চরিত্র আর কোথায়ও নাই। এমন বিশ্বয়-কর আদর্শ নারী-চরিত্র জগতে হুল'ভ। পতিব্রতা সীতা

ভক্তির জন্ম সর্বভাগিনী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ পাতিত্রতা ও পবিত্রতা যেন আকার পরিগ্রহ করিয়া এই সীতারূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তার পর হনুমান। খৃষ্টান মিশনরীগণ এই হনুমানকে ভ্রমবশতঃ বানর-দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ভক্তবীর হনুমান বিশ্বাস ও ভক্তির আদর্শ। এই জন্ম যাহারা রামচন্দ্রের উপাসক, তাহারা হনুমানকেও আদর্শ চরিত্র বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকেন। ভারতে যাহারা রামোপাসক, তাহারা রামাত বৈষ্ণব নামে খ্যাত। তাহারা রামচন্দ্র ও বিষ্ণুকে এক ও অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন।

ইহা ব্যতীত ভারতের সর্বত্র কৃষ্ণোপাসক লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছেন। এই কৃষ্ণই হিন্দু যীশু। কৃষ্ণকেই অবতার-শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। খৃষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্বে ইহার সময়। কৃষ্ণকথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস মহাভারতে এবং অন্যান্য বহু পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। রহস্যপূর্ণ জন্ম-মৃত্যু এবং ঘটনাবল্ল কল্পময় জীবনে কৃষ্ণের ইতিহাস এবং যীশুখৃষ্টের ইতিহাসের মধ্যে বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান। যথা—কৃষ্ণ এক গুহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার জন্মকালে কংস-নামীয় এক অসুর এককালে যাবতীয় শিশুবধের আদেশ প্রচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ মৃত ব্যক্তি ও জন্তুর জীবনদান এবং অন্যান্য বহু অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন। যাহারা ভগবদগীতা—যাহাকে সার এডউন

আরনল্ড “স্বর্গীয় সঙ্গীত” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—
পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই কলুষ-বিনাশক
জগতের পরিত্রাতা কৃষ্ণ কি অসীম তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।
যেমন খৃষ্টান ধর্মমণ্ডলে বীণ জগতের পরিত্রাতা, তেমনই
কৃষ্ণ জগতের উদ্ধারকর্তা। যেমন ধর্মপ্রাণ রোমান ক্যাথলিক
ধর্মযাজকগণ খৃষ্ট নাম জপ করেন, তেমনই হিন্দুগণও অহো-
রাত্র কৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন, কৃষ্ণ-নাম জপ করেন
এবং কৃষ্ণ-মহিমা কীর্তন করেন।

কৃষ্ণ এবং রাম উভয়েই বিশ্বের ঈশ্বর বিষ্ণুর অবতার।
পাশ্চাত্য-জগতে একরূপ ধারণা করা বড় কঠিন এবং এই
কারণেই তাঁহারা হিন্দুগণকে বহুত্ববাদী মনে করিয়া
থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ বহুত্ববাদী নহেন।
হিন্দুগণ বিভিন্ন নামে ও আকারে একই ঈশ্বরের উপাসনা
করিয়া থাকেন। রাম এবং কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার।
ভাবমার্গে অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে উভয়েই এক ও অভিন্ন, কিন্তু
বাহ্যতঃ ইহারা পৃথক্। যেমন খৃষ্টান-জগতের গীর্জাসমূহে
খৃষ্ট ও মেরী-মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ভারতের
প্রধান প্রধান দেবমন্দিরে কৃষ্ণ ও রামের প্রতিমূর্তি দেখিতে
পাওয়া যায়। খৃষ্টান মিশনারীগণ ইহার তাৎপর্য্য সম্যক্
উপলব্ধি না করিতে পারিয়া এই প্রতিমূর্তিগুলিকে পুত্তলিকা
মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পৌত্তলিকতা অর্থে
প্রকৃতপক্ষে আপনারা যাহা বুঝেন, তাহা ভারতের

কোথায়ও নাই। ভারতে যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ ও নিরক্ষর, তাহারাও পৌত্তলিক নহে, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। আমি ভারত অপেক্ষা ইটালীতে পৌত্তলিকতার প্রাবল্য দেখিয়াছি। ইটালীয়গণ তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে যীশুর বালক-মূর্তিতে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, কিন্তু ভারতে এতটা তামসিকতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতে যাহার পূজা হইয়া থাকে, তিনি Ideal বা আদর্শ, Idol অর্থাৎ পুত্তলিকা নহেন। মন্দিরে যে সকল বিগ্রহাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এই সকল মূর্তি দেখিলে সেই জগৎপরিব্রাতাগণের কার্যাবলী স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়। হিন্দুগণ রাম বা কৃষ্ণের স্মৃতি বা স্মৃষ্ণ সত্তারই উপাসক। যদি আপনি এক জন ব্রাহ্মণ উপাসককে জিজ্ঞাসা করেন, কৃষ্ণ কোথায়, তাহা হইলে তিনি বলিবেন যে, প্রভু কৃষ্ণ চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিদ্যমান; তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, হৃদয়ের হৃদয়। তিনি কোন প্রকার কাষ্ঠ বা প্রস্তর-মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ নহেন। ইহাকে কি পৌত্তলিকতা বলিতে পারা যায়? যদি ইহা পৌত্তলিকতা হয়, তবে ইহাকে কি প্রকার পৌত্তলিকতা কহে? এরূপ উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বা মিথ্যা অর্থাৎ অপ্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা বলা নিতান্ত সহজ, কিন্তু যিনি অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন, যিনি প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিবেন,

আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ পথপ্রদর্শক, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন পৌত্তলিকতা হয়, তাহা হইলে খৃষ্টানগণ যখন যীশুর প্রতিমূর্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাকে পৌত্তলিকতা ভিন্ন আর কি বলিব ? যদি হিন্দুকে ত্রিকোণ কিংবা বৃত্তাকার কোন প্রকার প্রতীক বা চিহ্নের প্রতি একাগ্রচিত্ততার জন্য পৌত্তলিক বলা হয়, তবে খৃষ্টানগণ যখন ক্রুশের আকার চিত্রা এবং বেদীর উপর ক্রুশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহারা সে আখ্যালাভে বঞ্চিত থাকিবেন কেন ?

একাগ্রতা বা ধ্যান-ধারণার সাহায্য জন্য হিন্দুগণ মন্দিরে বিগ্রহ বা প্রতীক প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এই সাধারণ উপাসনাপদ্ধতি হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। কখন কখন পূজার কোন প্রকার বাহ্যিক চিহ্নই থাকে না। উপাসক ভূমিতলে আসীন হইয়া নিম্নলিখিত-নেত্রে প্রস্তর-মূর্তির গায় নিশ্চল হইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি কেবল অন্তর দ্বারা উপাস্ত্রের আরাধনায় নিযুক্ত। তিনি বাহ্য-জগৎ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া আছেন। কিন্তু যোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ একাগ্রতার পুষ্টি হেতু এই সকল স্থূল চিহ্ন কিংবা প্রতীকের আবশ্যক হইয়া থাকে, কারণ, মনের সাধারণ গতি স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে ব্রহ্মে। এই জন্য মন্দিরে ক্রুশ (Cross) প্রতিষ্ঠা বহু প্রকার প্রতীক থাকা অনাবশ্যক নহে। খৃষ্টের জন্মের

বহু পূর্বে ভারতে ধর্মের প্রতীক বা চিহ্নস্বরূপ এই ক্রুশ ব্যবহৃত হইত।

“স্বস্তিক” ক্রুশেরই অতি প্রাচীন আকার। ভারতে অতীত ইহার ব্যবহার আছে। ইহা ব্যতীত ত্রিভুজ চিহ্ন দ্বারা ত্রিদেব, বৃত্ত দ্বারা অনন্ত প্রভৃতি স্মৃতিত হইয়া থাকে। ভারতে একরূপ বহু প্রকার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এগুলি যোগশিক্ষার প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী।

হিন্দুগণ কৃষ্ণকে ঐশ্বরিক প্রেমের আদর্শ অবতার-স্বরূপ মনে করিয়া থাকেন। ধরাধামে এই পবিত্র প্রেম প্রাবৃত্ত করিবার জন্তই কৃষ্ণাবতার। মনুষ্যসমাজে পরস্পরের মধ্যে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, ততভাবে এই ঐশ্বরিক প্রেমের বিকাশ হইতে পারে, ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ ভারতে কি করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি ভারতে স্থায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, আমরা এখানে থাকিয়া তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব না। ভারতে যাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করা উচিত। যদি আমরা কৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায় যাই, কিংবা যেখানে তিনি বাল্যকালে রাখালরূপে নানা লীলা করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, সে প্রদেশের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি কিরূপ ভক্তিযুক্ত এবং কিরূপে তাঁহারা কৃষ্ণোপাসনা করিয়া থাকেন। ভারতের এই কৃষ্ণভক্তির তুলনা পৃথিবীর আর কোন দেশেই নাই। আমি

যুরোপের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, যুক্তরাজ্য ও
 কানাডার প্রায় কোন স্থানই আমার দেখিতে বাকী নাই,
 কিন্তু ভারতের বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণভক্তির সে করুণ উচ্ছ্বাস,
 অনুরাগের সে আকুলতা পৃথিবীর কোথাও দেখিতে পাই
 নাই। ঈশ্বর কেবল প্রভুভাবেই উপাস্ত্র নহেন। তিনি সখা,
 সন্তান বা পতিভাবেও উপাস্ত্র। ইহাই বৈষ্ণবধর্ম। তাঁহারা
 প্রেমময় প্রভুকে নিকট হইতে নিকটে আকর্ষণ করিয়া
 সেই প্রভুতেই তন্ময় হইয়া থাকেন। বাধা ও ব্যবধান
 কিছুমাত্র থাকে না। এই বৈষ্ণব-ধর্মের পূর্ণ বিবরণ প্রদান
 সময়ভাব বশতঃ আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তবে এই পর্য্যন্ত
 বলিতে পারি, এখনও ভারতে এমন সহস্র সহস্র হিন্দু
 রমণী আছেন, যাহারা এই জগৎপরিব্রাতা কৃষ্ণকে আপন
 সন্তানরূপে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা গর্ভজাত মানব
 সন্তানের প্রয়াসী নহেন; তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে
 ঈশ্বরের মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিতে পান। এ বড় অদ্ভুত
 ব্যাপার। ঈশ্বরের জননী! এক জন রমণী যখন আপনাকে
 ঈশ্বর বা অবতারের মাতা বলিয়া মনে করেন, তখন আমরা
 তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতার ইয়ত্তা করিতে পারি না। কিন্তু
 ইহাই তাঁহাদের আদর্শ; আমি ইহার কোথায়ও অতি-
 রঞ্জিত করি নাই। আমি নিশ্চক্ষে এই দৃশ্য ভারতে
 প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু পৃথিবীর আর কোন দেশে
 দেখি নাই।

এই বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ সাত ভাগে বিভক্ত। বেদান্ত-ভাষ্যকার অদ্বিতীয় ধর্মপ্রচারক শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণ, দাক্ষিণাত্যবাসী, বেদান্ত-ভাষ্যকার এবং ধর্মপ্রচারক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতাবলম্বীগণ, দ্বৈতবাদ-প্রচারক মাধবাচার্যের শিষ্যগণ, চৈতন্যের, বল্লাভাচার্যের, রামানন্দের এবং নিম্বাচার্যের শিষ্যগণ ইঁহারাই বৈষ্ণবগণের পৃথক্ পৃথক্ শাখা। উল্লিখিত ধর্মপ্রচারকগণের প্রত্যেকেই আদর্শ পুরুষ, ধর্মশিক্ষক এবং বেদান্তের ভাষ্যকার ছিলেন। ভারতে এখনও লক্ষ লক্ষ নরনারী ইঁহাদের মতানুসরণ করিতেছেন। ধর্মমত এবং উপাসনাপদ্ধতি বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে সামান্য সামান্য পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি জগৎপরিব্রাতা, কলুষবিনাশক এবং মানবের উদ্ধারকর্তা ছিলেন, এ বিষয়ে সকলেই একমত।

কৃষ্ণ, বিষ্ণু কিংবা রামভক্তগণের সকলেই নিরামিষ-ভোজী। ইঁহারা মৎস্ত-মাংস স্পর্শ করেন না; কারণ, অহিংসাই ইঁহাদিগের আদর্শ। ইঁহারা আহারের জন্ত কোনও প্রাণিবধ করিতে পারেন না; কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই কোনও প্রকার মত্ত প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন না। এ ভাব জগতে প্রকৃতই অতি দুর্লভ। হুঃখে ইঁহারা অনুদ্বিগ্ন থাকিবার চেষ্টা করেন। ইঁহাও এক প্রকার সাধনা। তবে এ নির্লিপ্ততা কেবল কৃষ্ণই শিক্ষা দেন নাই, বুদ্ধ এবং যীশুও এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই বৈষ্ণবধর্ম

প্রেমের ধর্ম । ইহার আদর্শ ও লক্ষ্য সর্বজীবে দয়া এবং অতি পবিত্র নৈতিক জীবন । মনুষ্যের প্রতি ইহাদের যে প্রেম, তাহা স্বার্থগন্ধশূন্য । ইহারা ত্যাগশীল । পরোপকারার্থে ইহারা সর্বত্যাগী । পতিতোক্লারক কৃষ্ণও পরের জন্ত সর্বত্যাগী হইয়াছিলেন । এই জন্ত ত্যাগ-ধর্মই ইহাদের আদর্শ । বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই । মুসলমান কিংবা পতিত হিন্দুগণও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন । আকুলহৃদয় ভক্তকে কৃষ্ণ যে বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন, যীশুও তাহাই দিয়াছেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণব এবং প্রকৃত যীশুভক্ত খৃষ্টানের বিশ্বাস, ধারণা এবং উপাসনাপদ্ধতিতে বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।

বৈষ্ণবের আদর্শ যেমন কৃষ্ণ এবং রাম, তেমনই শৈবের অগ্ৰাণ্য অবতার অগ্ৰাণ্য হিন্দুর উপাশ্রয় আদর্শ । শৈবগণ শিবের উপাসক । হিন্দু ত্রিদেবের শেষোক্ত দেবতা শিব । ইনি ত্যাগ ও নির্লিপ্ততার চরম অভিব্যক্তি । হিন্দুগণ ইহাকে ধ্যান এবং যোগেরই প্রতিমূর্তি এই জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন । এই জন্তই শিব সর্বশ্রেণীর যোগী এবং সন্ন্যাসিগণের আরাধ্য দেবতা । যখন তাঁহারা শিবনাম জপ বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিগলিত হইতে থাকে । এ পবিত্র নাম উচ্চারণকালে জগতের কোন বস্তুই তাঁহাদিগের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না । কিন্তু এই শিব এবং বিষ্ণু

এই শিব এবং বিষ্ণু সেই এক ও অনন্ত সত্তার বাহ্য ভাব-
মাত্র । শৈবের আরাধ্য শিবকে বৈষ্ণবগণ এবং বৈষ্ণবের
আরাধ্য বিষ্ণুকে শৈবগণ স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার গ্ৰাম্য
ভক্তিয়ুক্ত হইয়া উপাসনা করিতে পারেন ; কারণ, শিবই
বিষ্ণু এবং বিষ্ণুই শিব ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে শিব ধ্যান, যোগ, ত্যাগ ও পূর্ণ
নির্লিপ্ততার চরম অভিব্যক্তি । ভগবান্ বিষ্ণু ষড়ৈশ্বর্য্য-
শালী ; তিনি সমৃদ্ধি, ধন, সৌন্দর্য্য এবং কৃতকার্য্যতাসম্পন্ন ।
পরন্তু শিব কদাকার ও ভীষণ বস্তু এবং ভয় ও ভক্তিজনক
গুণরাজিয়ুক্ত । তাঁহার বরবপু ভীষণ বিষধর ও দুর্ভাগ্য ও
ঐহিকতা চিহ্ন সকল দ্বারা সমাকীর্ণ । কিন্তু ইহারা তাঁহার
প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ । যে শ্মশান মৃত্যুর
ভীতি—ধ্বংসের ত্রাসের লীলাস্থল, সেই শ্মশানভূমি তাঁহার
প্রিয় বাসস্থান । কিন্তু তিনি ভীত-ত্রস্ত নহেন ; শ্মশানের
ভীতিপ্রদ বস্তু সকল তাঁহার সমাধিস্থত্ব ভঙ্গ করিতে পারে
না । তিনি সর্ব্বপ্রকার ভয়, ব্যসন, বিপদ ও দুঃখ-বিজয়ী ।
তাঁহার সহচর অনুচর ভূত-প্রেত । কিন্তু ইহারা তাঁহার
কোনও প্রকার অনিষ্টসাধন করিতে পারে না । মানব-
কুলের মঙ্গলের জন্তই তিনি সংসারত্যাগী । তিনি স্বেচ্ছায়
জীবের মঙ্গলহেতু শত বিপদ, দুঃখ, উদ্বেগ, যাতনা বরণ
করিয়া লইয়াছেন ; তিনি তাঁহার ভক্তগণকে অমর করি-
বার জন্য স্বয়ং তীর হলাহল পান করেন । তাঁহার গাভী

চরাচর-বিশ্বের জননী, তাঁহার ঘোরতর তপশ্চর্য্যার একমাত্র সঙ্গিনী। যে স্থান সকলের অপ্রিয়, তিনি সেইখানেই বাস করেন; ব্যাব্রচর্য্য তাঁহার আসন, চিতাভস্ম তাঁহার ভূষণ। তিনি যোগীন্দ্র, যোগিগণের আদর্শ। ত্যাগী কাহাকে বলে, যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি ভারতে যাইয়া শিবোপাসনার বিষয় অধ্যয়ন করুন। তাঁহার নানা মূর্তি, তিনি বহুবার অবতার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ-সম্বন্ধীয় বহুপ্রকার চিহ্ন কল্পিত হইয়া থাকে। শৈবগণ তাঁহার তুষার-ধবল মূর্তি উপাসনা করিয়া থাকেন। এই তুষার-ধবল মূর্তি পবিত্রতার আধার, ঐহিক বিষয় সমূহের স্পর্শদোষ-বিবর্জিত। ইনি বিশ্বেশ্বর। শিবপূজা সর্বাবস্থায় চলিতে পারে। যদি শিবভক্ত মন্দির না পান, বৃক্ষতলে বসিয়াই তিনি আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার কোন প্রকার আকার, মূর্তি বা চিহ্নের প্রয়োজন হয় না। তিনি নিমীলিত নেত্রে বিশ্বেশ্বর শিবের ধ্যানে নিরত হইয়া থাকেন। এই শিব নিগুণ, ত্রিগুণাতীত, অনন্ত মুক্ত সত্তার অভিব্যক্তি।

বৈষ্ণব ও শৈবগণ পরমেশ্বরকে পুরুষভাবে কল্পনা করিয়া তাঁহাতে পুরুষোচিত গুণ সকল আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক হিন্দু তাঁহাতে স্ত্রীশক্তির কল্পনা করিয়া তাঁহাকে জগন্মাতা আখ্যা প্রদান করেন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেই ভগবান মাতভাবে পজিত হইয়া

থাকেন এবং এই ভারতেই সমগ্র নারীজাতি জগজ্জননীর অর্থাৎ আদর্শ স্বর্গীয় মাতৃদেবের মূর্তি বিগ্রহরূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন। অনেকের ধারণা, হিন্দুগণের মতে স্ত্রী-জাতির মোক্ষলাভ হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ এরূপ অজ্ঞতা কখনও প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা এই নিখিল বিশ্বের ঈশ্বরেও স্ত্রীত্ব আরোপ করিয়াছেন। হিন্দু জানেন, আত্মা পুরুষ বা স্ত্রী নহেন। কেবলমাত্র কোন এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আত্মা এই স্থূল ভৌতিক জগতে পুরুষ বা নারী-মূর্তিতে অভিব্যক্ত হন। ভগবদ্গীতা বলেন :—“পুরুষ ও স্ত্রীমাত্রেই তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক—অগ্নাধিক কালের মধ্যে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবেই।” যাহারা এইরূপে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শাক্ত বলা হয় ; ইঁহারা আত্মশক্তির উপাসক। এই আত্মশক্তি হইতে এই পরিদৃশ্য-মান বিশ্বের উদ্ভব। শাক্তগণের বিশ্বাস, এই বিশ্বজননী কালে কালে স্থূলশরীরে তাঁহার শক্তিসমূহ প্রকটিত করেন এবং নারীমূর্তিতে অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। হিন্দুগণের মধ্যে সেই আত্মশক্তি কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতি বহু বিভিন্ন মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উপাসনাকালে ধ্যান-ধারণার সহায়স্বরূপ এই প্রতীক-সমূহের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিদেশীয়গণ এই মূর্তিগুলিকে অতি ভীষণ

মূর্তি ভীষণ হইলেও হিন্দুগণের নিকট উহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক ধর্মপ্রতীকস্বরূপ। কারণ, হিন্দুগণ কেবলমাত্র সর্বশুভবাদী (optimistic) নহেন অর্থাৎ ঐশ্বরিক শক্তির কেবল শান্ত ও মধুর ভাবই লক্ষ্য করেন না, তাঁহারা উহার উভয় ভাবই স্বীকার করেন। তাঁহারা বীর। জগতের যে দিকটি অশুভ, তাহাও তাঁহাদের উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহারা সে দিকটিও গ্রহণ করেন এবং এক দিকে যেমন জগন্মাতাকে অমঙ্গল, ধ্বংস, মৃত্যু প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ভূষণে ভূষিতা করেন, অন্য দিকে তেমনই তাঁহাকে আশিসবর্ষিণী, সৌন্দর্যরূপিণী ও সর্বমঙ্গলময়ী মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। যাহারা কেবল সর্বশুভবাদী—তাঁহারা অমঙ্গল ও অশান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, সুতরাং যখন তাঁহাদের ভাগ্যে অমঙ্গল ও অশান্তি ঘটে, তখন তাঁহারা ঈশ্বর কিংবা দেবতানকে অভিশাপ প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু স্মাতৃশক্তির উপাসকগণের মধ্যে একরূপ বহু নরনারী আছেন, যাহারা হৃদ্দিনে সাহসের সহিত বিপদের সম্মুখীন হন এবং সেই দুর্ভাগ্য ও বিপদের পশ্চাতে বিশ্ব-জননীর অপার মহিমা ও স্বর্গীয় শক্তির পরিচয় পাইয়া অটল বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনায় নিমগ্ন হন।

শক্তি-উপাসনা পূর্ববর্ণিত সাংখ্যদর্শনের সমগ্র তত্ত্বের একটা রূপকাকারে অভিব্যক্তিমাত্র। সাংখ্যমতে এক

এবং জীবাশ্ম। পুরুষ অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্যরূপে পরিচিত। শিবই সেই নিরাকার অনন্ত চৈতন্যরূপ পুরুষ এবং শিব-জায়াই সেই আত্মশক্তি। এই আত্মশক্তিকেই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের এই পুরুষ ও মাতৃশক্তির মিলনেই জাগতিক অভিব্যক্তির সূচনা।

অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দুগণ কি ভাবে বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতীক বা রূপকের ভিতর দিয়া সাধারণের বোধগম্য করিয়া ভক্তি ও উপাসনার বিষয়ীভূত করিয়াছেন। জগতের ক্রমবিকাশের সূচনা কিরূপে হইল, জিজ্ঞাসা করিলে হিন্দু তৎক্ষণাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতিমূর্তি দেখাইয়া দেন। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম বিজ্ঞান, জ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বাহ্য বিজ্ঞান, জ্ঞান বা দর্শন-বিরুদ্ধ, তাহা ধর্মসম্মত হইতে পারে না। এই জন্য তাঁহারা বৈজ্ঞানিক সত্য-সমূহের প্রতীক (symbol) নির্দিষ্ট করিয়া এবং সেগুলিকে অনন্ত সত্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া ভক্তি ও উপাসনার সহায়করূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হিন্দুদিগের উদ্ভাবনীশক্তি অতি প্রবল। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সে শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের এই সনাতন ধর্মের জ্ঞান আধ্যাত্মিক আদর্শের বিভিন্ন ভাব, পুরাণতত্ত্ব, প্রতীকোপাসনা ও ক্রিয়াকাণ্ড-

স্ব স্ব ভাব ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে তাঁহাদের আদর্শ স্থির করিয়া লইতে পারেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, কোন একটিমাত্র নির্দিষ্ট ধর্মমত ও ধর্মপদ্ধতি সমুদয় মানবের ধর্ম-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। কোন একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ যেমন সকলের দেহ-পরিমিত হইতে পারে না, ধর্ম বিষয়েও সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট একটি আদর্শ সকলের মনস্তৃষ্টি সম্পাদন এবং সর্বদেশের—সর্বজাতির ধর্মাকাজ্জার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, খৃষ্টধর্ম সমগ্র জগৎকে একই আদর্শ অবলম্বন করাইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া কিরূপ অকৃতকার্য হইয়াছে। আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, আপনাদিগের ধর্মাদর্শ ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় খৃষ্টধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে প্রতিনিয়ত কিরূপ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলিতেছে। প্রকৃত কথা এই যে, বিভিন্ন মানবমনের পক্ষে ভাবের বৈচিত্র্য আবশ্যক এবং ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি, শক্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারে সেই চরমলক্ষ্যে উপনীত হইবার পথও বিভিন্ন হওয়া উচিত। এই জুগুই সনাতন হিন্দুধর্ম কোন একটি নির্দিষ্ট প্রণালীর বিধান না করিয়া বিভিন্ন মনের উপযোগী জ্ঞানবিচার (জ্ঞানযোগ), ধ্যান-ধারণা (রাজযোগ), নিকাম কর্ম (কর্মযোগ), ভক্তি ও পূজা (ভক্তিযোগ) প্রভৃতি বহুবিধ মার্গের নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটির আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে।

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল হিন্দুরাই জগৎকে এমন একটি ধর্ম দিয়াছেন, যাহা সর্বাবস্থায় সর্বপ্রকার মন ও প্রকৃতির উপযোগী ; যাহা বিভিন্ন নাম ও আদর্শের মধ্য দিয়া ভগবানের সেই এক অনন্ত সত্তার উপাসনা প্রচার করিয়াছে। সত্য এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু তাহার বিকাশ নানা প্রকার। এই উচ্চ ও উদার ধারণাই হিন্দুগণকে অগ্ৰাণু ধর্ম ও পূজাপদ্ধতির প্রতি এতটা সহনশীল করিয়াছে। কারণ, তাঁহারা জানেন যে, সকল ধর্ম, সম্প্রদায় ও মত একই লক্ষ্যে উপনীত হইবার বিভিন্ন পথমাত্র।

যাঁহারা হিন্দুদিগের চিন্তাপ্রণালী সম্যক ধারণা করিতে অক্ষম, তাঁহারা ইহাকে সর্বেশ্বরত্ববাদ (Pantheism) বলিয়া থাকেন ; কিন্তু ইহা সেই অনন্ত, সর্বশক্তিমান, অসীম করুণাময়, নিরাকার হইয়াও সাকার, এক সর্বব্যাপী চৈতন্যের পূজা। ইহাকে সর্বেশ্বরত্ববাদ বা প্যানথিজম বলিলে ভুল হয়। প্যানথিজম শব্দের অর্থ উহা নহে। যদি আমি মনে করি, এই টেবিলখানাই ঈশ্বর কিংবা যদি ভাবি যে, ঈশ্বরই এই কেদাররূপে পরিণত হইয়াছেন, তবেই তাহা প্যানথিজম বা সর্বেশ্বরত্ববাদ হইবে। কিন্তু যদি আমি বিশ্বাস করি যে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে অনুসৃত আছেন, তাহা হইলে তাহাকে সেই অদ্বিতীয় সর্ব-

হিন্দুদিগের মতে কতকগুলি নির্দিষ্ট মত বা ধর্মপদ্ধতি প্রকৃত ধর্ম নহে। বিকাশের দ্বারা ঈশ্বরানুভূতিলভ ও ভগবৎসাক্ষাৎকার করাই যথার্থ ধর্ম। যাহাকে বলে জীব শিব হওয়া বা ঈশ্বরত্ব লাভ করা। স্বার্থপর ভালবাসা একং স্বীয় অভ্যুদয়ের জন্য প্রবল বাসনা দমন করিয়া সত্যপরা-য়ণতা, সর্বজীবে দয়া ও স্বর্গীয় প্রেমের বিকাশসাধনই ধর্ম। এ ধর্মের উদ্দেশ্য ভববন্ধন হইতে আত্মার মুক্তিলাভ। হিন্দু কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ বা গোঁড়ামির অধীন নহেন। তিনি যে কোন স্থানে যাইয়া, আপনার রুচি অনুযায়ী যে কোন আদর্শকে নিজ ইষ্টরূপে গ্রহণ পূর্বক তাহার উপাসনা করিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত এক ঈশ্বরে তাঁহার বিশ্বাস অটল থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও ভয় নাই, তিনি মুক্তিলাভ করিবেন এবং এই জীবনেই এই মুক্তি-লাভ সম্ভব।

এই সকল বৈষ্ণব, শৈব ও শক্তি ব্যতিরেকে ধর্মের অন্যান্য ভাবাবলম্বী হিন্দুও দৃষ্ট হন। পঞ্জাবে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু লোকের বাস। এই শিখ শব্দ সংস্কৃত শিষ্য শব্দ হইতে উদ্ভূত। শিখগণ লুথারের সমসাময়িক গুরু নানকের শিষ্য বলিয়া উক্ত নামে অভি-হিত। ইনি মহাপ্রাণ ছিলেন। ইহার শিষ্যগণ ইহাকে অবতার বলিয়া বিবেচনা করেন। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ ও খৃষ্টানের বাইবেলের গায় শিখগণ গুরু নানকের

বাণী ও উপদেশ পুস্তকাকারে রক্ষা ও সমাদর করিয়া থাকেন। শিখগণ ইহা ঈশ্বরের বাণী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সেই কারণে তাঁহারা এই পবিত্র পুস্তক বেদিকার উপর স্থাপন করিয়া তাহার পুরোভাগে স্নগন্ধি ধূপাদি দান করিয়া তাহার অর্চনা করেন ; ইহা ব্যতীত তাঁহারা ভগবানের অন্য কোন প্রকার প্রতীক বা প্রতিমা বা কোনও অবতারমূর্তি স্বীকার করেন না। প্রোটেষ্ট্যান্ট (Protestant) খৃষ্টানদের দ্বারা তাঁহারাও অতিশয় ধর্মোন্মত্ত এবং কোন প্রকার প্রতিমা বা ঈশ্বরমূর্তি অনুমোদন করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। এ বিষয়ে তাঁহারা অতি উদার ; অপর ধর্মাবলম্বিগণকে স্বধর্ম দীক্ষিত করিতে তাঁহাদিগের কোন আপত্তি নাই। কোন সময়ে তাঁহারা শত শত মুসলমানকে শিখ-ধর্ম দীক্ষিত করিয়া শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই পবিত্র পুস্তকের নাম “গ্রন্থ সাহেব” (অর্থাৎ মহৎ ধর্মশাস্ত্র)। এই গ্রন্থে যে সকল অতি উচ্চ নীতি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উল্লেখ আছে, সেগুলি বেদোক্ত উপদেশের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। তাঁহারা অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরে বিশ্বাসী। মুসলমানগণ যেমন কোনরূপ আকার ধারণে অক্ষম, এক নিরাকার-পুরুষ আল্লায় বিশ্বাসী, শিখগণের বিশ্বাসও তদনুরূপ। সম্ভবতঃ মুসলমানধর্মের পোভাবে ফলেই ভারতে

এই গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতে বহু জৈন ও বৌদ্ধ বিদ্যমান। জৈনগণের স্বতন্ত্র ধর্মপুস্তক এবং পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, মহাবীরনাথ প্রভৃতি বহু সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদিগকে তীর্থঙ্কর বলা হইয়া থাকে। সেই অমর ধর্মগুরুগণ লোকশিক্ষা হেতু জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে কেহ তাঁহাদিগের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে, সেই এই অসম্পূর্ণ জগৎ হইতে পূর্ণ মুক্তি লাভ করিবে। ভারতের জৈনমত বৌদ্ধমতের সমসাময়িক, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব প্রায় খৃঃ পূঃ ৫৫৭ অব্দ। যে মহা-ধর্ম এশিয়ার অধিকাংশে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে, চীন ও জাপানে যে ধর্মের প্রাধান্য, যাহার প্রভাবে জাপান এক প্রতাপশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহা আজ তিব্বত, শ্রাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সুমাত্রা, যাতা প্রভৃতি এশিয়ার অগ্রাগ্র বহুদেশে প্রচলিত রহিয়াছে, বুদ্ধদেবই তাহার প্রবর্তক। কিন্তু স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ জৈনগণকে অজ্ঞেয়তাবাদী ও বৌদ্ধগণকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া থাকেন। কারণ, জৈনগণ ঈশ্বর কিংবা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার কিছুই করেন না; আর ভারতের আধুনিক বৌদ্ধগণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বা জীবাত্মার নিত্যসত্তা স্বীকার করেন না এবং বেদের অপারুষেয় বাক্যগুলিতেও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। এজন্ত বুদ্ধকে ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও বৌদ্ধগণকে তাঁহারা নিরীশ্বরবাদী

বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক হিন্দুরই বিশ্বাস, বুদ্ধদেব মানবের মঙ্গলার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণের অন্ততম।

উল্লিখিত সম্প্রদায় ব্যতীত ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজভুক্ত বিভিন্ন মতাবলম্বী আরও অনেক হিন্দু আছেন। ইউরোপের ঈশ্বরৈক্যবাদী (unitarians—অর্থাৎ ঈশ্বরের পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মারূপ ত্রিমূর্তির অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, কেবল ঈশ্বরের পিতৃত্বে বিশ্বাসী) ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহাদের তুলনা করা যায়। তাঁহারা সর্বপ্রকার প্রতীক ও বিগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া সগুণ, নিরাকার একেশ্বরের উপাসনা করেন।

এ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্গত দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় প্রচলিত বিভিন্ন ভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ধর্ম্মেরই অদ্বৈতবাদ নামক আর একটি ভাব আছে। এই অদ্বৈতবাদ বহুত্বের মধ্যে একত্বের বিद्यমানতারূপ মূলত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মতে সমগ্র বিশ্বে এক সত্তা, একমাত্র সদ্বস্ত, এক সত্য, একটিমাত্র পদার্থ বিद्यমান। এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সকল বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতেছি, সেগুলি নাম-রূপের ভেদমাত্র; সূতরাং ক্ষণস্থায়ী ও অসৎ। একমাত্র এই সংপদার্থ বহু নামে অভিহিত হয়। বেদেই আমরা বহুত্বের মধ্যে একত্বরূপ

এই সার্বজনীন সনাতন তত্ত্বের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র ঋগ্বেদে আছে :—
 “একং সদিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি” অর্থাৎ সেই সর্বস্বত্ব এক ও অদ্বিতীয় ; কিন্তু লোকে ইহার নানা আখ্যা প্রদান করিয়াছে। তাহারা এই একই বস্তুকে নানা-প্রকার নামরূপ দিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। সেই একই পদার্থ অর্থাৎ নিত্য চিৎশক্তি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালন-কর্তা বিষ্ণু, সংহারকর্তা রুদ্র ও জগৎপ্রসবিনী শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হন। এই একই নিত্য সত্তাকে মুসলমানগণ আল্লা নামে, খৃষ্টানগণ স্বর্গস্থ পিতা ও যীশু নামে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, জৈনগণ জিন, জোরাস্ট্রিয়ানগণ আহুরা মজদা, চীন-বাসিগণ টি-টেন (Ti-Tien), এবং হিন্দুগণ শিব, আত্মা-শক্তি জগন্মাতা বা ব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পূজা করিয়া থাকেন। নাম বিভিন্ন বটে, কিন্তু পদার্থ একই। যেমন জল পদার্থটি বিভিন্ন ভাষায় পানি, বারি, জলম্ (water, aqua, wasser, ean, agna) ইত্যাদি নামে পরিচিত, সেইরূপ একই অনন্ত সত্তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে আরাধিত হইয়া থাকেন। ধর্মের এই ভাবই নানা সম্প্রদায় ও ধর্মমতকে একতাবদ্ধ করে, এবং প্রত্যেক ধর্মভাবকে স্বস্থানে রক্ষা করিয়া এক সার্বজনীন ধর্মের সৃষ্টি করে—সে ধর্ম কোন পুস্তক বা শাস্ত্রবিশেষের

‘তাহার অন্তর্গত । ইহার প্রধান উপদেশ এই যে, জীবাত্মা কোনপ্রকার অত্যাচার বা পাপসম্মত নহে অর্থাৎ কোন পাপের মধ্যে জীবাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে না, কিংবা জীবাত্মাসকল সমস্তান নামক কোন দুষ্টাত্মা কর্তৃক প্রলুব্ধ কোন পতিত মানবের পাপের উত্তরাধিকারীও হয় না । পরন্তু এই ধর্ম ইহাই শিক্ষা দেয় যে, সমুদয় নরনারী জাতি, বর্ণ ও ধর্মনির্কিংশেষে অমৃতের সন্তান, প্রত্যেক জীবাত্মাই জন্মগত অধিকার অনুসারে অমর, উহা অমরত্ব লাভ করিবেই এবং চিরকাল অমর থাকিবে । আত্মা যদি স্বভাবতঃ অমর না হইতেন, তাহা হইলে কোন শক্তিমান পুরুষই ইঁহাকে অমর করিতে পারিতেন না । প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার এবং অনন্ত বিকাশ-শক্যতা ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে । শূন্য বা অসৎ হইতে কিংবা কোন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি হয় নাই । ইহা নিত্য অনাদি ও অনন্ত । ইহাই এই অদ্বৈত ধর্মের উপদেশ । এ ধর্ম ঘোষণা করিতেছে যে, আমরা আমাদের পিতামাতার পাপের অসহায় ফলভোগী নহি—আমাদের এই বর্তমান অবস্থা আমাদেরই পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই বর্তমান অবস্থারই ফলস্বরূপ হইবে । পিতা-মাতা সন্তানের আত্মার সৃষ্টিকর্তা নহেন । তাঁহারা জীবাত্মাগণের এই স্থল ভৌতিক জগতে অবতীর্ণ বা

নামে বিদিত। ইহার অর্থ এই যে, জীবাণু বা সূক্ষ্ম প্রাণবীজ স্বীয় প্রবৃত্তি ও বাসনা অনুযায়ী এই পৃথিবীতে পুনরায় অভিব্যক্ত হয় এবং সেই প্রবৃত্তি ও বাসনাই তাহার জন্ম ও অবস্থার নিয়ামক। হিন্দুগণ কৰ্ম্মফলে বিশ্বাসী। তাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে, ঈশ্বর কাহাকেও সুখ, কাহাকেও বা দুঃখভোগ করিবার জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পাপীর শাস্তিবিধান ও পুণ্যাত্মাকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। সুখ, দুঃখ, শাস্তি, পুরস্কার জীবেরই কৰ্ম্মের প্রতিক্রিয়া বা ফলমাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহজন্মে কিংবা অন্য কোন জন্মে আপনার কৰ্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।

এই সার্বজনীন ধর্ম্মকে “আত্ম-বিজ্ঞান” আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন কোনও অযৌক্তিক বাক্য গ্রহণ না করিয়া কিংবা কোন ব্যক্তি বা পুস্তকের মতকে প্রমাণস্বরূপে বিশ্বাস করিতে জেদ না করিয়া, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সম্যক দর্শন ও পরীক্ষার দ্বারা সমুদয় জাগতিক ঘটনা-সম্বন্ধীয় নিয়মাদি স্থির করিয়া থাকে, সেইরূপ এই অদ্বৈতবাদও কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বা অযৌক্তিক মতবাদ পোষণ না করিয়া গ্রাণানুমোদিত যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে মানবের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বা আত্মার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করিয়া

কিরূপে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের দ্বারা খৃষ্ট, বুদ্ধ বা রামকৃষ্ণের গায় অসীম আধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন মহামানবে পরিণত হয়, তাহা ইহাতে বর্ণিত আছে। ইহার মতে জীবাত্মা-মাত্রেই ক্রমবিকাশক্রমে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইবে। প্রত্যেক জীবাত্মা বর্তমানে—তাহা যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, পরিশেষে পূর্ণত্ব ও দেবত্বলাভ করিবেই। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, মানবাত্মা আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশকালে দ্বৈত বা একেশ্বরবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি স্তরগুলি ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অবশেষে অদ্বৈতবাদরূপ আধ্যাত্মজ্ঞান-শিখরে উপনীত হয়। যত দিন জীব দ্বৈতবাদ বা একেশ্বরবাদের স্তরে থাকে, তত দিন সে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে, ঈশ্বর এই প্রকৃতি-রাজ্যের বাহিরে বিরাজমান ও বিশ্ববহির্ভূত, স্রষ্টারূপে তিনি অসং বা শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদের নিকট হইতে দূরে—বহু দূরে তাঁহার স্থান। আমরা তাঁহার সমীপবর্তী হইতে পারি না। তিনি অতিশয় মহান, অতি উচ্চে—অতি দূরে অবস্থিত। তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস—আমরা ভূতের গায় সেই প্রভুর পূজা করিব, কিন্তু যতই আমরা সেই অনন্ত সত্তার নিকটবর্তী হই, ততই আমাদের দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, আমরা বঝিতে পারি যে, তিনি আমাদের নিকট হইতে

হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি আমাদের নিকটেই বিদ্যমান, অতএব আমরা কেন তাঁহাকে আমাদের প্রাপ্তি-সম্ভাবনার অতীত বলিয়া মনে করিব? ইহার পর বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ। এই অবস্থায় আমাদের এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, ঈশ্বর এক বিরাট অনন্ত সত্তা, আমরা তাঁহারই অংশ-মাত্র এবং প্রত্যেক জীবাত্মা সেই অনন্ত সত্তার অংশ; কিন্তু আত্মা যখন উন্নত হইয়া উচ্চতর অনুভূতি লাভ করে, তখন সকল আপেক্ষিকতা, সকল ভেদাভেদ ও সকল প্রকার সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া নিগুণ পরব্রহ্মের রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন সমুদয় নামরূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মা সেই পরব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ একত্ব লাভ করে এবং তখনই তিনি ঘোষণা করেন, “আমি ও আমার পিতা অভিন্ন।” সেই অবস্থায় আত্মা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন ঐশ্বরিক গুণ ও শক্তির ধারা সেই আত্মায় প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাহা দিব্যজ্যোতি ও মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আত্মা তখন খৃষ্টতুল্য হয় এবং খৃষ্ট বলিতে যে অবস্থা বুঝায়, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই সার্বজনীন ধর্ম্মানুসারে খৃষ্ট শব্দের অর্থ পারমার্থিক পূর্ণতা বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্তি বুঝায়। যিনিই সেই অবস্থা লাভ করেন, তিনিই খৃষ্ট হন। এই সার্বজনীন ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে,

এই খৃষ্ট প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। প্রতি আত্মায় ঈশ্বরত্বের বীজ নিহিত এবং আত্মা যখন স্বীয় দেবত্ব বা স্বর্গীয় মহিমা সম্যক উপলব্ধি করে, তখনই সেই অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যিনি সকল বন্ধন ছিন্ন এবং আপেক্ষিক ও প্রাতিভাসিক স্থল জগৎ অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার সাযুজ্য লাভ করেন এবং অদ্বৈতধর্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তখনই তিনি গুপ্ত বা বুদ্ধের অবস্থা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধ অর্থে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই বুদ্ধ। এই ধর্মানুসারে যখন বীজ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখনই খৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং বুদ্ধের যখন এই অবস্থা লাভ হইয়াছিল, তখন তিনি মানবজাতির ত্রাণকর্তা, পাপীর উদ্ধারকর্তা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এই সার্বজনীন ধর্ম আমাদের নিরতিশয় সুখ ও শান্তি উৎপাদন করে, কারণ, এ ধর্মে কাহারও জন্ত অনন্ত নরকের ব্যবস্থা নাই, নরকাগ্নি বা অনন্ত নরকভোগ বিশ্বাস করে না। ইহার মত এই যে, মানুষ জীবনে যে সকল ভ্রম করে, কার্যকারণবিধি বা ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সেই ভ্রমগুলি ফল প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু সেই ফল বা তাহার ভোগ অনন্তকালস্থায়ী হয় না। এই জন্ত যাহারা এই ধর্মের অনুসরণ করেন, মৃত্যু তাহাদের পক্ষে

যদিও বেদের উপদেশের উপর এই সার্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ও বেদেরই গ্রাম প্রাচীন, তথাপি লোকে বার বার ইহা বিস্মৃত হইয়াছে এবং বার বার লোক-পরিত্রাতা ধর্মগুরুগণ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ইহাকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃ প্রচারিত করিয়াছেন। খৃষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের পর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য এবং সর্বশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ধর্মের পুনঃ প্রচার করেন। এই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে সহস্র সহস্র শিক্ষিত হিন্দু ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা আধুনিক অবতার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। বর্তমান ভারতে যে ধর্ম-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে, তিনিই তাহার মূল। এই সার্বজনীন ধর্মের মহাপ্রাবনে তদীয় কেন্দ্রশক্তি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এক্ষণে ভারতের সমগ্র অধ্যাত্মক্ষেত্র প্রাবিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং ভারত অতিক্রম করিয়া দিন দিন পৃথিবীব্যাপী হইয়া পড়িতেছে। ইহা জগতের ধর্মরাজ্যে আজ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, এই বিপ্লবের ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয়ই অতি অদ্ভুত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের সমাজ ও জাতিভেদ-প্রথা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভারতের আৰ্য্যগণ ধর্ম্যবিশ্বাসে পূর্ণ স্বাধীনতার মহান আদর্শ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। স্বরগাতিত কাল হইতে প্রত্যেক ধর্ম্মভেদের প্রতি তাঁহারা সম্পূর্ণ সহনশীলতা প্রদর্শন করিয়া আনিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতের ইতিহাসে কোথায়ও ধর্ম্মের জন্ত কোন নির্যাতন বা অত্যাচারের উল্লেখ নাই। এমন কি, নিরীশ্বরবাদী এবং অস্ত্রেরবাদিগণও ভারতে নিরুপদ্রবে বাস করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে কোনপ্রকার নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। যদিও মুসলমান ও খৃষ্টানগণ হিন্দুগণকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তথাপি হিন্দুগণ তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ বৈরিভাব পোষণ বা অত্যাচার করেন না, বরং তাঁহাদিগের সহিত শান্ত ও ভদ্রভাবে বাস করিতেছেন। বস্তুতঃ এই ভারতবর্ষ সার্বজনীন সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম্মবিষয়ে মত-স্বাধীনতার পুণ্যক্ষেত্র। সামাজিক জীবনে কিন্তু হিন্দুগণ পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর কঠোর বিধি অনুসারে চলেন।

বিধি-সমূহ অধিকতর কঠোর ও অবশ্য প্রতিপাল্য। হিন্দুগণ মুসলমান বা খৃষ্টান প্রভৃতি জাতির সহিত বিবাহাদি দ্বারা কোনপ্রকার সম্বন্ধ সৃজন করেন না। তাঁহাদের সামাজিক আদর্শের বৈশিষ্ট্যই ইহার কারণ, ধর্মগত পার্থক্য নহে।

হিন্দুগণ সামাজিক আচার-ব্যবহারে, বোধ হয়, এমন কি, চীন বা জাপানবাসী অপেক্ষাও রক্ষণশীল। দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিদেশীয় শাসন এবং বিদেশীয় জাতিগণ কর্তৃক বারংবার ভারতের লুণ্ঠন ও আক্রমণই এই রক্ষণ-শীলতার কারণ। আমরা অবগত আছি, সর্বপ্রথমে গ্রীক-গণ ভারত আক্রমণ করেন এবং তৎপরে পর্যায়ক্রমে সিথিরা ও মর্দোলিয়াবাসিগণ, তাতারবাসী মুসলমানগণ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও অন্যান্য খৃষ্টানজাতি কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইয়াছে। এই দুর্দৈব জাতিগণ ভারতের উপর ভীমবেগে পতিত হইয়া ভারতের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন এবং ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীন গৌরবময় স্মৃতিসমূহ ধ্বংস করিয়াছে। উহারা হিন্দুর সাহায্যার্থ আগমন করে নাই—তাহাদিগকে সর্বস্বান্ত করিবার জন্তই আসিয়াছিল। একটা বিরাট রক্ষণশীলতা না থাকিলে কোন্ জাতি এইরূপ বারংবার আক্রান্ত হইয়াও নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে-সমর্থ হইত? মিশরীয়, পারস্য ও অন্যান্য যে সকল জাতি যথাসময়ে এইরূপ ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, তাহারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুগণ যে অদ্ভুত

রক্ষণশীলতার প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, অধুনা তাহা সমগ্র সভ্যজগতের একটা বিশেষ শিক্ষার বিষয়। এই রক্ষণশীলতাই হিন্দু জাতিকে সজীব রাখিয়াছে এবং ইহা পূর্বোক্ত প্রবলপরাক্রান্ত বিদেশীয় শক্তিগণের পক্ষে অতি দুর্ভেদ্য সামাজিক প্রাকার সমূহ সৃষ্টি করিয়া আর্থ্যশোণিত ও আর্থ্যসাহিত্য কলুষিত হইতে দেয় নাই।

কোন বিদেশীয় শক্তিই হিন্দুর সামাজিক গঠন চূর্ণ করিতে পারে না। হিমগিরির বিরাট শৃঙ্গের ত্রায় ভারতের এই হিন্দু সমাজ শত্রুর প্রবল শক্তি উপেক্ষা করিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া অটলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, হিন্দু সমাজে সোধের ভিত্তি ব্যবসায়িত্বরূপ (Commercialism) অস্থায়ী বালুকাস্তূপের উপর কিংবা সাম্রাজ্য-স্পৃহারূপ জলাভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পরন্তু বেদনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধিসমূহ চিরকাল পার্থিব জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই সকল বিধির সূদৃঢ় গিরির উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা। হিন্দু সমাজের আদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ মধ্যযুগের যুরোপীয় লুণ্ঠনকারী ভূম্যধিকারী কিংবা উচ্চাভিলাষী রাজনীতিকের ন্যায় ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহারা বিশ্বপ্রেমের পবিত্র বেদীর সম্মুখে ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ, উচ্চাভিলাষ এবং শক্তি ও পদ-স্বার্থাদি লাভের বাসনা বলি দিয়াছিলেন। আধুনিক

বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন এবং তাঁহাদের নামে গৌরববোধ করেন—তাঁহাদের সেই ধর্মাত্মা পূর্বপুরুষগণের পবিত্রতা, স্বার্থশূন্যতা, আধ্যাত্মিকতা এবং ঈশ্বরানুভূতিই তাঁহাদের এই অসীম গৌরব ও গর্বের কারণ। এই মহান্ গর্বই বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর অবাধ সংমিশ্রণ বা বিদেশীয় জাতির সহিত কোনপ্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন নিবারণ করিয়া পবিত্র আর্য্যরক্তকে কলুষিত হইতে দেয় নাই। যদি তাঁহাদের এইরূপ মহান্ জাতীয় গৌরববোধ না থাকিত, যদি তাঁহারা আক্রমণকারিগণের সহিত অবৈধে সম্মিলিত হইতেন, তাহা হইলে অধুনা ভারতে পবিত্র আর্য্যকুলের বিস্তৃত শোণিতসম্পন্ন বংশধরগণের অস্তিত্ব লুপ্ত হইত।

হিন্দুসমাজ শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায় আবার বহু গোষ্ঠী বা শাখা-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সকল গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার পরস্পর বিভিন্ন। গোষ্ঠী সকল আবার বহু পরিবার বা কুলের সমষ্টিমাত্র এবং এই সকল পরিবারভুক্ত প্রত্যেক নরনারী সমাজের এক একটি মৌলিক শক্তি। প্রত্যেক নরনারীই তাহার কুলধর্ম প্রতিপালনে বাধ্য। প্রত্যেক পরিবারকে গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয় এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী বা শাখা-সম্প্রদায় আবার মূল সম্প্রদায়ের বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন গোষ্ঠীভুক্ত সকল পরিবারেরই

সর্ববিষয়ে সমান স্বাধীনতা আছে। যদি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অধিকাংশ পরিবারের মতে কোন কার্য তাহাদের চির-আচরিত প্রথার বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। যদি কেহ সর্বজনানুমোদিত এই বিধি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে স্বীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তাহার পারিবারিক জীবনের সকল অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। সে নিজ গোষ্ঠীভুক্ত কোন পরিবারের সহিত মিশিতে বা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না এবং সম্প্রদায়ের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয়।

এই গোষ্ঠী বা শাখা-সম্প্রদায়গুলি সংস্কৃত সাহিত্যে “গোত্র” নামে অভিহিত। ইহার প্রকৃত অর্থ বংশ অর্থাৎ একই আদি পুরুষের বংশধরগণ একই গোত্রভুক্ত। প্রথমে গোত্রপতি অর্থাৎ গোত্রের সৃষ্টিকারক প্রায় ২৪ জন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৈদিক যুগের দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন। বৈদিক স্তোত্র সকল এবং ভারতের অগ্ৰাণ্য ধর্মশাস্ত্রসমূহ তাঁহারাই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই জননায়ক ও গোষ্ঠীপতি ছিলেন। আমরা সেই ঋষিগণেরই বংশধর।

বহু গোত্রের সমষ্টিকেই সংস্কৃত-সাহিত্যে জাতি বলে। প্রত্যেক সম্প্রদায় বহু গোষ্ঠীর সমষ্টি। ইহারা একত্রে বস-

অকর্তব্য, বিবাহকার্য, মৃতের সংকার, শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড, আমোদ-প্রমোদ, বৃত্তি, ব্যবসায়, শিল্প প্রভৃতি সামাজিক জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রত্যেক সম্প্রদায় পরম্পরাগত বিধি-ব্যবস্থা মানিতে বাধ্য। এই সকল সামাজিক বিধিকে জাতিধর্ম বলা হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের হীনতম চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলকেই এই জাতিধর্ম বা সাম্প্রদায়িক অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। কোন প্রকার বৃত্তি, ব্যবসায় বা শিল্প যদি সমগ্র সম্প্রদায় কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে তদন্তর্গত কোন ব্যক্তিই তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কেহ কোন প্রকার কামনা চরিতার্থ করিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে সর্বোপায়ে তাহাকে দেখিতে হইবে যে, তাহা কুলধর্ম, গোত্রধর্ম ও জাতিধর্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত কি না। এই তিন ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। যদি কোন প্রকার মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র সম্প্রদায় কোন পরিবার এবং ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে, তাহাই তাহার নিষিদ্ধবাদে মানিতে বাধ্য। সমগ্র সম্প্রদায়মধ্যে যাহারা নেতৃপদাভিষিক্ত, তাঁহাদিগের মীমাংসাই চূড়ান্ত। পারিবারিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গোষ্ঠীর স্বার্থানুরোধে পারিবারিক স্বার্থ এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের কল্যাণ হেতু গোষ্ঠীর স্বার্থ বিসর্জিত হইয়া থাকে।

এই শাসনপ্রথা কিছু বিচিত্র বটে, কিন্তু ইহা ভারতে বহু শতাব্দী যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, স্বার্থত্যাগই হিন্দুর জীবন অর্থাৎ প্রত্যেক হিন্দুকেই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সততই নানা প্রকার স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। কি পুরুষ, কি স্ত্রী স্বার্থচিন্তা কাহারও আদর্শ নহে। আত্মমুখে, আপনার স্বচ্ছন্দে বা বিলাসে কাহারও অধিকার নাই—সকলকেই প্রথমে পরিবারের, পরে গোষ্ঠীর এবং পরিশেষে সমগ্র সম্প্রদায়ের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ভারতীয় সামাজিক নীতির ইহাই বৈশিষ্ট্য। এই ভাবের সাম্প্রদায়িক শাসন অবশ্য কিয়ৎপরিমাণে প্রায় সর্বদেশেই কোন না কোন ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের গ্রাম অগ্র কোথাও ইহা তেমন কঠোর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নহে।

সম্প্রদায়গুলির নিজেদের মধ্যে কোন প্রকার সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য নাই। সকল সম্প্রদায়ই মহান্ এবং সকল গোষ্ঠীই সমান। প্রত্যেক সম্প্রদায় এক একটি সামাজিক গণতন্ত্রবিশেষ। কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিধি-ব্যবস্থার সহিত অন্য সম্প্রদায়ের কোনও সংঘর্ষ হয় না। এ বিষয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সমষ্টিরূপে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের সে স্বাধীনতা নাই, তাহাদিগের সকলে সাম্প্রদায়িক বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে বাধ্য। যদি

নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, নচেৎ সেরূপ ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করা হয়। হিন্দুর পক্ষে সমাজচ্যুতির ঞ্চায় গুরুদণ্ড আর নাই। সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে তাহার সমাজ-ভুক্ত কেহই আর নিমন্ত্রণ করিবে না এবং তাহার নিমন্ত্রণও কেহ গ্রহণ করিবে না। জাতকর্ম্ম, মৃত্যু বা বিবাহাদি কার্যে তাহার স্বজাতীয় কেহই তাহার সহিত যোগ দিবে না—সে সংসারে নিতান্তই বন্ধুহীন ও অসহায়। এরূপ ব্যক্তি অণ্ড কোন সমাজেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না—হিন্দু সমাজের জাতিবিভাগই ইহার অন্তরায়। হিন্দু-গণের মধ্যে সামাজিক শাসনের এমনই প্রভাব ও দৃঢ়তা।

বিদেশীয়গণ এ সামাজিক শাসনের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ, কারণ, তাঁহারা কোন প্রকার সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। যাহারা কোন রকম সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না। এই সকল নিয়ম বা অনু-শাসন কোথায়ও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার প্রভাব পুস্তকে লিখিত বিধি অপেক্ষাও অধিক। বিদেশীয় ব্যক্তিগণ একই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন জাতিগণের মধ্যেও পরস্পর বিবাহ বা অন্য কোন সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনের কোনও বিধি না থাকার কারণ বুঝিতে পারেন না। যেমন ব্রাহ্মণ-জাতি ভারতের সর্বত্রই আছেন, কিন্তু বোম্বাই প্রদেশের ব্রাহ্মণ কলিকাতা, মাদ্রাজ কিংবা পঞ্জাবের কোন ব্রাহ্মণের

সহিত বিবাহাদি কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, ইহারা সকলে ব্রাহ্মণ হইলেও এক সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। আবার একই বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও বিবাহ ও আহাৰাদি অবাধে চলিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সমসম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্নগোত্রীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধস্থাপনে কোন বাধা নাই।

গোষ্ঠী বা গোত্রগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখা, তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের আৰ্য্য-শোণিত যথাসাধ্য পবিত্র রাখা এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে জীবনযাপন করানই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। যদ্বারা কোন ব্যক্তি বা পরিবারের নৈতিক উৎকর্ষ সম্ভব, সমাজ তাহাই অনুমোদন করিয়া থাকে এবং যাহা দ্বারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন হয়, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। এইরূপে সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সকলেই জীবনযাপন ও সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকেন; একান্তবর্তী পরিবারভুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন পূর্বক সুখ ও আনন্দ ভোগ করেন এবং নানা ভাবে সমসম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য পরিবার ও ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য কৰ্ম্ম করিয়া সমাজের সেবা

তৎপরে স্বগোষ্ঠীয় অগ্ৰাণ্য পরিবারের, তদনন্তর তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত অগ্ৰ পরিবারবর্গের সাহায্য ও উপকার করাই তাঁহার কর্তব্য। তাহার পর যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তিনি অগ্ৰাণ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের অথবা সর্বজন-হিতকর মহৎকর্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় যেন এক একটি পরিবার এবং একই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবল একতা ও সহানুভূতি বিদ্যমান। এই কারণেই ভারতবর্ষে ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সর্বসাধারণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ও সেবা-শ্রমের কখনও প্রয়োজনও হয় নাই। এখানে অনাথাশ্রম, দরিদ্রাশ্রম বা অগ্ৰ কোন প্রকার দানশালার আবশ্যক হয় নাই, কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন আপন অনাথ ও দরিদ্রের ভার বহন করিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য জাতিগণ দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া দেন—আমরা তাহাদিগকে আপন গৃহে লইয়া গিয়া অন্ন-বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকি। ইহাই আমাদের কর্তব্য; কারণ, এই সকল আতুর ও অনাথ আমাদের ভাই। ইহা অপেক্ষা মহত্তর প্রথা জগতে আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গ বহুবিধ ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রকার সামাজিক শাসনপ্রথাই হিন্দুর যোগ্য ও উপযুক্ত। তাঁহাদিগের ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক

ব্যক্তিই নিজ নিজ বাটার সম্মুখস্থ পথটুকু পরিষ্কৃত রাখিলে সমস্ত পথটিই যেরূপ পরিষ্কৃত হইয়া যায়, সেইরূপ সমগ্র হিন্দুজাতি যে সকল পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাহাদের প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব পরিবারবর্গের মধ্যে এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধিসমূহ দৃঢ়ভাবে প্রবর্তিত রাখেন, তাহা হইলে সমগ্র জাতিই নীতিধর্মপরায়ণ ও অধ্যাত্মতাবাপন্ন হইবে। এইরূপে তাঁহারা ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে মূলস্বরূপ বিবেচনা করিয়া স্বাভাবিক নীতির উপর একটি সুন্দর প্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন—সমগ্র হিন্দুজাতিকে একটি অখণ্ড পরিবারে পরিণত করিয়াছেন।

কিন্তু সম্প্রদায়গুলির বর্তমান অবস্থাকে আর নির্দোষ বলা যায় না। ইহারা যেন প্রাণহীন বদ্ধ পদার্থবৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের বিধি-নিয়ম ও আদর্শ-সমূহ এমনই কঠোর বাধ্যতামূলক ও অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, যুগপরিবর্তন অনুযায়ী তাহাদের পরিবর্তন করিবার উপায় নাই। ইহার কারণ, এই প্রচলিত ব্যবস্থা ও আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া স্বীয় আদর্শ ত্যাগ করিয়া সুবিধামত অন্য আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন, ইহাতে অবশ্য তাঁহাকে গোত্র বা গোষ্ঠীচ্যুত হইতে হইবে।

সাম্প্রদায়িক শাসন পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত ধর্মযাজকদিগের প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ এবং কল্যাণকর। কারণ, সামাজিক ব্যাপারকে ধর্ম হইতে পৃথক রাখা উচিত, নতুবা ধর্মবিরোধ ও অত্যাচার পীড়নাদি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্তই ভারতে ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এতটা সহনশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে সামাজিক ব্যাপারের জন্ত ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবাসী আপন কুচি অনুসারে স্বাধীনভাবে যে কোন প্রকার উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। ইহার সহিত তাহার সামাজিক অবস্থার কোন সম্বন্ধ নাই। এই জন্তই বলিতে হয় যে, ভারতে প্রচলিত এই সামাজিক শাসনবিধি যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, ইহাতে অন্ততঃ এই সুবিধা আছে যে, ইহা ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং একই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তুল্যপরিমাণে অধিকার, সুযোগ ও সুবিধাদি প্রদান করিয়া থাকে। কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সে বিষয়ে আলোচনা করিতে এবং স্বাধীনভাবে স্ব স্ব মত ব্যক্ত করিতে পারে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আভিজাতিক বা সম্রাট, মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণী আছে। নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীগুলি উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং উচ্চতর

শ্রেণী হইতে অনুগ্রহ ও সাহায্যাঙ্গি আশা করিয়া থাকে । কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য-শালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জন্মগত অধিকার বা অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন না । তিনি তাঁহার গোত্র বা জাতি পরিবর্তন করিতেও অসমর্থ । অন্য কোন গোত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিবে না এবং অন্য কোন জাতি তাঁহাকে আশ্রয় বা অধিকতর অধিকার প্রদান করিবে না । হিন্দু যে জাতি, গোত্র বা পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবে, সমাজে সে তদনুযায়ী মর্যাদা প্রাপ্ত হইবে । যেমন কলিকাতার কৈবর্তজাতির মধ্যে রাণী রাসমণি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রভূত ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ভারত-বর্ষে স্ত্রীলোকে নিজের বিষয়-সম্পত্তি নিজে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয় । তাহারা অবাধে বিষয়াঙ্গি ভোগ ও তাহার ব্যবস্থা করিতে পারে ; এ বিষয়ে তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে কেহই পারে না । এই কৈবর্ত-কণ্ঠা অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তাঁহার নিজ সম্পত্তি উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । তিনি মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি বহু সংকার্য্যে অর্থব্যয় এবং সমাজের হিতকর নানা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন । তাঁহার সংকর্ম্মময় সাধুজীবন, তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত অন্যান্য সকলের পক্ষে আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল । তিনি

সমাজভুক্ত সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। তিনি স্বীয় সমাজের “রানী” আখ্যা পাইয়াছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায় যথা ব্রহ্মণাদি জাতিও তাঁহাকে শতমুখে প্রশংসা করিতেন; তথাপি তিনি কখনও আপনার গোত্রত্যাগের চিন্তা মনে স্থান দেন নাই বা তাঁহার স্বীয় জাতিগত বিধি-ব্যবস্থা কখনও উল্লঙ্ঘন করেন নাই।

এই সমস্ত জাতি আবার বৃহত্তর শ্রেণীর অংশ বা বিভাগ-মাত্র। ইংরাজীতে ইহাকে Caste বলা হয়। এই Caste শব্দটি ভারতে প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে এবং এই শব্দ দ্বারা হিন্দুদিগের জাতিবিভাগ বুঝায় না। আমরা ইহা যত কম ব্যবহার করিব, প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু-সমাজের বিশিষ্টতার উপলব্ধি আমাদের পক্ষে ততই সহজ হইবে। পর্তুগীজ ভাষায় Casta শব্দে জন্মগত শ্রেণী বুঝায়, ইংরাজী Caste শব্দ এই পর্তুগীজ Casta শব্দেরই রূপান্তর। ষোড়শ শতাব্দীতে কতকগুলি অশিক্ষিত পর্তুগীজ নাবিক প্রথমে হিন্দু সমাজের কতকগুলি শ্রেণী সম্বন্ধে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিল। তখন ইহার অর্থ ছিল পবিত্র ও অবিমিশ্র রক্তসম্পন্ন বংশ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার কোন প্রতিশব্দ নাই। বেদ হইতে মনুসংহিতা ও পুরাণ পর্যন্ত হিন্দুদিগের কোন গ্রন্থে কোথাও Caste বলিতে বুঝায়, সেরূপ অর্থবোধক কোন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে

পাওয়া যায় না। Caste শব্দের দ্বারা সংস্কৃত “বর্ণ” শব্দটিকেই ভাষান্তরিত—ভ্রমপূর্ণভাবে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। এই বর্ণ শব্দ দ্বারা প্রাচীন ভারতের বিজেতা আর্য্যগণ ও আদিম অনার্য্যগণের মধ্যে জাতিগত দৈহিক রঙের পার্থক্যই সূচিত হইত। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন :—“বর্ণশব্দ দ্বারা কালক্রমে পরবর্তী সংস্কৃত ভাষায় জাতি বুঝাইলেও ঋগ্বেদে ইহা আর্য্য ও অনার্য্যগণের পার্থক্যজ্ঞাপক শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে— আর্য্যগণের জাতিবিভাগ নির্দেশ করিবার জন্য কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।”

ক্রমশঃ এই বর্ণগত পার্থক্য হইতেই আর্য্যগণের মধ্যে জাতিবিভাগের উৎপত্তি। কারণ, ভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই—“চাতুৰ্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।” অর্থাৎ ভগবান্ সমগ্র মানবজাতিকে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারিটিই বিভিন্ন মানবগণের মূল বর্ণ ছিল। এই চারিটি আদিবর্ণের সংমিশ্রণ হইতেই জগতে নানাবিধ জাতিবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা শ্বেতবর্ণ, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; যাঁহারা লোহিত-বর্ণযুক্ত, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ; পীতবর্ণ ব্যক্তিগণ বৈশ্য এবং যাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহারা শূদ্র বলিয়া অভিহিত

এই চারি শ্রেণীর বিভিন্ন গুণ ও কর্ম সকল গীতার বর্ণিত
হইয়াছে ; * যথা—স্বভাবজাত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম সকল প্রবিভক্ত হইয়া থাকে ।
শম, দম, তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও
আস্তিক্য বা ঈশ্বরে বিশ্বাস এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত
গুণ । শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে পলায়নের
প্রকৃতি-রাহিত্য, দান, নিয়ন্তৃত্ব ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক
গুণ । কৃষি, গো-পালন ও রক্ষণ, বাণিজ্য ও শিল্পাদি বৈশ্যের
স্বভাবজাত কর্ম এবং উচ্চতর জাতিগণের একনিষ্ঠ সেবাই
শূদ্রের কর্ম । স্বীয় কর্তব্যসম্পাদন দ্বারাই মনুষ্য সংসিদ্ধি বা
পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে । অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে,
কেবলমাত্র বর্ণের পার্থক্য দ্বারা কাহারও জাতি নির্দ্ধারিত
হইত না ; তাহার স্বভাবজাত গুণ ও কর্মসমূহও প্রধানরূপে

* ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ! ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজ্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রাহ্মণং কর্ম স্বভাবজম্ ॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দীক্ষাং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥
কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাশ্রকং কর্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজম্ ॥
স্বৈ স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
অকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিস্মতি তৎ শৃণু ॥

(অঃ ১৮ শোঃ, ৪১-৪৫)

বিবেচিত হইত। জাতিবিভাগ সম্বন্ধে ইহাই ছিল হিন্দুগণের মূল ধারণা। পাদ্রী বা খৃষ্ট যাজকগণ ও বিদেশীয়গণ হিন্দুদিগের জাতিবিভাগের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ব্রাহ্মণগণ স্বাভাবিক গুণ দ্বারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদন করিতে পারিতেন এবং এই সকল কার্য নিষ্ঠা এবং নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বভাবজাত প্রেরণার বশবর্তী হইয়া বিবিধ বিজ্ঞান ও দর্শনাদির এবং বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা শাস্ত্রীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতেন এবং সর্বজাতির পোরোহিত্য ও যাজনাদি ক্রিয়া করিতেন। যাহারা যোদ্ধা ছিলেন, সৈনিক ও সেনানায়কের কার্য করিতেন এবং দেশ শাসনের ভার যাহাদিগের হস্তে ব্রহ্ম ছিল, তাঁহারাই ছিলেন ক্ষত্রিয়। বৈশ্যগণের প্রতি কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পকার্যের ভার অর্পিত ছিল। আর যাহারা উক্ত উচ্চতর তিন শ্রেণীর গৃহে দাসত্ব ও পারিবারিক কর্মাদি করিয়া জীবনযাপন করিত, তাহারাই শূদ্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুসমাজে এই ভাবে একটা শ্রমবিভাগের প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির পদ, কর্তব্য কর্ম এবং পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট ছিল।

এই ভাবের শ্রমবিভাগ সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে কিংবা

দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আৰ্য্যজাতি মধ্য এসিয়া হইতে প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা অতি সুসভ্য ছিলেন। তাঁহারা কৃষিকর্ম জানিতেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অদ্ভুত সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ছিল। যখন তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রমবিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে স্বাভাবিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রথম এই শ্রেণীবিভাগ একরূপ অপরিবর্তনীয় ছিল না। অর্থাৎ এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়নাদি সম্ভব ছিল। জাতিমূলক এই সামাজিক পার্থক্য সে যুগে এমন কঠোর অপরিবর্তনীয় ছিল না, কিংবা কোন বৃত্তি বা পেশা জন্মগত ছিল না। আমরা বেদ এবং হিন্দুদিগের অগ্ণাণ প্রাচীন গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন এবং তাঁহারা উপযুক্ত হইলে বুদ্ধবৃত্তিও অবলম্বন করিতেন। আবার ক্ষত্রিয়গণও প্রায়ই ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষকতা করিতেন। বস্তুতঃ আমরা অধুনা যে সকল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হইরাছি, তাহাদের অধিকাংশই ক্ষত্রিয়গণের দান—ব্রাহ্মণের নহে। এই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অবাধে পরস্পরের সহিত মেলামেশা করিতেন এবং যখনই কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলী অর্জন করিতেন, তখনই তিনি

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইতেন। একপক্ষ
ক্ষত্রিয় ছিলেন, বাঁহারা মহত্ত্ব ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরে
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ইহাও লক্ষ্য করিবার
বিষয় যে, ভারতবর্ষীয় অবতারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই
ক্ষত্রিয় ছিলেন, ব্রাহ্মণ ছিলেন অতি অল্প। মহাভারতে
জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য প্রকার বিবরণ
দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মহাভারতের শান্তিপর্বে
১৮৮-১৮৯ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, ভরদ্বাজ মুনি ভৃগু মুনিকে
প্রশ্ন করিতেছেন,—“যদি চারি জাতির বিভাগ বর্ণের পার্থক্য
হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির
মধ্যেই আবার বর্ণের এতটা পার্থক্য লক্ষিত হয় কেন?” *

“কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, উদ্বেগ, ক্ষুধা এবং

ভরদ্বাজ উবাচ—

চাতুর্বর্ণ্যস্ত বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিद्यতে ।

সর্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৬ ॥

কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ ।

সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিद्यতে ॥ ৭ ॥

শ্বেদমুত্রপূরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্ ।

তনুঃ ক্ষরতি সর্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভির্জ্যতে ॥ ৮ ॥

জঙ্গমানামসংখ্যোয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতরঃ ।

তেষাং বিবিধবর্ণানাং ঙ্কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৯ ॥

ভৃগুবাচ—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কল্পভির্বর্ণতাং গতম্ ॥ ১০ ॥

কামভোগপ্রিয়ান্দীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ ।

ত্যাগস্বধর্ম্মা রক্তকান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাস্তে ॥ ১১ ॥

ক্লান্তি সকলেরই উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । তবে জাতিবিভাগের সার্থকতা কোথায় ? স্থাবরজঙ্গমাদির মধ্যে অসংখ্য শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাদিগের মধ্যেই বা জাতিবিভাগ কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে ?”

উত্তরে ভৃগু কহিতেছেন :—“জাতিবিভাগ বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই । ব্রহ্মা যখন জগৎসৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন, তখন সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন । পরে কশ্মের পার্থক্য
বশতঃ জাতির উৎপত্তি বা এই জাতিবিভাগ হইয়াছে ।
যে সকল দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ বাসনার তৃপ্তিসাধনে অনুরক্ত
হইলেন, যাহারা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ ও নির্ভয়ে উদ্দেশ্য-
সাধনে কৃতসঙ্কল্প, যাহারা স্বধর্মত্যাগী ও রক্তবর্ণ, তাঁহারাই
ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । যে সকল ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ
গোজাতির সেবা অবলম্বন করিয়াছেন ও কৃষিকার্য্য
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, যাহারা পীতবর্ণ ও স্বধর্ম-
হীন, তাঁহারাই বৈশ্য উপাধি লাভ করিলেন । যে সকল
দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হিংসাপরায়ণ, লোভী, অনৃতভাবী,

গোভ্যা বৃত্তিং সমাহায় পীতাঃ কৃশ্যাপজীবিনঃ ।

স্বধর্ম্মান্নুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ ১২ ॥

হিংসানৃতপ্রিয়া লুকাঃ সর্বকর্ম্মোপজীবিনঃ ।

কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টান্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্বাস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ ।

ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিবিধ্যতে ॥ ১৪ ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব অধ্যায় ১৮৮ ।

সর্বকর্মোপজীবী অর্থাৎ যাহাদিগের কোন প্রকার নির্দিষ্ট উপজীবিকা নাই, যাহারা শুচিব্রহ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহারা ই শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল কর্মের পার্থক্য হইতেই বিজগণের জাতিভেদের উৎপত্তি।”

বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য্যগণের বর্ণ ও কর্মভেদে এই চারিটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ ছিল। কিন্তু কালক্রমে উক্ত শ্রেণী সকলের মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও অধঃপতন প্রথা অর্থাৎ তাঁহাদের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি তিরোহিত হওয়ায় খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এক নিত্য অপরিবর্তনীয় বংশগত জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল। এই সময় এই জাতিভেদপ্রথার মহা সংস্কাররূপে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তিনি পুরোহিতের আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন এবং এই কৃত্রিম বংশগত জাতিবিভাগ-রূপ প্রতিবন্ধ চূর্ণ করিয়া সর্বশ্রেণীর লোককে সমান করিয়া দেন। হিন্দুজাতিবিভাগ অনুসারে কোন ব্রাহ্মণ যদি পুরোহিত হন, তবে তাঁহার পুত্রও পুরোহিত হইবেন, এবং ক্ষত্রিয়ের পুত্র যোদ্ধাই হইবেন। প্রথমে অবশ্য বিভিন্ন রকমের কর্মসমূহের পূর্ণত্বসাধনের উদ্দেশ্যেই এইরূপ জাতিভেদপ্রথা প্রবর্তিত হয়। প্রাচীন মনীষী ও সমাজপতিগণ বংশগত গুণানুবৃত্তির তত্ত্ব (Laws of heredity) এরূপ সুন্দররূপে বুঝিতেন যে, তাঁহারা বংশানুক্রমিক সংক্রমণের

কিন্তু বুদ্ধদেব মানবসমাজকে সেই বৈদিকযুগের স্বাভাবিক ও সহজ অবস্থায় পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং সমাজের সেই ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও অধঃপতন প্রথাই অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ব্রাহ্মণের ঔরস-জাত পুত্রকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না, কর্ম ও গুণানুসারেই ব্যক্তিগণের পার্থক্য নির্ণয় করিতেন। যিনিই শাস্তি, সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা, ধর্মপ্রিয়তা, ঐকান্তিকতা, সর্বভূতে প্রেম, দিব্যজ্ঞান প্রভৃতি সদ্বৈশিষ্ট্য-সমূহের অধিকারী, তাঁহার মতে তিনিই ব্রাহ্মণ। প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ অর্থাৎ যত দিন ভারতে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্য ছিল, তত দিন ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের বংশ-জাতি-ভেদ ভুলিয়া গিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে ভারতে বৌদ্ধ-ধর্মের অধঃপতন হয় এবং উহাতে নানাপ্রকার ব্যাভিচার প্রবেশ করে। এই অবসরে প্রাচীনমতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ পুনরায় তাঁহাদের পূর্ব প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সেই প্রাচীন বংশানুক্রমিক জাতিবিভাগ-প্রথার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজদেহ সেই প্রাচীনভাবে গঠিত করিলেন। ইহার পর মুসলমানগণ ভারতে পদার্পণ করেন এবং ছয় শত বৎসর যাবৎ হিন্দু-সমাজের ধ্বংসসাধনে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হন নাই। এই যুগে যে

কেহ ইসলাম আদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, হিন্দুগণ তাহাকেই সমাজচ্যুত করিয়াছে। এই ভাবে হিন্দু-সমাজ বহু প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ এবং রমণী হারাইয়াছে। যাহারা মুসলমানের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন কিংবা অবাধে মেলামেশা করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়া সামাজিক অধিকার হইতে সর্বতোভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা কোন প্রকারেই আর হিন্দু-সমাজে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ভারতের সেই মহান্ আর্য্যঋষি-গণের বংশধরগণ এই ভাবেই ধর্ম্মানুকূলা প্রকাশ ও শক্তির অপব্যবহার করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ ও সমাজ-পতিগণ অত্যন্ত অদূরদর্শী ও কুসংস্কারসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন এবং সর্বসাধারণের উপর প্রভুত্ব করিবার ও সমগ্র হিন্দু-সমাজকে আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা তাঁহাদের হৃদয়ে বলবতী ছিল। যদি অদূরদর্শী গোঁড়া সমাজপতিগণ এরূপ ভেদজ্ঞানসম্পন্ন ও সঙ্কীর্ণচেতা না হইতেন, তাহা হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এতটা বিচ্ছেদ আত্মপ্রকাশ করিত না, আর ভারত আজ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতিগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত। যদি চারি শ্রেণীর অন্তর্গত স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে একতা থাকিত, তাহা হইলে কোন বিদেশীয় শক্তি আজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে

“এই সকল জাতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে সকলের একতা অসম্ভব হওয়ায় আমাদের ভারতশাসন এত সহজ হইয়াছে।”

কিন্তু ভারতে এখন পরিবর্তনের যুগ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ভারতের যে অবস্থা ছিল, তাহা আর এখন নাই। জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর চোখ খুলিয়াছে, মোহ টুটিয়াছে। এই বিশাল দেশের চতুর্দিকে সামাজিক সংস্কারের সাড়া পড়িয়াছে। ভারতের জনসাধারণ তাহাদিগের সামাজিক ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছে। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যদি এই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে ভারতের জাতীয় জীবনের অবসান অবশ্যম্ভাবী। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কুসংস্কারের লৌহ-বেষ্টনীতে আবদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই বিচ্ছেদ ও স্বতন্ত্রতায় সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের এই বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে একত্র করিয়া এক অথও বিরাট জাতিতে পরিণত করিবার প্রয়াসী। তাঁহাদের ইচ্ছা, প্রত্যেক ব্যক্তি উপলব্ধি করুন যে, তিনি কেবলমাত্র কোন পরিবার, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কিংবা বর্ণভেদ দ্বারা সীমাবদ্ধ হিন্দুজাতির কোন বিভাগবিশেষের অংশমাত্র নহেন; তিনি সমগ্র ভারতীয় আর্য্যজাতির একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ। বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মিলন-সাধনই

আধুনিক সমাজসংস্কারকগণের চরম লক্ষ্য । এই সংস্কার-কার্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এই সংস্কারকে কার্যকর ও সার্বজনীন করিয়া তুলিতে এখনও বহুকাল অতীত হইবে ।

হিন্দুগণের সমাজ-সংগঠনে এখন আর কোন শৃঙ্খলা নাই । এখন সমাজে বিপ্লব ও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দুগণ স্ব স্ব উচ্চবংশের গৌরব করিতেন ; কিন্তু বিদেশীয় শাসন হইতে উদ্ভূত তীব্র প্রতিযোগিতা ও নিরতিশয় দরিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে এখন অনসমস্তাই সকলের সমগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে । ভারতের জনসাধারণ এখন অতি দরিদ্র । আজ তাহাদের সকল বস্তুরই অভাব—আহার্য্য নাই, পরিধেয় বস্ত্র নাই, আজ তাহাদের মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই । তাহাদের পরিবার-প্রতিপালনের কোন উপায় নাই । এখন যাহার অর্থ আছে, সমাজে তাহারই মর্যাদা অধিক । এক্ষণে উচ্চবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ তাহার বংশমর্যাদা ও কুল-প্রথা অগ্রাহ্য করিয়া সামান্ত বেতনের ভৃত্য বা পাচকের কার্য্যও করিয়া থাকেন । বর্তমান যুগে সর্বপ্রথম সমস্তা জীবনধারণ । বর্তমান যুগে এক জন অতি হীনজাতীয় শূদ্রও যদি ধনবান্ হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণও তাঁহার নিকট নতশির হইতে কুণ্ঠিত নহেন । বিশ বৎসর পূর্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে গুরুজন জ্ঞান করিতেন ; কিন্তু আজ আর জ্যেষ্ঠভ্রাতা গুরুজন নহেন, তিনি সহচর বন্ধুমাত্র ।

সমাজের সে কঠোর শাসন আর নাই। গুরুজনের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনে সমাজ আর এখন কাহাকেও বাধ্য করিতে পারে না। এক্ষণে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; এক্ষণে সকলেই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী।

হিন্দুদিগের এখন পরিবর্তনের যুগ। বর্তমানে হিন্দুর সামাজিক উন্নতি সহানুভূতিবিহীন রাজশক্তি কর্তৃক প্রতি-
হত হইয়াছে। এই রাজশক্তির আমলাতন্ত্র আজ হিন্দুজাতির শক্তি হরণ করিয়া উহাকে দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে। যে সকল ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বণিকসঙ্ঘের এক দিন হিন্দুসমা-
জের উপর অসীম প্রতিপত্তি ছিল, আজ তাহাদের কোনই আধিপত্য নাই। ইংরাজ রাজশক্তির সাহায্যে ইংরাজ বণিক-
গণ ভারতের ব্যবসায়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া তথা হইতে দেশীয় বণিকগণকে দূরীভূত করিয়াছেন, এবং দেশের ব্যব-
সায়-বাণিজ্যের ধ্বংসসাধন পূর্বক লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে একেবারে সর্বস্বান্ত করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সহস্র সহস্র, এমন কি, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ একেবারে বেকার বসিয়া আছে। শিল্পোন্নতির জন্ত কোন উৎসাহ প্রদান করা হয় না। জনসাধারণকে বাধ্য হইয়া কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছেন। ইহার ফলে শ্রমজীবীগণ দৈনিক ৬০ ছই আনা হইতে ১২০ পাঁচ

আনা পারিশ্রমিক লাভ করিয়া বহুকষ্টে স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এরূপ প্রতিবন্ধক ও ধ্বংসকারী শক্তির অধীনে সামাজিক উন্নতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? হায়! ইঁহারাই আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্ব করিয়া থাকেন। ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ ভারতীয় অধিবাসীদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আগ্রহে বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-প্রথার দোষ ও তাহার ফলে ভারতের নৈতিক জীবনের যে অধঃপতন সম্ভব, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল হিন্দুধর্ম্মকেই ভারতীয় হিন্দু-সমাজের যাবতীয় দোষ ও ক্রটির একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক, তাঁহারা হিন্দুর সমাজগঠন ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা ইহার পরিবর্ত্তে কোন শ্রেষ্ঠতর প্রথা দিতে পারেন কি? আমরা জানি যে, যুরোপের ও আমেরিকার বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নহে, এমন কি, ভারতের বর্ত্তমান দূষিত জাতিভেদ প্রথার তুলনায়ও ইহা হীন ও অসম্পূর্ণ। এই খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ এ কথা বুঝেন না যে, যাহারা হিন্দু-সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের এই ভ্রমের জন্ত যাবজ্জীবন কি তীব্র অনুতাপ ভোগ করে। এই ধর্ম্মান্তরগ্রাহীরা কি খৃষ্টীয় সমাজে কোন স্থান পায়? আমেরিকার নিগোগণ কি

আমেরিকাবাসী খ্ৰেতকায় খৃষ্টানদের সহিত সমাজের তুল্য অধিকার ভোগ করিয়া থাকে ? কখনই নয় । খৃষ্টানগণ প্রথমে তাহাদিগের হৃদয় হইতে জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ সমূলে উৎপাটিত করুন । তাঁহারা কি এই কার্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ? যদি না করিয়া থাকেন, তবে কিরূপে এই হিন্দুসমাজের বিরাট সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইবেন ? হিন্দুর সমাজসৌধের পুনর্গঠন আবশ্যক হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু খৃষ্টধর্ম কি হিন্দুর এই অভাব পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে ?—অসম্ভব । খৃষ্টধর্ম হিন্দুর কোন উপকারেই আসিবে না । কারণ, ইহা ভাঙ্গিতেই জানে, গড়িতে জানে না । বিশেষতঃ ভারতবর্ষে সমাজগঠনমূলক কোন কার্যই ইহা দ্বারা সম্ভবপর নহে । এই খৃষ্টীয় ধর্মের শাসন-প্রথা ভারতের ত্রায় দেশে বিষবৎ হইয়া উঠিবে । ধর্ম-যাজকদিগের হস্তে ভারতীয় হিন্দু বহুপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে । আর অধিক নিগৃহীত হইতে ইচ্ছা করে না ।

ভারতে সমাজের পুনর্গঠন ও সংস্কার আবশ্যক । মুসলমানদিগের ন্যায় খৃষ্টানগণও তাহাদিগের আদর্শ হিন্দু-সমাজসমুদ্রের উপর অজস্র বর্ষণ করিয়াছেন । ইহার ফলে সে সমাজ-সমুদ্রে আমূলসংস্কারতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে । আজও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা-প্রাপ্ত সংস্কারকগণ এই সমাজ-সমুদ্রে অবিরত আলোড়িত করিতেছেন । এই অবসরে হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ একবার উদার মহৎ সার্বজনীন

নীতির উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দু-সমাজের সংস্কার-কার্যে আত্মনিয়োগ করুন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ, তাহা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের উচ্চ সামাজিক আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া লউন। তাঁহাদিগকে সামাজিক প্রথার কঠোরতা অপেক্ষাকৃত শ্লথ করিয়া দিতে হইবে। যুগধর্ম অনুযায়ী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ও বর্তমান প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুর প্রাচীন, মহৎ ও উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এ সমাজসংস্কার-কার্যে তাঁহাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে। সমাজসংস্কার করিতে হইলে সর্বমতগ্রাহী ও সর্বধর্মের সার একত্ব-সাধনকারী সিদ্ধান্ত বেদান্ত—যাহা সকলকেই আলিঙ্গন করে, যাহা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই দেবত্বের সমান অধিকারী বলিয়া প্রচার করে, যাহা শিক্ষা দেয় যে, খৃষ্টান, হিন্দু, ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল সকলেই পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান, সেই বেদান্তের উদার ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই এই জাতি-বিভাগের দোষ দূরীভূত হইবে, হিন্দুসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই উন্নতি হইবে, হিন্দুর বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্র মিলিত হইয়া, এক অখণ্ড বিরাট হিন্দুজাতিতে পরিণত হইয়া জগতের সমুদয় সভ্যজাতির মধ্যে এক মহামহিমাম্বিত ও সভ্যতালোক-বিকৌর্ণকারী মহাশক্তিতে পরিণত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান

যাঁহারা প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, অন্যান্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতীয় হিন্দুগণ পূর্ণ সভ্যতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ এবং বৈদিক যুগের অন্যান্য গ্রন্থে হিন্দু সভ্যতার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ববর্তী বক্তৃতায় আমি বলিয়াছি যে, এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায়, ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেই ভারতীয় আর্যগণ তাঁহাদের সমাজকে বর্ণ, গুণ ও ধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সাহিত্য-দর্শনাদির চর্চা এবং যাজকতাই ব্রাহ্মণদিগের কর্তব্য কর্ম ছিল। যাঁহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, রাজ্য-শাসন ও অন্য শ্রেণীর লোকদিগের রক্ষা ও হিতসাধনে আপনাদিগের শক্তি নিয়োজিত করিতেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি ও এইরূপ অন্যান্য কার্য যাঁহারা পরিচালনা করিতেন, তাঁহারা বৈশ্য বা বণিকজাতি বলিয়া অভিহিত। শূদ্রজাতির কর্তব্য ছিল সেবা।

বৈদিক যুগের গ্রন্থসমূহ হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালের আর্য্যগণ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেন, ক্ষেত্রে অশ্ব ও বলদ ব্যবহার করিতেন ও জলসেচের জন্য খাল খননের আবশ্যকতা বুঝিতেন। সেচের জন্য এবং পানীয় জলের জন্য কূপ এবং সুরক্ষিত জলাশয়ের উপকারিতা এবং আবশ্যকতাও তাঁহাদিগের জ্ঞাত ছিল। বিবিধ প্রকার শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থে বিনিময় হেতু স্বর্ণ ও অগ্ন্যাগ্ন ধাতুনির্মিত মুদ্রার প্রচলনের বিষয় ঋগ্বেদে লিখিত আছে। ইহা ব্যতীত আর্য্যগণ যে ভাবে ভারতের অসভ্য অনার্য্য আদিম অধিবাসিগণের সহিত সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন, এ সকল কথাও বৈদিক যুগের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। যেমন আমেরিকার নানা স্থানে অষ্টাপি আমেরিকার আদিম অধিবাসীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই ভারতের নানা পার্বত্য প্রদেশসমূহে ভারতের আদিম অধিবাসিগণের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছে। এই সকল বিপক্ষ জাতির সহিত যুদ্ধের সময় আর্য্য বীরগণ যে কেবল বশ্ম ও শিরশ্রাণ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে; তাঁহারা স্কন্ধদেশ রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার কবচ এবং সম্ভবতঃ ঢালও ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা যুদ্ধকালে বর্শা, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার তরবারি এবং ধনুর্বাণ ব্যবহার

ব্যবহার সে কালে ছিল, ভারতীয় আৰ্য্যগণ চারি সহস্র বৎসর পূর্বে তৎসমুদায়ই অবগত ছিলেন। ঢকানিনাদ দ্বারা সৈনিকগণকে একত্র করা হইত, পতাকা দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালিত করা হইত এবং অশ্ব ও রথের ব্যবহার তাঁহাদিগের উত্তমরূপ জ্ঞাত ছিল। এমন কি, যুদ্ধকালে পালিত হস্তীর ব্যবহারও হইত। *

হিন্দুগণ লৌহ, স্বর্ণ এবং অগ্ন্যাণ্ড প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানিতেন, সে বিষয়ে ঋগ্বেদে বহু উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ডে ১৪০,১০ সূক্তে দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৯,৪ সূক্তে চতুর্থ খণ্ডে ৫৩,২ সূক্তে এবং অগ্ন্যাণ্ড বহু স্থানে আৰ্য্যগণের বস্ত্র ব্যবহারের বিষয় বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদ পঞ্চম খণ্ডে ৫২,৬ এবং ৫৭,২ সূক্তে কবচ ও পরশুর উল্লেখ আছে, উহাদের সংস্কৃত নাম যথাক্রমে রিষ্টি ও বাসি। উক্ত বেদের ষষ্ঠ খণ্ডে ২৭,৬ সূক্তে তিন সহস্র বস্ত্র-পরিহিত যোদ্ধার বিষয় এবং তীক্ষ্ণধার অসির সম্বন্ধে ৪র্থ খণ্ডে ৪৭,১০ সূক্তে বর্ণিত আছে। তীরের ফলকসমূহ বে লৌহনির্মিত ছিল, তাহা ষষ্ঠ ৭৫,১৫ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—“আমরা লৌহ নির্মিত বিবাক্ত তীরসমূহের প্রশংসা করি।” পরবর্তী খণ্ডে (৮৩,১) আমরা দেখিতে পাই, “যুদ্ধের প্রারম্ভে

* “Civilisation in Ancient India,” Vol. I, p. 58.

বন্দ্য-পরিহিত যোদ্ধৃবৃন্দ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ গমন করেন, তখন তাঁহারা মেঘের গায় প্রতীয়মান হন।”

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া নব-অধিকৃত ভূভাগে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা নূতন নূতন ভূভাগ কর্ষণ করিয়া নগর ও গ্রামের প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সর্বদা যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিতে হইত বলিয়াই তাঁহারা রাজনীতি ও সমাজনীতির চর্চা ও তত্তৎসম্বন্ধীর আবশ্যকীয় অনুষ্ঠানগুলি ব্যবস্থাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, হিন্দুর রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি হিন্দু সভ্যতার মত প্রাচীন। হিন্দুগণ সমগ্র দেশকে বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যগুলি প্রত্যেকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বা স্বরাজ ভোগ করিত। প্রত্যেক রাজ্য বা প্রদেশের শাসনকর্তা “রাজা” উপাধি ধারণ করিতেন; রাজগণের কেহ কাহারও অধীন ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন। রাজগণ পরস্পরের প্রতি সাধারণতঃ বন্ধুত্বাবহ পোষণ করিতেন; কখন কখন পরস্পরের প্রতি ঘৃণ্যতাবহ দেখা যাইত। ভারতের সর্বত্র রুসিয়া-সম্রাটের গায় কখনও সার্বভৌম একাধিপত্য ছিল না বটে, কিন্তু শক্তিশালী নৃপতি ও সম্রাটের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহাদের নিকট

স্বীকার করিতেন ও কর দিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজ্য-শাসন ও রাজকার্য্য বিষয়ে তাঁহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করেন নাই। অধীনস্থ এই রাজগণ মৈত্রীবন্ধনে বা সন্ধি-স্থত্রে মিলিত রাষ্ট্রসমূহের গ্ৰায় মিত্রতায় আবদ্ধ থাকিতেন মাত্র, তাঁহারা সম্রাটের অধীনস্থ ভূম্যধিকারী মাত্র ছিলেন না, যুরোপে এই ভূম্যধিকারিগণের (Fudal baronies) বেক্রপ দাসোচিত কার্য্য করিয়া সম্রাটের বা রাজার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হইত, ভারতের দুর্বল রাজগণকে কখনও সেক্রপ হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই। রাজা ও সম্রাটের মধ্যে বাধ্য-বাধকতার বন্ধন অতি ক্ষীণ ছিল। নামাত্ম কারণেই এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। বৈদিক যুগে এক্রপ অনেক সম্রাট বা রাজচক্রবর্তীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্র অবোধার মহারাজা ছিলেন, তাঁহার রাজত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি, লঙ্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে খৃষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্বে হিন্দুগণের ইতিহাস বিবৃত আছে। এই মহাভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ভারতের মহারাজ যুধিষ্ঠির ভারতের সম্রাট হইয়া-ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে পরীক্ষিৎ, জনৈজয় এবং অন্যান্য কয়েক জন সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সকল সম্রাটের অধীনে বহুসংখ্যক রাজা ছিলেন, তাঁহারা বথাযথ রাজসম্মান ও কর দিতেন, কিন্তু সে সম্রাটের সহিত তাঁহাদের

সম্বন্ধ কখনও কখনও অতি সামান্য কারণেই ভগ্ন হইত এবং তাঁহারা সময়ে সময়ে অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন।

যখন মহাবীর সেকেন্দর (Alexander the Great) ভারত আক্রমণ করেন, তৎকালে গঙ্গাতীর-বর্ত্তী পাটলিপুত্রে আধুনিক পাটনার চন্দ্রগুপ্ত নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত বৌদ্ধ নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পৌত্র অশোক খৃষ্টপূর্ব ২৬০ অব্দে তৎকালীন রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সম্রাট হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় জগতে বিখ্যাত কনষ্টাণ্টাইনের গ্রাণ বৌদ্ধগণের মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মই রাজ-ধর্ম অর্থাৎ সর্বসাধারণের ধর্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি সূদূর সাইবেরিয়া হইতে সিংহল পর্য্যন্ত, চীনদেশ হইতে মিশর পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের বিস্তারসাধন করেন। অশোকের জীবিতাবস্থায় লিখিত একটি অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি সিরিয়া রাজ এন্টিওকাস, মিশররাজ টোলিমেয়স, ম্যাসিডোনাধিপতি এন্টিগোনাস, সাইরিণরাজ মেগাস এবং এপিরসরাজ এলেকজান্ডার নামক তাঁহার সমসাময়িক পাঁচটি ভূপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল স্থানে, এমন কি, এলেকজান্ড্রিয়া পর্য্যন্ত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ

করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচারকার্যে সহায়তা করিয়া-
ছিলেন।

মহাবীর সেকেন্দর কেবল ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্ত
আক্রমণ করিয়া কতকগুলি পার্শ্বত্যা জাতিকে যুদ্ধে পরাভূত
করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন তিনি প্রবলপরাক্রান্ত মহারাজ
চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য ও বীর্যের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন
আর অগ্রসর না হইয়া সসৈন্তে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া
গ্রীসে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার পরবর্তী ভূপতি সেনু-
কাস গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসকে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায়
প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস কয়েক বৎসর যাবৎ
ভারতে অবস্থান করেন। মেগাস্থিনিস-লিখিত বিবরণ
পাঠে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক
অবস্থা ও ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়।
বিদেশীয়ে লিখিত ভারত-বৃত্তান্তের মধ্যে মেগাস্থিনিস-
লিখিত বিবরণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য। তিনি
তৎকালে প্রচলিত রাজ্যশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা দেখিয়া-
ছিলেন, তাহা অতি সূচাক্রমে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি
বলেন :—“যে সকল রাজকর্মচারীর প্রতি রাজধানী
পর্যবেক্ষণের ভার গুস্ত ছিল, তাঁহারা ছয় ভাগে বিভক্ত
ছিলেন ; প্রত্যেক বিভাগে পাঁচ জন করিয়া কর্মচারী
নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম বিভাগের কর্মচারীগণ শ্রমশিল্পের
প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, দ্বিতীয় বিভাগের কর্মচারীগণ

বিদেশীয়েদের তত্ত্বাবধান করিতেন, ইঁহারা বিদেশীয় ব্যক্তি-
 গণের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, তাঁহাদিগের আচার-
 ব্যবহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহারা স্বদেশ-
 প্রত্যাগমন করিলে পথে তাঁহাদিগের রক্ষণের ব্যবস্থা করি-
 তেন। কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দ্রব্যাদি তাঁহার দেশে
 আশ্রয়স্থানের নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেন।
 কেহ অসুস্থ হইলে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার
 ব্যবস্থা ও কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার কবরের ব্যবস্থা
 করিতেন। তৃতীয় বিভাগ জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় বিবরণ
 রাখিতেন। রাজকর সংগ্রহই ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না ;
 উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর প্রজাগণের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর
 কি ভাবে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতেছে, সরকার তাহার প্রতি
 বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের তত্ত্বাবধানের
 ভার চতুর্থ বিভাগের উপর অ্যস্ত ছিল। ইঁহারা পণ্য-
 দ্রব্যের ওজন মাপ পরিমাণাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।
 যাহাতে সকল প্রকার উৎপন্ন শস্ত নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী
 বিজ্ঞাপনের দ্বারা বিক্রীত হয়, এ বিষয়েও ইঁহারা দৃষ্টি
 রাখিতেন। দ্বিগুণ রাজকর প্রদান না করিলে কোনও
 ব্যবসায়ী একাধিক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিত
 না। প্রথম বিভাগ শিল্পজাত পদার্থের তত্ত্বাবধান করি-
 তেন। সরকারী বিজ্ঞাপনের সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্যের

করিয়া বিক্রয় করিতে হইত। একত্র মিশাইলে সে জন্ত দণ্ডিত হইতে হইত। ষষ্ঠ বিভাগ পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশমাংশ রাজকরস্বরূপ সংগ্রহ করিতেন।

সমরবিভাগীয় কর্মচারিগণও পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে পাঁচ জন করিয়া কর্মচারী। প্রথম বিভাগের কর্মচারিগণ রণতরী বিভাগের অধ্যক্ষের সহায়তার নিযুক্ত থাকিতেন। দ্বিতীয় বিভাগকে সৈন্তদিগের জন্ত রসদ ও যুদ্ধে নিযুক্ত পশুদিগের জন্ত খাদ্য এবং অগ্ন্যাগ্নি যুদ্ধোপকরণবাহী বলদের শকটশ্রেণীর তত্ত্বাবধায়কের সহায়তা করিতে হইত। তৃতীয় শ্রেণী পদাতিক সৈন্তের, চতুর্থ দল অশ্বগণের, পঞ্চম দল রথাদির এবং ষষ্ঠ দল গজাদির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন।

এই সকল সমরবিভাগীয় এবং সহর-তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী ব্যতীত আরও এক দল রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা কৃষি, জলসেচ, বন এবং প্রজাশাসন প্রভৃতি মফঃস্বলের সমুদয় কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। কতকগুলি কর্মচারী নদী, খাল প্রভৃতি দেশের জল-পথের, কতকগুলি কর্মচারী মিশরের আদর্শে জমীর মাপ ও পরিমাণের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং যাহাতে খালের আবদ্ধ জল শাখা-খাল-সমূহে চালিত হইয়া প্রজাগণের জলের অভাব দূর করে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতেন। এই সকল কর্মচারীই আবার শিকারীগণের কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

তাহাদিগের কর্ম্মানুসারে তাহাদিগের পুরস্কার বা দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। ইহারাই রাজস্ব আদায়, ভূমিসংক্রান্ত বৃত্তিধারীর যথা কাঠুরিয়া, মূত্রপর, কর্ম্মকার, খনিজীবিগণের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

রাজপথ নির্মাণ করিয়া শাখাপথ ও পথের দূরত্ব জ্ঞাপনার্থ প্রত্যেক দল ষ্টেডিয়া (stadia) * অন্তর স্তম্ভ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হিন্দুদিগের সমর-নীতি কখনই দয়া ও ধর্ম্মভাব-বিবর্জিত ছিল না। এ বিষয়ে অশ্বাত্ত জাতির সমর-নীতি অপেক্ষা হিন্দুর সমরনীতিই বহু অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। রাজগণ রাজধর্ম্মানুসারে এবং প্রজার মঙ্গল হেতুই রাজ্য-শাসন করিতেন। এ বিষয়ে মেগাস্থিনিদ-লিখিত বিবরণ এবং হিন্দুশাস্ত্রকথিত বা মনু ও আপস্তম্বের বিধির মধ্যে কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। সমরনীতি সম্বন্ধে হিন্দু-নীতিবেত্তা আপস্তম্ব বলেন :—“যাহারা যুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা পলায়ন-পর বা কৃতাজলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহারা আর্য্যগণের বধ্য নহে। (২য় ভাগ ৫,- ১০, ১১) যাহারা ভয়ান্ত, মাদকদ্রব্যের প্রভাবে জ্ঞানহীন, উন্মাদ, যাহারা বর্ষ দ্বারা সুরক্ষিতদেহ নহে, স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, বা, ব্রাহ্মণ, তাহারা আর্য্যগণের বধ্য নহে। (বোধায়ন ১ম খণ্ড ১০, ১৮, ২) মৃতসৈনিকগণের স্ত্রী-সকলের

ভরণপোষণের ভার রাজাই গ্রহণ করিতেন (বশিষ্ঠ ১৯, ২০)। মেগাস্থিনিস বলেন :—“অন্যান্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুদিগের ধ্বংসকার্য্য অবাধে চলিতে থাকে, ইহাই প্রচলিত বিধি ; কিন্তু হিন্দুগণ কৃষক-সম্প্রদায়কে পবিত্র জ্ঞান করিতেন, হিন্দুমতে তাঁহারা কোনও প্রকার নিগ্রহের যোগ্য নহেন, এমন কি, নিকটে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই কৃষকগণ আপনাদিগকে কখনও বিপন্ন মনে করিতেন না ; নির্বিঘ্নে নিরুদ্ধে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন।.....উপরন্তু বোদ্ধাগণ কখনও অগ্নিপ্রয়োগ দ্বারা শত্রুর দেশ ধ্বংস করিতেন না, কখনও বৃক্ষাদি নষ্ট করিতেন না এবং কখনও পরাজিত শত্রুকে দাসত্বে বাধ্য করিতেন না।”

মহু-প্রণীত নিয়মানুসারে প্রজাপালন, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আয়বিচার, অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান রাজগণের কর্তব্য ছিল (৭ম ভাগ, ১২-১৬)। ইহাই নৃপতির তিনটি প্রধান কর্তব্য। মাদকদ্রব্য ব্যবহার, দ্যুত-ক্রীড়া, ব্যসন, লাম্পট্য এবং যুগ্মার্থে পশুহনন রাজগণের অতি গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত (৭ম খণ্ড ৫০)। মহু রাজাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্র ও নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “রাজা রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যা ত্যাগ করিবেন এবং শৌচাদি ও ধ্যান, সন্ধ্যা প্রভৃতি সমাপন করত — প্রভাতে দাধারণের সহিত সাক্ষাৎ ও অনুযোগাদি শ্রবণ জন্ত নির্দিষ্ট সভাগৃহে গমন করিবেন।

দর্শনপ্রার্থী প্রজাগণের অনুযোগাদি শ্রবণ পূর্বক তাঁহা-
 -দিগকে বিদায় দিয়া তিনি মন্ত্রণাগৃহে মন্ত্রিগণের সহিত
 'পরামর্শ করিবেন (৭ম ভাগ, ১৪৫-১৪৭) । আলোচনা ও
 মন্ত্রণা শেষ হইলে তিনি শরীররক্ষার জন্তু আহাৰাদি ক্রিয়া
 সমাপন করিবেন ।" কিন্তু প্রজাগণের অভাব-অভিযোগ
 শ্রবণ পূর্বক সে অভাব ও অভিযোগের প্রতীকার করিয়া
 প্রজার মনোরঞ্জনই রাজার প্রধান কর্তব্য । অপরাহ্নে
 ভূপতি তাঁহার সৈন্ত-শ্রেণী পরিদর্শন করিবেন, যোদ্ধৃবর্গ
 রথ, অশ্ব, গজাদি, অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সমস্ত পরিদর্শন
 করিয়া সাযংসন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিবেন । ইহার পর
 তিনি গুপ্তচরগণের সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক গৃহ সংবাদ ও তথ্য
 সকল অবগত হইবেন (৭ম ভাগ, ২২১-২২৫) । মন্ত্রুর
 মতানুসারে মন্ত্রি-সভা রাজকাৰ্য্যে রাজাকে সাহায্য করি-
 বেন । মন্ত্রণাগৃহে ৭ জন কিংবা ৮ জন মন্ত্রী থাকিবে
 (৭ম ভাগ, ৫৪-৬৩) । মন্ত্রিগণের সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, অস্ত্র-
 চালনায় নিপুণতা ও বংশমর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা
 লওয়া হইত । রাজা শান্তি, যুদ্ধ, রাজস্ব এবং
 দেবতার নামে বা ধর্ম্মের উদ্দেশে দান সম্বন্ধে মন্ত্রিগণের
 সহিত পরামর্শ করিতেন । খনি, শিল্পালয় বা কারখানা
 এবং গুদামে রাজস্ব আদায় করিবার জন্তু যোগ্য ব্যক্তি
 সকল নিযুক্ত হইত । রাজা রাজদূত প্রেরণ পূর্বক অগ্ৰাণ্য

নগর ও গ্রামসমূহের রক্ষার জন্য রাজা স্বতন্ত্র যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিতেন। প্রত্যেক গ্রামের, ১০খানি গ্রামের,— ২০খানি, ১ শত ও ১ সহস্র গ্রামের জন্য এক এক জন শাসনকর্তা থাকিতেন। ইঁহারা শুধু শাসনকর্তাই ছিলেন না, পাপকার্য্য সমূহ নিবারণ ও গ্রামগুলি রক্ষা করাও তাঁহাদের কার্য্য ছিল। এই সকল অতিরিক্ত কৰ্ম্মচারিগণের ইঁহাই বিশেষ কর্তব্য ছিল। ইঁহারা পরিদর্শকস্বরূপ ছিলেন। সেইরূপ প্রত্যেক নগরে সকল বিষয়ে পরিদর্শন জন্য ১ জন করিয়া পরিদর্শক থাকিতেন। তিনি অগ্ৰাণু রাজকৰ্ম্মচারীর বর্ষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং অনু- সন্ধান করিয়া গোপনে রাজদরবারে তাঁহার মন্তব্য প্রেরণ করিতেন। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে আছে—রাজকৰ্ম্মচারিগণ প্রজাপালন জন্য নিযুক্ত হইয়াও সাধারণতঃ অত্যাচারী হইয়া উঠেন এবং প্রজাগণের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়া থাকেন, এরূপ কৰ্ম্মচারীর অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য (মনু ৭ম ভাগ, ১১৫-১২৩)। ইহা হইতে আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশের ন্যায় ভারতে খৃষ্টের কয়েক শতাব্দী পূর্বে যে সময় মেগাস্থিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই অতীত যুগেও রাজ-কৰ্ম্মচারিগণ কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন এবং প্রজার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেন।

সরকারী জমীর আয় হইতে রাজকার্যের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না, করস্থাপন দ্বারা অভাবপূরণ হইত। মন্সুর ব্যবস্থা অনুসারে গোধান ও স্বর্ণের উপর শতকরা ২ টাকা হিসাবে রাজকর আদায় করা হইত। উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ, অষ্টমাংশ কিংবা ষোড়শাংশ পর্যন্ত ভূমিকরস্বরূপ গ্রহণ করা হইত। * অতএব দেখা যাইতেছে, সে সময় ইংরাজ রাজত্ব অপেক্ষা অনেক অল্পপরিমাণেই ভূমিকর আদায় করা হইত। হিন্দুরাজত্বকালে রাজগণ কোন ক্রমেই অত্যধিক কর আদায় করিতে পারিতেন না। সে সময় রাজা মাখন মৃৎপাত্র এবং প্রস্তর-নির্মিত সামগ্রীর মূল্যের ষোড়শাংশ মাত্র আদায় করিতে পারিতেন এবং আবশ্যক হইলে শ্রমজীবী, শিল্পী ও অন্যান্য মজুরকে মাসে ১ দিন মাত্র পারিশ্রমিক না দিয়া কাঁচ করাইয়া লইতে পারিতেন। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সে সময় ঐ সকল শ্রমজীবীর ভরণ-পোষণের ভার রাজার উপরেই গুস্ত ছিল। এইরূপ নিয়মে কার্য চলিত বলিয়াই প্রাচীন ভারতবর্ষে সুদৃশ্য অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ এবং সাধারণের জগু স্মৃতিস্তম্ভাদি নির্মাণ সম্ভবপর হইত। এখন এমন ব্যয়-বাহুল্য ঘটে যে, সাহস করিয়া এ সকল কার্যে আর হস্তক্ষেপ করা যায় না।

এই সকল বিবরণ এবং রাজ্যশাসন ও করস্থাপন সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, খৃষ্টীয় ষুগেরও পূর্বে ভারতে উচ্চ-শ্রেণী সভ্যতার প্রচার হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহার পর খৃষ্টীয় ৭র্থ শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং খৃষ্টীয় ৬৩০ সালে হিউয়েন সাঙ ভারতে পদার্পণ করেন।

হিউয়েন সাঙ পঞ্চদশ বৎসর কাল ভারতে অতিবাহিত করেন। ইঁহারা সকলেই একবাক্যে হিন্দু রাজগণের রাজ্যশাসন-প্রথার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা সর্বদাই শুনিতে পাই, হিন্দু রাজগণের শাসনকালে দেশে শান্তি বা ত্রায়বিচার বলিয়া কিছুই ছিল না, তাঁহাদিগকে সর্বদাই হৃন্দে ও বিরোধে কালাতিপাত করিতে হইত। কিন্তু এই সকল বিদেশীয় পরিব্রাজক ভারতে আসিয়া-ছিলেন, দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও তেমন সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না। প্রজাগণ করভারে নিষ্পেষিত, তাহারা স্বেচ্ছা-চারী রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ, দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর প্রভাবে দেশ উৎসন্ন, ভ্রাতৃবিরোধের ফলে সর্বস্বান্ত, এমন একটিও দৃষ্টান্ত এই সকল দীর্ঘ বিবরণের কোথাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। বরং লিখিত বিবরণ পাঠে ইহাই জানিতে পারা যায় যে, “প্রজারা সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল—তাহারা

অবিচার ও অশান্তি কাহাকে বলে জানিত না। কৃষির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং কলাবিদ্যারও চর্চা হইত।” হিউয়েন সাঙের স্মারক-পুস্তিকা সামুয়েল বীল (Samuel Beal) কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদে ভারতবর্ষে প্রচলিত হিন্দুশাসন সম্বন্ধে লিখিত আছে :—“রাজশাসনে কঠোরতা কোথাও ছিল না; এই জন্যই শাসন-প্রথায় কোনও জটিলতা ছিল না।

“সরকারী ভূ-সম্পত্তি প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগের আয় হইতে রাজকার্য্য নির্বাহের ব্যয় এবং যজ্ঞাদিতে বলি প্রভৃতির জন্য ব্যয় হইত। দ্বিতীয় ভাগ হইতে মন্ত্রিবর্গ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্মচারীর ভরণপোষণের জন্য ব্যয় নির্বাহ হইত। তৃতীয় অংশ হইতে যোগ্য কর্মচারিগণের যোগ্যতার পুরস্কার প্রদত্ত হইত এবং চতুর্থ ভাগ হইতে গুণের উৎকর্ষসাধনে উৎসাহিত করিবার জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানগুলির সাহায্য-কল্পে অর্থ প্রদান করা হইত। এই জন্যই রাজকর লঘু ছিল; পারিশ্রমিক ব্যতীত কাহাকেও প্রায় কোনও রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত না, প্রত্যেকেই নিজ ধনসম্পত্তি নিরুদ্বেগে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত এবং স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন জন্য সকলকেই ভূমি ক্ষণ করিতে হইত। যাহারা সরকারী ভূমি ক্ষণ করিত, তাহাদিগকে রাজস্ব রূপকর উৎপন্ন শাসনের মর্মান্বিত প্রদান করিতে হইত।

বণিকসম্প্রদায় অবাধে দেশের সর্বত্র বাণিজ্য করিতে পারিত। সামান্য একটা শুক প্রদান করিলেই জল বা স্থলপথে বণিক-গণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সাধারণের কোনও মঙ্গল-কর কার্যের জন্য শ্রমজীবীগণকে কার্য্য করিতে বাধ্য করান হইত; কিন্তু তাহারা রীতিমত পারিশ্রমিক পাইত। কস্মানু-সারে পারিশ্রমিক প্রদানে কখনও ত্রুটি করা হইত না।

“সৈনিকগণ কর্তৃক রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশগুলি সুরক্ষিত এবং অবাধ্য ও অশান্ত ব্যক্তির শাস্তিবিধান করা হইত। রাত্রিকালে অশ্বারোহী সৈনিকগণ রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে পাহারা দিত। আবশ্যক অনুযায়ী সৈনিকদল গঠিত হইত; সৈনিকগণ ভাতা পাইত এবং প্রকাশ্যভাবে প্রজাগণকে সৈনিকশ্রেণীভুক্ত করা হইত। স্ব স্ব ব্যয় ও পরিবারাদি প্রতিপালন জন্য শাসনকর্তা, মন্ত্রী, বিচারক ও অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্মচারীগণকে পদানুসারে জায়গীর প্রদান করা হইত।”

হিউয়েন সাঙ বলেন, চীনদেশীয় করদ রাজগণ বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে চীনদেশ হইতে কতিপয় চীনদেশীয় ভদ্রলোককে ভারতে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। খৃষ্টীয় .৭৮ সালে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে স্থিত কাশ্মীরে কনিষ্ক রাজত্ব করিতেন। মহারাজ কনিষ্ক ইঁহা-দিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে ভূ-ভাগে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল,

তাহাই পরিশেষে চীনা-পটী আখ্যা ধারণ করে, চীনাগণই ভারতে প্রথমে ত্রাসপাতি ও পিচফলের প্রচলন করিয়াছিলেন। এই জন্তই পিচকে চীনানি এবং ত্রাসপাতিকে চীনাজপুল বলা হইয়া থাকে।

মেগাস্থিনিসের সময় হইতে হিউয়েন সাঙের ভারত আগমনকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ভারতের রাজনীতিক অবস্থা এইরূপ ছিল। ইহা ব্যতীত প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা এবং নগরগুলির শাসন ও স্বাস্থ্য-রক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অতি চমৎকার ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েত শাসন পরিষদে পাঁচ জন করিয়া সভ্য থাকিত। পঞ্চায়েত সভায় প্রথমে পাঁচ জন, পরে বারো জন করিয়া সভ্য থাকিত। প্রত্যেক গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভা গ্রাম্য শাসন সম্বন্ধে সর্ববিষয়েই স্বাধীন ছিল। প্রত্যেক গ্রামে এই ভাবে এক একটি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই পঞ্চায়েত সভা গ্রামের সকল ব্যবস্থা করিত; শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিত; তবে গ্রামের উৎপন্ন শস্তের উপর নির্দ্ধারিত রাজকর গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভা রাজ-সরকারে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠাইয়া দিতেন। প্রত্যেক জিলা এই ভাবে কতিপয় ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভা দ্বারা শাসিত হইত। এই গ্রাম্য

রাজনৈতিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পাইতেন। শাসন-কার্য্যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। মনু এই গ্রাম্য পঞ্চায়েত শাসনপ্রথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের অগ্ৰাণ্য ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ ও বিবরণ আছে। হিন্দু রাজত্বকালে এ পঞ্চায়েত প্রথা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। গ্রাম-বাসিগণ আপনাদিগের গ্রাম্য শাসনকর্তা আপনাই নির্বাচন করিতেন। এই শাসনকর্তা নিজ ভরণপোষণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি পাইতেন। তিনিই গ্রাম্য শাসন-সভার সভাপতির কার্য্য করিতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে সভ্যগণকে লইয়া সভা করিতেন। এই গ্রাম্য শাসনকর্তার অধীন এক জন করিয়া কর্ম্মচারী থাকিতেন। তিনি গ্রামের সকল কার্য্য পরিদর্শন করিতেন, সমস্ত জমীর পরিমাণ, বিবরণ, উৎপন্ন শস্যের হিসাব ও রাজকর হিসাব রাখিতেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক গ্রামে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষক, ক্ষৌরকার, সূত্রধর, কর্ম্মকার, গোপ, চর্ম্মকার, কুন্তকার, ধীবর, রজক, ঔষধ-বিক্রেতা, তৈলকার, চৌকিদার এবং ঝাড়ুদার থাকিত। এই সমস্ত লইয়াই গ্রামের প্রতিষ্ঠা। ইহারাই গ্রামসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়া যুক্তি সহ ব্যবস্থা করিত।

মনুর সময় হইতে অথবা অন্ততঃ খৃষ্টের জন্মগ্রহণের চারি শত বৎসর পূর্ব হইতে ভারতে এই প্রকারের একটা

গ্রাম্য শাসনপ্রথা প্রচলিত ছিল। কোনও বহিঃশত্রুর আক্রমণে, আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে, যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে বা ভূমিকম্পে কোন প্রকারেই তাহা ক্ষুণ্ণ বা বিধ্বস্ত হয় নাই। সার মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়ামস্ (Sir Monier Monier Williams) বলেন :—“ভারতে এই গ্রাম্য শাসন-প্রথা অতি প্রাচীন, ইহা চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল, সুতরাং আমার বিবেচনায় ভারতের এই গ্রাম্য শাসন-প্রথা আমাদের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। ভারতের ইতিহাসে ইহা অতুলনীয়। আমাদের ইংলণ্ডের গ্রাম্য শাসন-প্রথার স্থায় ভারতের এই গ্রাম্য শাসনকার্যের অনুষ্ঠান-গুলির আলোচনা করিলেই মনে হইবে যে, আর্য্য জাতি যুরোপ বা এসিয়ার যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই গ্রাম্য সমাজে সর্বসাধারণের স্বাধীনতামূলক নানা প্রকার বিধি-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছেন। ভারতের গ্রাম বা নগর অর্থে কতকগুলি ঘরবাড়ীর সমষ্টিমাত্র বুঝায় না। দৈর্ঘ্য বা প্রস্থে তিন, চারি বা ততোধিক একটি স্থানে সর্বসাধারণের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি ও ব্যবসায়-ধারী ব্যক্তির সমাবেশে পরস্পরের স্বার্থরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকলের সমবেত চেষ্টার ফলেই এই গ্রাম্য শাসন-সমিতির উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা। ইহাতে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইত না, ইহাই স্বরাজের প্রথম বীজ-

রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের ইহাই মূলস্বরূপ। খৃষ্টের দুই তিন শত বৎসর পূর্বে হইতে মনু কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইবার সময় হইতে এই ব্যবস্থা ভারতে বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন যুগ হইতে ভারতের ধর্মসমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর দিয়া কত বিপ্লবই বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয় নাই। ভারতের উপর কত বহিঃ-শত্রুর আক্রমণে কত শত বার রক্তের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে, অগ্নির জ্বালাময়ী শিখা ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে কত শত বার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু ভারতের সেই অতি পুরাতন সহজ সরল স্বাভাবিক গ্রাম ও নগরের সুব্যবস্থা, তাহার অনুষ্ঠানে তাহার রীতি-নীতি কোন দিনই পরিবর্তিত হয় নাই। শত বিপ্লবের কেন্দ্র-স্থলে থাকিয়াও তাহা অটল, অচল ও অপরিবর্তনীয়।” * মুসলমানগণ ছয় শত বৎসর যাবৎ ভারত শাসন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ মুসলমানরাজত্বকালেও হিন্দুর গ্রাম্য অনুষ্ঠানের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। যেমনটি, তেমনটিই ছিল। পল্লীবাসী হিন্দু প্রজা মুসলমানের শাসন অনুভব করিতেও পান নাই। ভারতের রাজসিংহাসনে মুসলমান অথবা মোগল বাদশা অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধীনস্থ রাজা বা রাণী নির্দিষ্ট কর প্রদান করিতেন মাত্র। অন্য কোনও প্রকার বাধ্যবাধকতা ছিল না। অধীনতার

* Brahminism and Hinduism p. 455.

একমাত্র চিহ্ন এই কর-প্রদান ; অগ্ৰাণ্য সৰ্ববিষয়েই রাজ-
 গণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন । প্রত্যেক রাজাই আপন রাজ্যে
 স্বাধীন আইন প্রণয়ন, প্রচলন, শাসন, বিচার করিতে পারি-
 তেন । কোন ব্যাপারেই মুসলমান সম্রাট হস্তক্ষেপ করি-
 তেন না । দেশীয় রাজগণের রাজ্যশাসনকার্য্য প্রাচীন
 হিন্দু আদর্শেই বরাবর চলিত । এখন পর্য্যন্ত ভারতে
 হিন্দুশাসিত ইংরাজের যে করদ ও মিত্ররাজ্য আছে,
 সেখানেও সেই সেই প্রাচীন হিন্দু শাসনপ্রণালী প্রচ-
 লিত । মুসলমানগণ ভারতে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব কোনও দিন
 স্থাপন করিতে পারেন নাই । ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে
 ভারতে কি বিচারকার্য্য, ছুষ্ঠের দমন, পুলিশের অগ্ৰাণ্য
 কার্য্য কি রাজস্ব আদায় এ সকল কার্য্যই গ্রাম্য সভা দ্বারা
 সম্পাদিত হইত । কিন্তু আজ আর সে ভারত নাই ।
 ইংরাজের স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তাগণ ইংরাজ-শাসিত
 ভারতে হিন্দুর সে গ্রাম্য প্রাচীন স্বায়ত্ত-শাসন প্রথার
 উচ্ছেদসাধন করিয়া কি বিষম অদূরদর্শিতার পরিচয়ই
 প্রদান করিয়াছেন ! আর তাহার স্থলে যে শাসন ও
 বিচারপ্রণালীর প্রচলন করিয়াছেন, তাহার ব্যয় সঙ্কলন
 করিতেই আজ ভারত সর্বস্বান্ত । এ ব্যবস্থার তুলনা
 পৃথিবীর কোথাও নাই । অনেকেই ইংরাজের গায়-
 বিচারের প্রশংসা করিয়া থাকেন । এ কথা অবশ্যই
 স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ শাসনে ভারবিচার

আছে, কিন্তু এ বিচার বহুব্যয়সাপেক্ষ এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নহে। বিচারস্থলে যখন উভয় পক্ষই ভারতবাসী, তখন নিরপেক্ষ বিচার হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন কোনও যুরোপীয় ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার করেন, তখন তেমন নিরপেক্ষ বিচারটি আর ঘটে না। বিশেষতঃ বিচার এতই ব্যয়-সাপেক্ষ, দরিদ্র ব্যক্তি কোনক্রমেই ত্রায়সঙ্গত বিচারের আশা করিতে পারে না, ব্রিটিশ শাসনকালে পুলিশের এই অত্যাচার আর রাজস্ব-আদায়কারী কর্মচারিগণের নিষ্ঠুরতার ফলে প্রজাসাধারণ আজ সকল আশাভরসা বিসর্জন দিয়া যেন ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

এ দেশে অনেকেরই বিশ্বাস, ইংরাজ বাহুবলে ভারত অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মুসলমান-শক্তির অধঃপতনের সময় কতিপয় ইংরাজ বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চলিতেছিল, হিন্দুগণ মুসলমানগণের অধীনতা-পাশ হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া ভারতে হিন্দু-শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মুসলমানের দিল্লী সিংহাসন অধিকার তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল, এই বিপ্লব ও অরাজকতার যুগে ইংরাজ বণিকগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই নামে মুসলমানগণের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভাবে তাঁহারা মোগল-বংশের হীনবল নামমাত্রবিশেষ

সম্রাটগণের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠেন। মোগল সম্রাট তখন নিতান্ত নগণ্য। প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি তিনি তখন সকলই হারাইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই সহায়তার প্রতিদানস্বরূপ লর্ড ক্লাইবের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্বক মোগলবংশের শেষ সম্রাটগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেওয়ান বা শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া একখানি সনন্দ দান করেন। যদিও সে সময় মোগল সম্রাটগণের সনন্দ দান করিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না, তথাপি ষত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নাম-মাত্রও ভারতের সম্রাট ছিলেন, তত দিন তাঁহাদিগের প্রদত্ত এ সনন্দের বলে ইংরাজ যে ভারতে একটি ক্ষমতা বা অধিকার স্থাপন করিবেন, তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি আছে? কোম্পানীর সওদাগরগণ যেখানেই যাইতেন, সেখানেই তাঁহারা এই সনন্দ লইয়া যাইতেন। স্বয়ং লর্ড ক্লাইব কলিকাতা হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরীকে লিখিয়াছিলেন :—“এই দেওয়ানী অর্থে আমি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি সুবার সমস্ত জমীজমার তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা বুঝিয়া থাকি।” এই তিনটি সুবাই সর্ব-প্রথমে কোম্পানীর হস্তগত হয় এবং সে সময় এই তিনটি সুবা হইতে প্রভূত রাজস্ব আদায় হইত। লর্ড ক্লাইব

আপনাদিগের রাজস্বের পরিমাণ আমার বিবেচনার আপনাদিগের পূর্ব-অধিকৃত বৰ্দ্ধমান প্রভৃতির রাজস্ব সমেত এই বৎসর ২ শত ৫০ লক্ষ টাকার বিশেষ কম হইবে না।* ক্রমশঃ বৎসর বৎসর আরও বেশ হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা আদায় হইতে পারিবে। শান্তির সময় আপনাদিগের সমর ও শাসন বিভাগের ব্যয় কখনই ৬০ লক্ষের অধিক হইবে না। নবাবের ভাতা কমাইয়া ৪২ লক্ষ করা হইয়াছে; সম্রাটকে দেয় মাত্র ২৬ লক্ষ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে, অন্যান্য ১ শত ২২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১৬৫০০০০ বিনাতী পাউণ্ড কোম্পানীর লভ্যাংশ থাকিবেই।”†

“বৎসর বৎসর ১ শত ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক এই অধীনস্থ দেশ হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণের লভ্যাংশ-স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে।”‡

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইহাই ভিত্তিস্বরূপ। এক্ষণে ভারত হইতে সেই স্থলে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা প্রেরিত হইয়া থাকে। ক্লাইবের প্রবর্তিত রাজ্যশাসনপ্রণালী অনুসারে শাসনদায়িত্ব দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

* Three Rupees make one dollar ; a lack was 100,000 rupees.

† House of Commons Third Report, 1773: Appendix, pp, 391-398.

‡ Economic History of British India, p. 39.

নবাবের নামেই রাজস্ব আদায় হইত ; নবাবের কর্মচারিগণই বিচারকের স্থান অধিকার করিতেন এবং শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার নবাবের নামেই চলিত । কিন্তু দেশের প্রকৃত প্রভু ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী । লভ্যাংশ সমস্তই তাঁহাদের হস্তগত হইত । কোম্পানীর কর্মচারিগণ অবাধে প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া আপনাদিগের অর্থ লালসা তৃপ্ত করিতেন ; নবাবের কর্মচারীগণ ভয়ে নীরব থাকিতেন । নবাবের বিচারালয় ইংরাজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজাপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ ছিল । * সে অনেক কথা । ইংরাজ জাতির অযোগ্য প্রতিনিধিগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে সে দিনে ভারতবর্ষে যে দুর্নীতি ও পাপপন্থা অবলম্বন পূর্বক অসীম দুঃখ ও যাতনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার তুলনা নাই । যেন যুরোপে ইংরাজ জাতি অত্যন্ত দরিদ্র ছিল । ভারতে দরিদ্র ইংরাজ জাতির ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কর্মচারিগণ এই সকল ঘৃণিত নীতি অবলম্বন করিয়াছিল । যাহারা বাণিজ্যপ্রবর বার্ক কর্তৃক প্রকাশিত ওয়ারেন হেস্টিংসের কু-কীর্তির বিবরণ পাঠ করিয়াছেন, যাহারা নিরপেক্ষভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা ই জানেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী কিরূপ পাশবিক নীতি অবলম্বন করিয়া এই সোনার ভারত একেবারে ছারখার করিয়াছেন। ভূম্যধিকারিগণকে তাঁহাদিগের পৈতৃক ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রকাশ্য নীলামে সে ভূসম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে ; বাণিজ্য-ব্যবসায় শিল্প অত্যাচার এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ে উৎসন্ন করা হইয়াছে ; শিল্পজাত দ্রব্যের উপর অযথা শুল্ক বসাইয়া তাহার সর্বনাশসাধন করা হইয়াছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে এইবার প্রথম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া জিলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল, এই দুর্ভিক্ষে পূর্ণিয়া জিলায় এক-তৃতীয়াংশের অধিক নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল ; কিন্তু এই ভয়ানক দুর্দিনে এমন কঠোরতার সহিত ভূমিকর আদায় করা হইল যে, এ বৎসরের আদায় অন্ত্যন্ত বৎসর অপেক্ষা অধিক হইল। ৯ই মে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিল কোর্ট অফ ডাইরেক্টরকে পত্র লিখিলেন :—“দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। অনাহারজনিত মৃত্যু, অগ্নাভাবে দ্বারে দ্বারে নরনারীর সঙ্করূপ ভিক্ষাযাত্রা প্রকৃতই বর্ণনাশীত। ধন-ধান্যপূর্ণ সমৃদ্ধ পূর্ণিয়া জিলায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দেশের অন্ত্যন্ত অংশেও দুঃখ-দারিদ্র্যের তুলনা নাই।” ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা লিখিলেন :—

“অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও এবং এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে বহু

লোকক্ষয় হইয়াছে, তথাপি বর্তমান বর্ষে বঙ্গ এবং বিহারে ভূমিকর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।” *

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত “Economical History of India” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

“সাধারণতঃ উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাতের অভাবেই ভারতে দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে ; ইহাই ভারতের দুর্ভিক্ষের মুখ্য কারণ। কিন্তু সে দুর্ভিক্ষ যে এমন তীব্র ভাব ধারণ করে এবং সে জন্য লোকক্ষয় হয়, তাহার কারণ, ভারতবাসীর দারিদ্র্য-দুঃখের বিরাম নাই। যদি শস্যহানির দিনে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ হইতে মূল্য দিয়া খাদ্য-শস্য ক্রয় করিবার শক্তি তাহাদের থাকিত, তাহা হইলে ভারতে এত লোকক্ষয় হইত না। কিন্তু ভারতবাসী সম্পূর্ণ অর্থহীন, খাদ্যাভাবের দিনে তাহারা খাদ্যদ্রব্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে অসমর্থ : কাষেই যখনই কোনও স্থানে কোনও কারণ বশতঃ শস্যহানি ঘটে, অমনই সহস্র সহস্র লোক—লক্ষ লক্ষ নর-নারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।” + ১৮৮০ এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে জানিতে পারা যায় যে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ৪০ বৎসরে ভারতবর্ষে দশ বার

* Extracts from India Office Records quoted in Hunter's “Annals of Rural Bengal.” 1868, pp. 21, 399.

অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারত-বর্ষে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে ২ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু মনে হয়, লোক-ক্ষয় ইহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক অর্থাৎ প্রায় দশ লক্ষ নর-নারী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে আবার দুর্ভিক্ষ হয়; এবার অন্ততঃ ১২ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারাইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিকর অপেক্ষাকৃত লঘু। এই জন্য বঙ্গবাসী তেমন দরিদ্র নহে, এই কারণেই এই খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বঙ্গে কোনও লোকক্ষয় হয় নাই। অপর পক্ষে মাদ্রাজ প্রদেশে ভূমিকর অত্যন্ত অধিক এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। এই কারণে মাদ্রাজবাসী দরিদ্র। মাদ্রাজে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল; ফলে এই দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ হতভাগ্য মাদ্রাজবাসী প্রাণ হারাইল। উত্তর-ভারতে তৃতীয়বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এবারের দুর্ভিক্ষে ১২ লক্ষ নর-নারী প্রাণত্যাগ করিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে যে কত লোক নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ বিষয়ে কোনও সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আবার মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ,

বঙ্গদেশ ও রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় । ইহার ফলে মাদ্রাজে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল ; বঙ্গদেশে হয় নাই । ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয় । যখন দুর্ভিক্ষ অতি তীব্রভাবে ধারণ করে, তখন প্রায় ৩০ লক্ষ নর-নারী সরকারী রিলিফ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল । বঙ্গদেশ এবং অন্যান্য স্থানে লোকক্ষয় হয় নাই বটে, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে এই বৎসর প্রতি সহস্রে ৩৯ হইতে ৬৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই প্রদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা সর্বাপেক্ষা বহুদূরব্যাপী, যে কয় মাসে দুর্ভিক্ষ অতি তীব্র ভাবে ধারণ করিয়াছিল, সে সময় সাহায্যপ্রাপ্ত শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ হইয়াছিল । বোম্বাই হইতে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভাপতি সার এ, পি, ম্যাকডোনাল লিখিয়াছিলেন :—“পোকা-মাক-ডের মত মানুষ মরিতেছে ।” ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনটি দুর্ভিক্ষের ফলাফল এবং ভারতবাসী ক্রমশই দিন দিন যে ভাবে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহার ফলাফল সম্বন্ধে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সরকারী আদম শুমারিতে অনেক কথা আছে । গত দশ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যার আদৌ বৃদ্ধি হয় নাই । বঙ্গ, মাদ্রাজ ও উত্তর-ভারতে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়া-

রাজ্যসমূহে হ্রাসের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, এবং সকল স্থানেই
 দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। বস্তুতঃ
 প্রতি বৎসর শতকরা এক জন করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি
 হইলে এই দশ বৎসরে ভারতে লোকসংখ্যা যত হইত,
 তাহা অপেক্ষা গণনায় প্রায় তিন কোটি কম হইয়াছিল।” *

ক্রাইবের পর ওয়ারেন হেস্টিংস বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত
 হইলেন এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বড় লাটের পদে উন্নীত হইলেন।
 ইনিই ভারতের প্রথম বড় লাট। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পিটের
 (William Pitt) ইণ্ডিয়া বিল বিধিবদ্ধ হয়। পিটের
 ইণ্ডিয়া বিলের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা লুপ্ত
 হয় ও ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভারত শাসনের ভার গ্রহণ
 করেন; ফলে সামান্য সামান্য শাসন-সংস্কার হয়। ওয়া-
 রেন হেস্টিংসের পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস বড় লাট নিযুক্ত হইলেন।
 ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ইংরাজ অধিকারের
 বিস্তার সামান্য স্থলে দেশীয় রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
 করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য গ্রাস করিয়া ইংরাজ-শাসিত
 ভারতের কলেবরবৃদ্ধি, ভারতবাসীর অর্থশোষণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া
 কোম্পানীর কর্মচারীগণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। “ভারত-
 বাসীর ভোটের অধিকার অর্থাৎ মতামত প্রকাশ দ্বারা
 শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার ভারতবাসীর নাই।
 ভারতের শাসনকার্য্য-নির্বাহক সভাগুলিতে ভারতবাসীর

* Indian Famines, by R. C. Dutt, p. 2.

কোনও প্রতিনিধি নাই। কর-স্থাপন বা ব্যয়-ব্যাপারে ভারতবাসীর কোন মতামত গ্রহণ করা হয় না। আয়-ব্যয়ের হিসাবে ভারতবাসীর হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার নাই। ভারতের উপর যে গুরু করভার স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অর্থোক্তিক এবং এই করপ্রাপ্ত অর্থের ঘোল আনা ভারতে ব্যয়িত হয় না। প্রতি বৎসর ত্রিশ কোটি হইতে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। বৎসর বৎসর এই অর্থ-শোষণের ফল যে কি ভীষণ, সে বিষয়ে বিগত শতাব্দীতে বহু ইংরাজ মনীষী অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।” * মাদ্রাজের গভর্ণর সার টমাস মনরো ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতালাভের পর লিখিয়াছেন :—“বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন কার্যে ভারতবাসীর কোন অধিকারই নাই; শানকার্যের ত কথাই নাই। তবে সামান্য সামান্য পদে ভারতবাসীর নিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবাসী শাসন বা সমর বিভাগের কোন উচ্চ পদেরই আশা করিতে পারে না। তাহাদিগকে সর্বত্রই হীন জাতি বলিয়াই বিবেচনা করা হয়। তাহারা যে এক দিন এই দেশের প্রভু ছিল, এ দেশটা তাহাদেরই ছিল, এমন কথা মনেই হয় না; এখন তাহারা অল্পগ্রহা-কাজ্জলী দাস মাত্র। শাসন ও সমর বিভাগের উচ্চ পদ ছিল যুরোপীয়গণের অধিকৃত, তাহাদিগের উদ্ধৃত ধন তাহারা

স্বদেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন।” বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের
মিঃ ফ্রেডারিক জনসোর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন :—

“ভারতের সুখের দিন এখন আর নাই। এক দিন ভারত
ধন-রত্ন-পূর্ণ ছিল; ভারতের সে ধন-রত্ন এখন অতীতের
কথা, ভারত তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; ভারত-
বাসীর সে কস্ম-সামর্থ্য অগ্ৰায় শাসনের ফলে জড়ী-
ভূত ও লুপ্ত হইয়াছে; এ শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য জন-
কতকের স্বার্থরক্ষা হেতু কোটি কোটি নরনারীর স্বার্থবলি।”
বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক অধ্যাপক এইচ, এইচ,
উইলসন বৎসর বৎসর ভারত হইতে যে অর্থ শোষিত হয়,
সে সম্বন্ধে বলেন :—“ভারত হইতে যে অর্থ ইংলণ্ডে
প্রেরিত হয়, তাহা ভারতের মূলধন। ভারতের মূলধন
এই ভাবে শোষিত হইতেছে, অথচ ভারত তাহার পরিবর্তে
কিছুই পাইতেছে না। এই অর্থ-শোষণের ফলে ভারত
অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, ইহা ক্রমাগত বাহির হইয়া
যাইতেছে; কিন্তু পরিবর্তে কিছুই ফিরিয়া আসিতেছে না।
ভারতের জাতীয় শ্রম-শিল্পের ধমনী হইতে জীবনের আশ্রয়-
স্বরূপ এই রক্ত-শোষণ অবিরতই চলিতেছে অথচ সে
জীবনীশক্তির রক্ষাকল্পে কোনও প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যের
ব্যবস্থা নাই।” মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের অন্ততম সভ্য এবং
রেভিনিউ বোর্ডের সভাপতি জন সলিভ্যান তাঁহার লিখিত
রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন :—“বর্তমান ভারতে অনুসৃত

অর্থনীতি সম্বন্ধে ভারতবাসী যে অনুযোগ করিয়া থাকেন, সে অনুযোগ আমার বিবেচনায় অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে আদৌ নহে। আমার মনে হয়, যে ভাবে সেই অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধেই ভারতবাসী বরাবর অনুযোগ করিয়া আসিতেছেন। কারণ ভারতীয়গণের রাজত্ব কালে যে অর্থ রাজস্ব বলিয়া সংগৃহীত হইত, তাহার সমস্তই ভারতেই ব্যয়িত হইত ; কিন্তু আমাদের শাসনকালে রাজস্ব হইতে বহু অর্থ প্রতিবৎসর ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে এবং ইহার পরিবর্তে ভারতকে কিছুই দেওয়া হইতেছে না। এই শোষণক্রিয়া বিগত ৬০ বা ৭০ বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে এবং ক্রমাগতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের ভারতশাসন স্পঞ্জের গুায় প্রসারিত হইয়া গঙ্গাতীরবর্তী সমস্ত উত্তম ও লোভনীয় পদার্থ সকল শোষণ করিয়া লইতেছে এবং আকুঞ্চিত হইয়া সেই সমৃদ্ধিসম্ভার আমাদের টেমস নদীতীরে ঢালিয়া দিতেছে।...

ভারতবাসীর উপর করস্থাপনের আলোচনায় ভারতবাসীর মতামত প্রকাশের অধিকার নাই ; কর আমরা স্থাপন করি, তাহাদিগকে নীরবে সে কর প্রদান করিতে হয় ; আইন আমরা প্রণয়ন করি, বিধিবদ্ধ করি, তাহারা সে আইন মান্য করিতে বাধ্য। তাহাদের দেশের শাসনকার্য্যে তাহাদের কোন অধিকার নাই। যে তাহাদিগকে অজু-
হা করে মর্কর প্রকার অধিকার হইয়া থাকে

তাহাও কি দান্তিক কি অপমানকর অভ্যুহাতটি এই যে
এ সকল দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে হইলে যে বুদ্ধি-বিবেচনা,
নীতিজ্ঞান ও চরিত্র-বল থাকা প্রয়োজনীয়, ভারতবাসীর
তাহা নাই।” *

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতীয় শিল্পকলার
ধ্বংসসাধন পূর্বক ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির জন্ত যাহা করা
প্রয়োজন, তাহাতে ইংরাজ শাসক সম্প্রদায় বিন্দুমাত্র ক্রটি
করেন নাই। ইহার কারণ এই বিলাতী গর্ভণমেণ্ট ভোট-
দাতাগণের মধ্যে বণিক দোকানদার আর শ্রমশিল্পীরই
প্রাধান্য; ইহারাই বিলাতের শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করি-
তেছে; ইহারাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা, রাজনীতিক বা
দার্শনিকগণের স্থান সেখানে নাই বলিলেই হয়। ইংলণ্ডের
শিল্পজাত পণ্য ভারতে আসিতে লাগিল, কোম্পানীর
নিযুক্ত বড় লাট, কোম্পানীর পতিনিধিগণ এ কার্য্যে
যথাসাধ্য সহায়তা করিতে লাগিলেন; অথচ ভারতীয়
পণ্যের উপর উচ্চ হারে অযথা শুল্ক বসাইয়া তাহার ইংলণ্ড-
প্রবেশপথ রুদ্ধ করা হইল। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ
করিলেই ব্যাপারটি বোধগম্য হইবে।

“ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী শিল্পজাত পণ্যের উপর
ব্রিটিশ সরকার আমদানী শুল্কের গুরুভার বসাইলে ভারত

হইতে ইংলণ্ডের কমন্স সভায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ হয় ; কিন্তু সে প্রতিবাদে কোনই ফল হইল না । শেষে চারি শত ইংরাজ ও ভারতীয় সওদাগর ভারত হইতে প্রেরিত চিনি ও মত্তের উপর আমদানী শুল্কের বিরুদ্ধে আর একবার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; * কিন্তু বিলাতী সরকার তাহাও অগ্রাহ্য করিলেন । বিলাতী সরকারের উদ্দেশ্য, যে সমস্ত কাঁচা মাল হইতে বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেগুলি অন্য কোনও দেশ হইতে আমদানী না করিয়া এক ভারত হইতেই আমদানী করিবেন, সুতরাং ভারত আর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত না করিয়া বিলাতী শিল্পীগণের সমৃদ্ধির জন্য কেবল কাঁচা মাল প্রস্তুত করিয়া বিলাতে রপ্তানী করিবে ।” জার্মান অর্থনীতিবিৎ ফ্রেডরিক লিষ্ট বলিয়াছিলেন :— “যদি বিলাতী সরকার বিলাতে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য অবাধে প্রবেশ করিতে দিতেন, তাহা হইলে অতি অল্পকাল-মধ্যেই বিলাতী শিল্পের ধ্বংস হইত ।” † এইরূপে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে ভারত শিল্পপ্রধান স্থান ছিল, সেই ভারতকে কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইল ।

* Economic history of India p. 294.

† The National System of Political Economy.

প্রকল্পের হার

	১৮১২	১৮২৪	১৮৩২
	মূল্যের উপর শতকরা হিসাব	মূল্যের উপর শতকরা হিসাব	মূল্যের উপর শতকরা হিসাব
মৃদুতা বেতের দ্রব্যাদি	৭১	৫০	৩০
মসলিন	২৭২	৩৭২	১০
ছিটের কাপড়	৭১২	৬৭২	১০
অস্ত্রান্ত কার্পাস দ্রব্যজাত	২৭২	৫০	২০
পশমি শোল	৭১	৬৭২	৩০
সোনালি কাজকরা দ্রব্যাদি	৭১	৬২২	৩০
মাদুর	৬৮২	৫০	২০
কাঁচা রেশম	মূল্যের উপর ২ পাউণ্ড ১৩ শিঃ ৬ পেঃ এবং প্রতি পাঃ ৪ শিঃ হিঃ	পাউণ্ড প্রতি ৪ শিলিং	পাউণ্ড প্রতি ১ পেনি
রেশমী দ্রব্য	আমদানী নিষিদ্ধ	আমদানী নিষিদ্ধ	দামের উপর শতকরা ২০
বাপতা বা অস্ত্রান্ত সাদা বা	"	"	"
কাজকরা রেশমি কাপড়	"	"	"
রেশমিজাত দ্রব্য	"	"	২০
চিনি (খরিদ মূল্য প্রতি হন্দর	১ পাউণ্ড ১৩ শিলিং প্রতি হন্দর	৩ পাউণ্ড ৩ শিলিং প্রতি হন্দর	১ পাঃ ১২ শিঃ প্রতি কোয়ার্টার
প্রায় ১ পাউণ্ড)			
মস্তাদি	প্রতি গ্যালন ১ শিঃ ৮ পেঃ ও ১৯ শিঃ ১২ পেঃ আবগারি ট্যাক্স	প্রতি গ্যালন ২ শিঃ ১ পেঃ ও ১৭ শিঃ ৬ পেঃ আবগারি ট্যাক্স	প্রতি গ্যালন ১৫ শিলিং
কার্পাস	প্রতি ১০০ পাঃ ১৬ শিঃ ১১ পেঃ	শত করা ৬	শতকরা ২০

কাপাস-জাত এবং রেশমী দ্রব্য, শাল, পশমী দ্রব্য, চিনি, তামাক, রম, নানাবিধ রঙ্গ, সোরা, কফি, চা, ইম্পাত, স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, কয়লা, কাষ্ঠ, অহিফেন এবং লবণ এই সকল দ্রব্য, ইহা ভিন্ন সর্বপ্রকার শস্ত ভারতবর্ষ হইতে যুরোপ ও এশিয়ার নানা দেশে রপ্তানী হইত ; কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের অজুহাতে ইংলণ্ড ভারতে বিলাতী শিল্পজাত পণ্য পাঠাইতেছেন এবং ভারতবাসী তাহা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছে । এ সমস্ত দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক নাই ; কিন্তু ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে ইংলণ্ড প্রবেশ করিতে না পারে, অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক বসাইয়া ইংলণ্ডের রাজসরকার সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । বিগত দেড়শত বর্ষব্যাপী ইংরাজ-শাসনকালে ভারতবর্ষের কোন প্রকার শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই । ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সে উৎসাহপ্রদানে নিতান্ত বিমুখ । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনসময়ে প্রায় ২ শত ৩৫ প্রকার ভারতজাত দ্রব্যের উপরে ভারতের মধ্যেই শুল্ক বসান হইয়াছিল । ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের কাপাসশুল্ক আইনের ৬ দফায় লিখিত আছে :—“ব্রিটিশ ভারতে যত কাপড়ের কল আছে, তাহার প্রত্যেক কলে সেই সেই কলে প্রস্তুত কাপড়ের উপর মূল্যের হিসাবে শতকরা ৩০ করিয়া শুল্ক আদায় করা হইবে ।” মিঃ দত্ত এই আইনটির উপর

শুল্কনীতি কি ভয়ানক পক্ষপাতদোষহুঁ, তাহার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আইনটির বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সভ্য জগতের কোনও দেশে ইহার তুলনা নাই। প্রায় সকল সভ্য দেশেই বিদেশ হইতে আমদানী শিল্পজাত পণ্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্প রক্ষা করা হইয়া থাকে। যে সকল সভ্য দেশ অবাধ বাণিজ্যনীতির একনিষ্ঠ সেবক, সেখানেও দেশীয় শিল্পের উপর কোন শুল্কই স্থাপন করা হয় না; তবে রাজস্ববৃদ্ধির জন্ত বিদেশ হইতে আমদানী শিল্পজাত পণ্যের উপর নামমাত্র শুল্ক বসান হইয়া থাকে মাত্র। ভারতে শিল্পের এখন শৈশবাবস্থা, এ অবস্থায় ভারতীয় শিল্প সর্বদা রক্ষণীয়। বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রবিৎ জন টুয়ার্ট মিলও এই মতের পোষকতা করেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় শিল্পের রক্ষাকল্পে কোন চেষ্টাই করেন নাই। সামান্য শুল্ক বসাইয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার সুযোগও ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ১৮৭৯ এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিলাতী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ সমর্থ। এ যুক্তি দেখাইয়া ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অগ্নান-বদনে ভারতীয় শিল্পের উপর শুল্ক বসাইলেন। ভারত-শাসনকার্যে ভারতবাসীর প্রতিনিধি কেহই নাই; এই প্রতিনিধিবিহীন ভারতবাসীর স্বার্থ এই ভাবে নষ্ট করা

হইল।” * ইংরাজ শাসনকালে ভারতবাসীর কি প্রকার আর্থিক উন্নতি ঘটিয়াছে, ভারত কতটা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে, ইহা হইতেই অনুমান করিতে হইবে।

আসামে চাএর চাষ হয়। এই চাএর চাষের জন্য শ্রমজীবী সরবরাহ করিবার নিমিত্ত একটা বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতে এই আইনকে “Slave Law” (কুলী আইন) বলে। এই আইনটি চা-চাষের একটি কলঙ্কস্বরূপ। নানা প্রলোভনে অশিক্ষিত সরলবুদ্ধিসম্পন্ন নর-নারীকে প্রথমে চুক্তিপত্রে সম্মত করাইয়া লওয়া হয়। তখন আর রক্ষা নাই; যেমন করিয়া হউক, চুক্তিপত্র অনুযায়ী যত দিন মেয়াদ থাকিবে, তত দিন তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া আসামের চাএর বাগানে কুলীগিরি করিতে হইবে। যদি তাহারা পরি-জ্ঞানলাভের জন্য পলায়নের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আবার চা-কর মনিবের হস্তে সমর্পণ করা হয়। রাজদণ্ডভয়ে তাহারা বাধ্য হইয়া পরিশ্রম করিতে থাকে। এমন আইন ভারতে অন্য কোনও প্রকার কার্যের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নাই। এই কুলীসংগ্রহ ব্যাপারে কত ঘৃণিত জাল, কত প্রতারণা, নির্যাতন, স্ত্রী-পুরুষ-হরণ কত কাণ্ডই বঙ্গ-দেশের ফৌজদারী আদালতে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে,

কতবার এই চুক্তির কুলীগণের মধ্যে কত স্ত্রী বা পুরুষ কুলীর প্রতি কত ঘৃণিত অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের চা-বাগানের ইতিহাসে ইহা এক ছরপনের কলঙ্ককালিমা। দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারিগণ কতবার এই কুলী-আইন উঠাইয়া দেওয়ার অনুরোধ করিয়াছেন ; তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতে শ্রমজীবীর অভাব নাই ; কার্য্য পাইলেই শ্রমজীবীগণ চা-বাগানে যাইবে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ বিধির প্রয়োজন নাই। কিন্তু ধনাঢ্য চা-করের প্রভাব অসীম। কোন ভারত-সচিব বা কোনও বড় লাট এ পর্য্যন্ত এই কুলী-আইন রদ করিতে সাহসী হইলেন না ; এই কুলী আইন দাসব্যবসায়ের নামান্তরমাত্র ; অথচ ইহা অত্যাচারি ভারত হইতে উঠিল না।” *

ভারতবাসীর রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ, এক্ষণে সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাউক। “১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোম্পানীর শাসনপ্রথার গুঢ় উদ্দেশ্য যেমন তেমনই আছে। কোম্পানীর মূলধন ইংরাজ সরকার ঋণ করিয়া পরিশোধ করিয়াছেন, সে ঋণদায় ভারতের। ভারতবাসীর প্রদত্ত কর হইতে সরকার এই ঋণের সুদ পাঠাইয়া থাকেন, ভারত-সাম্রাজ্য

* India in the Victorian Age, p. 352.

কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া ব্রিটিশ সরকারের অধিকারে আসিল, কিন্তু তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিল ভারতবাসী ।” * ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের সাধারণ বা সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ১০৫ কোটি টাকা । যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত শাসন করিতেন, সেই দীর্ঘ ১ শত বৎসরে কোম্পানী এই টাকা ভারতে খরচ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অপর পক্ষে কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে ২ শত ২৫ কোটি টাকা ভারত হইতে আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছেন ; অথচ এক কপর্দকও সুদ দেন নাই । ইহা ব্যতীত কোম্পানী চীন, আফগানিস্তান প্রভৃতি ভারতের বহির্ভাগে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার ব্যয়ও ভারতের নিকট দাবী করিয়াছেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর শাসনের অবসানকালে ভারতের নিকট কোম্পানীর এক কপর্দকও প্রাপ্য ছিল না । ভারতের এই সরকারী বা জাতীয় ঋণ একটা অদ্ভুত কল্পনামাত্র । অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে, কোম্পানী ভারত হইতে যে টাকা লইয়া গিয়াছেন, হিসাবমত তাহার ১ শত ৫০ কোটি টাকা ভারতের প্রাপ্য । ইংরাজের রাজসরকার ভারত-সাম্রাজ্যের ভারগ্রহণ পূর্বক ১৯ বৎসরের মধ্যেই ভারতের এই জাতীয় ঋণ দ্বিগুণ করিয়া বসিয়াছেন । ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যখন মহারানী ভারতের

সাম্রাজ্ঞী পদে অভিষিক্তা হন, তখন এই ঋণ প্রায় ২ শত ৮ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ইহার মধ্যে ৬০ কোটি টাকা সিপাহীবিদ্রোহদমন ব্যাপারে ইংরাজ সরকার ব্যয় করিয়াছেন বলিয়া তাহাও ভারতের ঋণ বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইয়াছিল; এই যুদ্ধের খরচ বাবদ ভারতকে বহু অর্থ দিতে হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় ঋণ হইল ৩ শত ৩৬ কোটি টাকা। সরকারী ও সরকারের দায়িত্বে পরিচালিত ভারতীয় রেলপথগুলির নির্মাণ জন্তই জাতীয় ঋণ এই ভাবে বাড়িয়া গেল। ভারতের কত শত অভাব; কিন্তু সরকার কোন দিকেই দৃকপাত না করিয়া রেলবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াই এই কাণ্ডটি ঘটাইলেন। ১৮৭৮ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধও এই ঋণবৃদ্ধির জন্ত কিয়ৎপরিমাণে দায়ী।

ভারতকে এই জাতীয় ঋণের সুদ দিতে হইতেছে এবং এই সুদের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত শাসন ও সমর বিভাগের যাবতীয় কর্মচারীর বেতন, বিরাট সৈন্যদলের সমস্ত খরচ, এমন কি, লণ্ডনের সেই ভারত-সচিবের আফিস আছে, তাহা নির্মাণ করিবার খরচ, ভারত-সচিবের যে আফিসের সামান্য সামান্য কুলী-চাপরাসীর বেতন পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে আদায় করা হয়। এক ১৯০১-২ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে খরচ বাবদ ৭ কোটি

১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ২ শত ৮২ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড = ১৫ টাকা) আদায় করা হয় । ইহার মধ্যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬ শত ৫৫ পাউণ্ড হোমচার্জ বলিয়া বিলাতে ব্যয় হয় । ইহার উপর ভারতে ইংরাজ রাজকর্মচারিগণের বেতন আছে । এই টাকা সবই বিলাতে পাঠান হইয়াছে । নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে ব্যাপারটি বুঝিতে পারিবেন :—

(১) ঋণের সুদ ও ব্যবস্থা বাবদ	৩০৫২৪১০ পাউণ্ড
(২) ভারতের জন্ত ডাক ও তারবিভাগের খরচ বাবদ	২২৭২৮৮ "
(৩) সরকারী খাস ও সরকারী দায়িত্বে পরিচালিত রেলের জন্ত ঋণের সুদ প্রভৃতি বাবদ	৬১১৬৩৭৩ "
(৪) পাবলিক ওয়ার্কস্ (Absentee Allowances etc.)	৫১২১৪ "
(৫) ম্যারিন্ (জাহাজ-সম্বন্ধীয় খরচ) ও ভারতসাগরে যুদ্ধ-জাহাজের পাহারা জন্ত	১৭৩৫০২ "
(৬) বিলাতে ভারতের জন্ত সময় বিভাগের ব্যয় বাবদ (পেন্সন সমেত)	২৯৭৫৬১৪ "
(৭) সিভিল চার্জ (ভারত-সচিবের অফিসের খরচ কুপাস্ হিল্ কলেজ পেন্সন প্রভৃতি)	২৪৩৫৩৭০ "
(৮) স্টোপ্ (ভারতরক্ষার জন্ত সরঞ্জাম সমেত)	২০৫৭৯৩৪ "

বেতন বাবদ কত খরচ হইয়া থাকে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	কর্মচারীর সংখ্যা					ইউরোপীয়গণের বেতন বাবদ খরচ টাকা	ইউরোপীয়গণের বেতন বাবদ খরচ টাকা	ইউরোপীয়গণের বেতন বাবদ খরচ টাকা
	মহিলা	মহিলা	মহিলা	মহিলা	মহিলা			
শাসন ও বিচার বিভাগ প্রভৃতি	৫৫	১০	১২১১	২৪৭০০০	১৫১০০০	২৫২৭৪০০০		
সমর বিভাগ	১	১	৮৫৪	১২০০০	১১০০০	১৩২৬৮০০০		
পাবলিক ওয়ার্কস্	৩	৪	২৩৯	৩৩০০০	৪৫০০০	৩৪১৫০০০		
অঙ্গীভূত লোকাল ফাণ্ড	১	...	৯	১০০০০		১৩৩০০০		

ইহা বাতীত যাহারা বার্ষিক বেতন বাবদ ১০ হাজার টাকা তদূক্ত পাইয়া থাকেন, এমন ১ শত ৫ জন কর্মচারী ভারতীয় রেলপথসমূহে নিযুক্ত। ইহারা সকলেই যুরোপীয়। ইহাদের বেতন ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা (৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৬ শত ৬৭ ডলার)। যে সকল কর্মচারী বার্ষিক ৫ হাজার টাকা হইতে ১০ হাজার টাকা বেতন পান, তাঁহাদিগের মধ্যে দেশীয়ের সংখ্যা শাসন বিভাগে ৪ শত ২১, যুরোপীয় ১ হাজার ২ শত ৭ এবং ইউরেশীয় ৯৬। সমর বিভাগে ২৫ জন দেশীয়, ১ হাজার ৬ শত ৯৯ জন যুরোপীয় এবং ১২ জন ইউরেশীয় ঐরূপ বেতন পান। পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে দেশীয়ের সংখ্যা ৮৫ অথচ যুরোপীয় এবং ইউরেশীয় যথাক্রমে ৫ শত ৪৯ ও ৩ জন।

পার্লামেন্ট মহাসভার সদস্য মিঃ এলফ্রেড ওয়েব বিষয়টি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন, “লণ্ডনস্থ ভারত-সচিবের আফিসের খরচ বাবদ ভারতের জন্ত বিলাতে গোরাসৈনিক সংগ্রহের খরচ বাবদ, অবসরপ্রাপ্ত যে সকল শাসন ও সমর বিভাগের কর্মচারী বিলাতে আছেন, তাঁহাদিগের পেন্সন বাবদ, যাহারা অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে আইসেন, তাঁহাদের ভাতা প্রভৃতির জন্ত ভারত হইতে ইংলণ্ডে বে-সরকারী ভাবে যে অর্থ আসিয়া পড়ে, সে বাবদ, ভারতের জন্ত বিলাতে যে ঋণ গ্রহণ

অংশীদারগণের লভ্যাংশ বাবদ বৎসর বৎসর ভারত হইতে
 বিলাতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৩০ কোটি পাউণ্ড
 (৪৫ কোটি টাকা অথবা ১২ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে
 ১৫ কোটি ডলার) প্রেরিত হয় । যদি এই অর্থশোষণ
 কয়েক বৎসরমাত্র কি এক বৎসরের জন্তও চলিত, তাহা
 হইলেও তাহা গ্রাহ্যোচিত হইত না । কিন্তু যে দিন হইতে
 ভারত ইংরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে
 আজ পর্য্যন্ত সমভাবে এই ভয়ঙ্কর শোষণক্রিয়া চলিয়া
 আসিতেছে । এ সম্বন্ধে মিঃ ব্রুকস্ ব্রডামস্ লিখিয়াছেন,
 ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়, এই পলাশী-যুদ্ধের পর হই-
 তেই বাঙ্গালার লুণ্ঠিত ধন-রত্ন বিলাতে আসিতে লাগিল
 এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে অসামান্য ধনবৃদ্ধি নানা দিকে
 আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল । মনে হয়, পৃথিবীর সৃষ্টিকাল
 হইতে এ পর্য্যন্ত ভারত লুণ্ঠন করিয়া যে ভাবে অর্থসঞ্চয়
 হইয়াছে, তেমন অর্থ কেহ কখনও ব্যবসারে টাকা খাটাইয়া
 উপায় করিতে পারে নাই । ধন-রত্নের স্রোত হতভাগ্য
 পরাজিত ভারতের ধনকোষ হইতে কি নিষ্ঠুর উদাসীনতার
 সহিত নির্গত হইয়া ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক সমূহে আসিয়া নিষ্কুতি
 লাভ করিল ! যে ধন-রত্ন এই ভাবে পলাশী ও ওয়াটারলু
 যুদ্ধের মধ্যে অর্থাৎ এই ৫৭ বৎসর ভারত হইতে বিলাতে
 আসিয়াছে, তাহার পরিমাণ '৫০ কোটি পাউণ্ড হইতে
 ১ শত কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ শত কোটি টাকা বলিয়া

অনেকের অনুমান । ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রেল তারিখের লণ্ডন ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেট বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫ বৎসরে ভারত হইতে অনুমান ৫ কোটি পাউণ্ড (২ শত ৫০ কোটি ডলার অথবা ৭ শত ৫০ কোটি টাকা) বিলাতে আসিয়াছে । যদি বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ হইতে উদ্ধৃত না হইত, তাহা হইলে আজ এ কথা কে বিশ্বাস করিত ? ভারত আজ এত দরিদ্র কেন, এখন কি আর তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে ? কোন জাতি এমন ভাবে সর্বস্বান্ত হইয়াও কি বাঁচিয়া থাকিতে পারে ?

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ইংলণ্ড ভারতের উন্নতির জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ড এ বিষয়ে এক কপর্দকও ব্যয় করেন নাই । (ইহার সহিত উপনিবেশগুলির তুলনা করিয়া দেখুন) ভারত গভর্নমেন্ট বলিয়া একটি আমলাতন্ত্র বুঝায় । এই আমলাতন্ত্রের সভ্য স্বয়ং বড় লাট, কার্যানির্বাহক সভার সভ্যগণ, জঙ্গীলাট, সমরবিভাগীয় সদস্য, পূর্তবিভাগীয় সদস্য, অর্থসচিব এবং আইনবিভাগীয় সদস্য । ভারতবাসীর কোনও প্রতিনিধি এই কার্যানির্বাহক সভায় নাই । ভারতবাসীর কৃষি-ভূমিসংক্রান্ত স্বার্থ তাঁহাদিগের, তাঁহাদিগের ব্যবসায় ও শিল্প এ সকলের জন্য কোন প্রতিনিধিই এ সভায় নাই । এ পর্যন্ত এ সভায় ১ জন ভারতবাসীর

নিযুক্ত হয়েন নাই। সভ্যগণের সকলেই উচ্চপদস্থ যুরোপীয় কন্সচারী, ইঁহার উচ্চহারে বেতন পাইয়া থাকেন এবং অবসর লইয়া আমরণ পেন্সন ভোগ করেন।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা আছে। এই সভার কয়েক জন মাত্র সভ্য ১৮৯২ সালের বিধি অনুসারে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই ব্যবস্থাপক সভার প্রধান কার্য আইন-প্রণয়ন। নিয়ম-অনুসারে দেশের আয়-ব্যয়ের উপর সভার কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু তাহা নাম-মাত্র। স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-প্রথায় কর্তৃপক্ষই আয়-ব্যয়ের সকল কার্য স্থির করিয়া রাখেন, ব্যবস্থাপক সভায় তাহার সামান্য আলোচনা হয় মাত্র। বজেট পাশ করা না করা ভারতবাসীর প্রতিনিধিগণের ক্ষমতার অতীত।

এই ব্যবস্থাপক সভায় ২৫ জন মাত্র সদস্য আছেন; ইঁহাদিগের মধ্যে মাত্র চারি জন স্থলবিশেষ হইতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদিগের নিয়োগের কর্তা স্বয়ং বড় লাট। তিনি ইচ্ছামত সদস্য নিযুক্ত করিতে পারেন। তবে কোন তর্কের খাতিরে তিনি এই চারি জনকে নির্বাচিত সদস্য বলিয়া থাকেন মাত্র। ঐ চারি জন ভারতবাসী সদস্য টেবলের এক প্রান্তে উপবেশন করিয়া থাকেন, অপর প্রান্তে যুরোপীয় সদস্যগণ অলঙ্কৃত করেন। ভারতীয় সদস্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্যকালে দীর্ঘতা

অনুসারে প্রত্যেক সদস্যই নিজ নিজ বক্তৃতা পাঠ করিয়া থাকেন। অপর সদস্যগণ কে কি বলিবেন, কেহই তাহা জানিতে পারেন না ; না জানিয়াই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন ; রীতিমত আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক কিছুই হয় না। বড় লাট ইচ্ছামাত্র এ বক্তৃতার ধারা যে কোন পথে চালিত করিতে পারেন। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ সভায় বাহাই বলুন না কেন, তাহাতে কোন ফলই হয় না। তাঁহারা সভায় দলাদলি করিয়া স্বপক্ষ প্রবল করিয়া তুলিতে পারেন না। কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের উপর তাঁহাদিগের কোন প্রভাবই নাই। প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থায় সভায় ভারতবাসী প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন কথা আর বলা চলে না।

ভারত-সচিব বিলাতী গভর্নমেন্টের এক জন সভ্য, ভারতের রাজ-প্রতিনিধি তাঁহারই অধীন কর্মচারী, তাঁহার আজ্ঞাপালন রাজপ্রতিনিধির কর্তব্য। ভারত-সচিব ভারতীয় প্রজার দেশ ভারতবর্ষ হইতে ছয় সহস্র মাইল দূরে অর্থাৎ ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। তাঁহার সাহায্যকারী একটি সভা আছে, সভার সদস্য সংখ্যায় দশ জন। ইঁহারা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত এংলো-ইণ্ডিয়ান। সদস্যগণ সকলেই স্বদেশের স্বার্থ-চিন্তায় অবহিত। এই সমগ্র ব্যাপারটিকে সার উইলিয়াম হার্টার “Oligarchy” (সে

থাকে) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; ইহাতে প্রজার প্রতি-
নিধির স্থান আদৌ নাই ।

রুমিয়ার লায় ইংরাজের ভারত-শাসন-প্রণালীও স্বেচ্ছা-
চারমূলক । কারণ, এই শাসনব্যাপারে ত্রিশ কোটি
ভারতবাসীর কোনও অধিকার নাই । ভারতবাসীর মতা-
মত ভারতবাসীর মস্তবোর স্থলে কোথাও নাই । বর্তমান
ভারত-শাসন-প্রথার প্রধান লক্ষ্য ইংরাজের স্বার্থরক্ষা ।
ভারতবাসী সর্বপ্রকার গুরু করভার বহন করিতে থাকিবে,
তাহা হইলেই হইল । ভারত সরকার সুদান, মিশর, চীন-
তিব্বত এবং অন্যান্য স্থানে সৈন্ত প্রেরণ করিবেন, এ সকল
স্থান ভারতের বাহিরে ; তথাপি এই সকল যুদ্ধের বায়ভার
লক্ষ লক্ষ ডলার দরিদ্র ভারতবাসীকে বাধ্য হইয়া বহন
করিতে হইবেই ।* ভূমিকর বা অন্যান্য কর বাবদ ভারত-
বাসীর নিকট হইতে যে ভাবে যে অর্থ শোষণ করা হয়,
পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই তাহা হয় না । ভারতবর্ষে
সরকার প্রকৃতপক্ষে জমীর আয়বুদ্ধির পথে বাধা প্রদান
করেন ; কৃষকগণের লাভের অন্তরায় স্বয়ং সরকার । যতবার
জমীর বন্দোবস্ত হয়, তত বার সরকারের অর্থ আদায় করি-
বার সুযোগ উপস্থিত হয় । ইহার ফলে দেশের কৃষক-
সম্প্রদায় চির-দারিদ্র্য ভোগ করে । ইংলণ্ড, জার্মানী, যুক্ত-
রাজ্য, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে সরকার প্রজার আয়বুদ্ধির

সহায়তা করেন। দেশের পণ্য বিক্রয়ের জন্য নূতন নূতন স্থানের ব্যবস্থা করেন, অর্থাগমের নব নব পন্থা আবিষ্কার করেন; এক কথায় বলিতে হইলে সরকার ও দেশবাসী এক ও অভিন্ন; দেশবাসীর সমুদ্বিলাভের সঙ্গে সঙ্গে সরকারও সমৃদ্ধ হইলেন। ভারত সরকার প্রজার জন্য কোনও নূতন শিল্পের ব্যবস্থা করিয়া দেন নাই; কোনও মৃতপ্রায় শিল্পকে পুনর্বার সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন নাই। অপর পক্ষে যতবার জমীর নূতন বন্দোবস্ত হয়, ততবারই সরকার সুযোগ বুঝিয়া জমীর উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।*

ইংরাজ ভারতে যে ভূমিকর স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল অত্যধিক নহে, প্রথাটি অতি নিকৃষ্ট। অধিকাংশ প্রদেশেই ভূমিকরের হার নির্দিষ্ট ও স্থায়ী নহে; সর্বদাই পরিবর্তনশীল। ইংলণ্ডে ভূমিকরের হার ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এক শত বৎসর যাবৎ প্রতি পাউণ্ডে এক শিলিং হইতে চারি শিলিং অর্থাৎ জমীদার যে খাজানা আদায় করেন, তাহার শতকরা ৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ ছিল। ইহার পর রাজমন্ত্রী পিট ইহা অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্থলবিশেষে ভূমিকর ছাড়িয়া দেওয়াও বাইতে পারে, ইহাই বিধিবদ্ধ হয়। ভারতে ১৭৯৩ হইতে

১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ভূমিকর খাজানার শতকরা
৯০ ভাগ এবং উত্তর-ভারতে ৮০ ভাগ ছিল।*

অধুনা দরিদ্র ভারতবাসী দিনমজুরী করিয়া মাত্র দুই
আনা চারি আনা উপার্জন করিয়া থাকে; তাহাতেই
পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। সরকার এই দুঃখ-
দারিদ্র্য দূর করিবেন, এই আশায় ভারতবাসী বিগত বিশ
বৎসর যাবৎ আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা প্রতি বৎসর
সভা করিয়া থাকেন। এই বাৎসরিক সভা ব্যতীত নানা
স্থলে বিশেষ বিশেষ সভা আহূত হইয়া থাকে। এই সকল
সভায় ভারতের শিক্ষিতসম্প্রদায় যোগদান করিয়া থাকেন।
ভারত গভর্ণমেন্ট সর্বপ্রকারে প্রজার এই আন্দোলন বন্ধ
করিবার জন্য বন্ধপরিষদ; তথাপি সভা হইতেছে;
বাৎসরিক সভার মন্তব্যগুলি সভার কর্তৃপক্ষ বরাবর ভারত-
সচিব ও ভারতের রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিতে-
ছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তৃগণ একটি
উৎসাহের বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। ইঁহারা রুসিয়ার
স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনপ্রথাকেই আদর্শ করিয়াছেন।
কিন্তু সার হেনরী কটন বলেন :—“আমরা রুসিয়াতেই
স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনপ্রথার একটা আদর্শ দেখিয়া থাকি,
ইহাই আমাদের অভ্যাস; কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্টই
স্বেচ্ছাচারিতার আদর্শ; রুসিয়ার শাসন-প্রথা এতটা

নহে।” কোন কোন দান্তিক নিশ্চয় যৌবনমদমত্ত সিভি-
লিয়ান কয়েক বৎসরের জন্ত ভারতে পদার্পণ করেন।
উদ্দেশ্য—ভারতের অর্থশোষণ, অর্থ-লালসার তৃপ্তিসাধন
এবং স্বার্থসিদ্ধি। ইহারা দরিদ্র ভারতবাসী-প্রদত্ত অথৈ পুট
হইয়া স্বদেশে বাইয়া রামরাজ্য করিতে থাকেন। আমি
আপনাদিগকে লর্ড কার্জনের ভারতশাসন একটা দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ উল্লেখ করিব। সেই লর্ড কার্জন ভারতবাসীর
অত্যন্ত অপ্রিয়। সর্বকাৰ্য্যে বাধাপ্রদান ও প্রজার প্রতি
অবিশ্বাস ইহার ভারত-শাসনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি
স্বাধীনতার অনুরোধে কিংবা জাতির স্ত্রায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা
আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। সে সময় ভারতের
সংবাদ-পত্রগুলি ক্রমশঃ প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছিল।
তাহার আর সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বে Official
Secrets Act অর্থাৎ রাজ্যের গুপ্তমন্ত্রবিষয়ক একটা আইন
বিধিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতাটুকু হরণ করিয়া
লইলেন। তাহার শাসনকালে শাসন ও সমর-বিভাগীয়
সমস্ত ব্যাপার গুপ্ত রাখিতেই হইবে, সরকার এইরূপ
একটা সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তিব্বতে এক অভিযান
প্রেরণ করিলেন। যখন ভারতে দুর্ভিক্ষে হাহাকার উপস্থিত ;
প্লেগে লক্ষ-লক্ষ প্রজা প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তখন তিনি
দিল্লী নগরে এক বিরাট দরবারের আয়োজন করিয়া দরিদ্র
বিপন্ন প্রজার অর্থ জলের মত খরচ করিতে লাগিলেন।

স্বদেশানুরাগ বা জাতীয়তার প্রেরণা তিনি একেবারেই
সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রাচীন রোমের আদর্শে
তিনি ভেদমন্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি
বঙ্গদেশে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। উদ্দেশ্য—উচ্চ-
শিক্ষিত বঙ্গবাসীকে খর্ব করা। এই সকল কার্য তিনি
একরূপ স্বৈচ্ছাচার ও হঠকারিতার সহিত সম্পন্ন করিলেন যে,
তাঁহার সাত কোটি বঙ্গবাসী প্রজার সম্মিলিত আবেদন
তিনি অনায়াসেই অগ্রাহ্য করিলেন। ফলে বঙ্গবাসী
বিলাতী পণ্য বর্জন করিবার সঙ্কল্প করিলে দাবাণ্ডির স্থায় এই
পণ্য-বর্জন (Boycott) উত্তেজনা দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত
হইল। দেশবাসী একমত হইয়া বার বার ভারত-সচিব এবং
রাজপ্রতিনিধির নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু
ভারতের এবং বিলাতের উচ্চ সমৃদ্ধ রাজকর্মচারীগণ
আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। আশা
করি, এই পণ্য-বর্জন হইতে অত্যাচারী রাজপুরুষগণের
জ্ঞানোদয় হইবে।

ভারতবাসী রাজভক্ত এবং তাঁহারা আইনের মর্যাদা
বুঝেন। কিন্তু তাঁহারা দেড় শত বৎসর যাবৎ বিদেশীর
নির্মম শাসনে অসন্তুষ্ট ও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। স্বর্গীয়
মহারাজী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাদী এক দিন না এক দিন
কার্যে পরিণত হইবেই—যদি ভারতবাসী এ আশা না
করিতেন, তাহা হইলে ভারতে এত দিন ভয়ানক বিদ্রোহ ও

বিপ্লব আরম্ভ হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই
ভীষণ সিপাহী-বিদ্রোহবাহি নির্বাপিত হইলে পরই
মহারানী ভিক্টোরিয়া এই মর্মে ঘোষণা করেন :—

“আমরা বৃটিশ-শাসিত ভারতের আর বিস্তার প্রার্থনা
করি না। অপর কেহ আমাদিগের রাজ্যে বা অধিকারে
হস্তক্ষেপ করিলে আমরা সে অপরাধ মার্জনা করিব না
বটে, কিন্তু আমরাও কাহারও রাজ্যে বা অধিকারে হস্তক্ষেপ
করিব না। আমরা যেমন আমাদিগের অধিকার, সম্মান ও
সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিব, তেমনই এদেশীয় রাজগণের
সম্মান, সম্মান ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা আমরা কর্তব্য মনে
করিব। আমরা আশা করি, দেশীয় রাজগণ এবং আমা-
দিগের প্রজাবৃন্দ শান্তি ও সুশাসনের ফলে ক্রমশঃ সমৃদ্ধি
এবং সামাজিক উন্নতির পথে অগ্রসর হউন।

“আমাদিগের অন্ত্যান্ত প্রজার প্রতি আমরা যাহা কর্তব্য
বিবেচনা করিয়া থাকি, আমরা আমাদিগের ভারতীয় প্রজা-
গণের প্রতিও তুল্য কর্তব্য সম্পাদন করিব। আমরা আশা
করি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্বাদে বিশ্বস্তভাবে
বিবেকের সহিত আমাদের কর্তব্যপালনে আমরা
সমর্থ হইব।

“আমরা খৃষ্টীয়ধর্ম্মে আত্মবান্ এবং কৃতজ্ঞতার সহিত
আমরা এই ধর্ম্মগত শান্তি হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি ;

আমাদের ধর্মমত প্রচারের জন্য কোন প্রকার বলপ্রকাশ করিব না।

“আমাদের রাজশক্তির ইহাই অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য যে, কোনও ব্যক্তি অপর ধর্ম গ্রহণের জন্য বা বিরুদ্ধ ধর্মালু-
ষ্ঠানের জন্য কোনও প্রকার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ ভোগ করি-
বেন না। অপর পক্ষে সকলেই রাজদ্বারে তুল্য ও নিরপেক্ষ
ব্যবহার ও বিচার লাভ করিবেন। আমরা বিশেষভাবে
আমাদিগের রাজকর্মচারিগণের প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার
করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদিগের প্রজাবৃন্দের ধর্মমত বা
উপাসনাপদ্ধতি ক্ষুণ্ণ করিবেন না; করিলে তিনি রাজ-
অনুগ্রহে বঞ্চিত ও আমাদের রোষভাজন হইবেন।

“আমরা ইহাও ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদিগের
প্রজাগণের মধ্যে যাহার যেকোন জাতি, বর্ণ বা ধর্মমত হউক
না কেন, যদি তাঁহার যোগ্য শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্তব্য সম্পা-
দনের শক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অবাধে নিরপেক্ষ-
ভাবে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হইবে।”

(লর্ড কার্জন কিন্তু ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভারতবাসী
জাতিদের অপরাধে কোন কর্মেরই যোগ্য বলিয়া বিবেচিত
হইতে পারে না।)

রাজ্যাভিষেকের দিন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও মহারানী
ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণাবাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।
কিন্তু যাহা বর্গীরা মহারানী এবং সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড

প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকরে যেতাম
আমলাতল কোন প্রয়াস পাইয়াছেন কি ? উত্তরে
কহিব—না।

ভারতবাসী এক্ষণে সম্ভবতঃ হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায়
প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা জন ষ্টুয়ার্ট মিলের
অমর-বাণীর সত্যতা অনুভব করিয়াছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল
বলিয়াছিলেন,—“যখন কোন জাতি আপনাদের দেশ
আপনারাই শাসন করে, তেমন শাসনের একটা অর্থ আছে,
সে জিনিসটার একটা অস্তিত্ব আছে ; কিন্তু এক জাতি
যখন অন্য জাতির শাসনকার্য্য করিয়া থাকে, তেমন শাসনের
কোন অস্তিত্ব নাই। একটা জাতি অপর একটা জাতিকে
আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করিতে পারে, তাঁহাদের
দেশে যাইয়া অর্থোপার্জন করিতে পারে মাত্র। জেতা
বিজিত জাতিকে গো-মহিষাদির গায় ব্যবহার করিয়া
স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে।”

ভারতবাসী এখন স্বাবলম্বী হইতে কৃত-সংকল্প। কিন্তু
প্রবলপরাক্রান্ত বিদেশী জাতির তরবারি যখন স্বন্ধের উপর,
তখন কোন্ সাহসে এই গোলাঘের জাতি আর মাথা
তুলিবে ? যুক্তরাজ্যে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে যুক্ত-
রাজ্যের অধিবাসিগণের কিরূপ দশা ঘটিত, যদি আপনারা
তাহা জানিতে চাহেন, তবে ভারতবাসীর বর্তমান আর্থিক ও

ভারতবর্ষ মিঃ রেডি যথার্থ কথায় বলিয়াছেন :—
 “ইংলণ্ড ভারতে পাদরী পাঠাইয়া ভারতবাসীর জন্ত পর-
 লোকে সোনার সিংহাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু
 তাঁহারা ইহলোকে ভারতবাসীকে একখানা সাদাসিদা চেয়ার
 দিতে এত অসম্মত !” *

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে শিক্ষা

ভারতে শিক্ষার চারিটি যুগ। প্রথম যুগ বুদ্ধের অভ্যুদয়ের পূর্বে অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে; দ্বিতীয় যুগ বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ও প্রভাবের সময় অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত; তৃতীয় যুগ মুসলমান রাজত্বকাল ও চতুর্থ বর্তমান ব্রিটিশ-শাসনের যুগ।

কোনও জাতির শিক্ষার বিষয় অবগত হইতে হইলে সে জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। কারণ, কোন জাতির শিক্ষার পরিমাণ সে জাতির সভ্যতার অনুপাতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতা বৈদিক যুগে আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারি যে, সেই অতি প্রাচীন যুগে ভারতীয় হিন্দুগণ বিরাট ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দুর এই বেদ চারি ভাগে বিভক্ত—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। এগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ইহাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র। হিন্দুরা বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়; আপন আপন ধর্মশাস্ত্রসম্বন্ধে অগ্ৰাণু জাতিরও প্রায় এইরূপ

অধীত হইত ; অধ্যয়নকারী বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া মুখে মুখে ইহা প্রচার করিতেন । সেই প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির বালকবালিকাগণ এই সকল বেদ অধ্যয়ন করিত এবং শিক্ষা অর্থে প্রধানতঃ বেদাধ্যয়নই বুঝাইত ।

প্রাচীন যুগে হিন্দুর জীবন চারি ভাগে বিভক্ত ছিল । প্রথম ভাগ হিন্দুর ছাত্রজীবন । অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে হিন্দু বালকের বিদ্যারম্ভ কাল নির্দিষ্ট ছিল । এই সময় ছাত্র গৃহ ত্যাগ করিয়া শিক্ষকের গৃহে অবস্থান ও বেদাধ্যয়ন করিত । বর্তমান যুগে সভ্য দেশে ছাত্রগণ যেমন কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত করেন, সেইরূপ অতীত যুগেও হিন্দু বালকগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া গুরু-গৃহে অবস্থান করিত । কেহ কেহ বার বৎসর, কেহ চব্বিশ বৎসর, কেহ ছয়ত্রিশ, কেহ বা আটচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত গুরু-গৃহে অবস্থানপূর্বক ইচ্ছানুসারে এক হইতে চারি বেদ পর্য্যন্ত অভ্যাস করিত । ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকট বেদাভ্যাস সমাপনাতে যথাসাধ্য গুরু-দক্ষিণা দান করিয়া ছাত্রগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিত । জ্ঞান-বিক্রয় অর্থাৎ ছাত্রগণকে জ্ঞান দান করিয়া বিনিময়স্বরূপ কোনও প্রকার বেতন গ্রহণ হিন্দুধর্মাবিরুদ্ধ ছিল । তবে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ছাত্রগণ গুরুকে দক্ষিণা দান করিত । গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক ছাত্রগণ বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিত । কেহ

পূর্বক আজীবন নানা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদি অধ্যয়ন করিত ।

সেই অতীত যুগে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, ঈশ্বর-মুভূতিলাভ এবং বেদবিহিত নানাবিধ যাগ-যজ্ঞাদির জ্ঞান-লাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল । বেদাধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-গণকে ছয় প্রকার বেদাঙ্গ শিক্ষা করিতে হইত । এই বেদাঙ্গ শাস্ত্রের অধ্যয়নই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল । প্রথমেই শিক্ষা অর্থাৎ স্বর-বিজ্ঞান পাঠ করিতে হইত । ইহা দ্বারা ছাত্রগণ বেদে ব্যবহৃত শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করিতে পারিত, স্বর-বিজ্ঞান সমাপ্ত করিয়া ছন্দ পাঠ করিতে হইত । বেদের স্তোত্রগুলি নানা ছন্দে লিখিত । স্তোত্রগুলি শুদ্ধভাবে পাঠ করিতে বা গান করিতে হইলে ছন্দ-জ্ঞান থাকা আবশ্যিক । ইউরোপ এবং আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীমণ্ডল সহজে সংস্কৃত শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন না । কারণ সংস্কৃতের উচ্চারণে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য লক্ষিত হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জিহ্বা বিশেষ নমনীয় না হওয়াতে তাঁহারা সেগুলি সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না । কিন্তু হিন্দুগণ ছন্দ, শব্দ, বিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়া থাকেন । সে প্রাচীন যুগে অর্থাৎ খৃষ্টের

নিরুক্তই চতুর্থ অঙ্গ। নিরুক্ত শাস্ত্রে শব্দের অর্থ এবং একই শব্দ কত প্রকার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। ইহার পর কল্প ; কল্প—শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্ম-সূত্র, গৃহ-সূত্র এবং স্মৃতি-সূত্র এই চারি ভাগে বিভক্ত।

শ্রৌতসূত্রে যাগ-যজ্ঞ-বলিদানাদির নিয়মসকল বর্ণিত আছে। ধর্ম্মসূত্রে নাগরিকের কর্তব্য, গৃহসূত্রে গৃহস্থের কর্তব্য এবং স্মৃতিসূত্রে যজ্ঞের বেদী নির্মাণসম্বন্ধে জ্যামিতি বা রেখাবিজ্ঞান ও ক্ষেত্রতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্বশেষে জ্যোতিষ। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াদি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিবার জন্ত জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। জ্যোতিষ অধ্যয়ন না করিলে বেদজ্ঞান অসম্ভব এবং বেদবিহিত যজ্ঞাদিক্রিয়া সম্পাদন অসম্ভব হইত। এই জন্ত বেদে আমরা জ্যোতিষ-বিষয়িণী নানা কথা বা তত্ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই।

এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উচ্চবর্ণের হিন্দুরই ছিল। গুরুগৃহে ছাত্রগণ এইভাবে বিদ্যাভ্যাস করিত এবং গুরু কোনও প্রকার বেতন গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু ইহা ব্যতীত জনসাধারণের জন্ত বিদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থাও ছিল। বিদ্যোৎসাহী রাজা এবং মহারাজা প্রভৃতির সভায় বহু পণ্ডিত থাকিতেন। এই রাজসভাগুলি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল ; সভাপণ্ডিতগণ এই সকল স্থানে বিনা বেতনে শিক্ষাদান

করিতেন। ইহা ব্যতীত দেশের নানা স্থানে পরিষদ ছিল। এই পরিষদ আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরমাত্র। বৈদিক যুগের পর হইতে ব্রাহ্মণ যুগের কাল অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ১২ শত বৎসর পূর্বে রাজগণের সভাগুলি শিক্ষার এক একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। ইহার পর অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ১ হাজার বৎসর পূর্বে ব্রাহ্মণগণ বহু পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষদগুলিকে আধুনিক কলেজের সদৃশ বলা যাইতে পারে। * সাধারণের শিক্ষাগারগুলির প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণই ছিলেন। ছাত্রগণ শিক্ষাগৃহে গুরুগণের সহিত অবস্থান করিতেন, গুরুর গৃহকর্ম্যে বহু প্রকারে সাহায্য করিতেন এবং তাহার পরিবর্তে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা, আহার ও আশ্রয়স্থান পাইতেন। অধ্যাপক যোক্ষ্মলার তাঁহার প্রণীত “History of Sanskrit Literature” অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—“এক একটি পরিষদে একুশ জন করিয়া দর্শন, ধর্মশাস্ত্র এবং ব্যবহারশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক থাকিতেন। কখনও কখনও তিন চারি জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত একত্র হইয়া এক একটি গ্রাম্য পরিষদের সৃষ্টি করিতেন।” উপনিষদে আমরা এই শ্রেণীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ

দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃহদা-
রণ্যক উপনিষদের ২য় ভাগে লিখিত আছে যে, শ্বেত-
কেতু পাঞ্চাল পরিষদে শিক্ষার জন্ত গমন করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত কলেজ বা শিক্ষাকেন্দ্রে বেদ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র,
ফৌজদারী ও দেওয়ানী হিন্দু-ব্যবহারশাস্ত্র, কৃষি, সম্পত্তি,
কুসীদ, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বিভাগ সম্বন্ধীয় বিধিসকল
শিক্ষা দেওয়া হইত। অত্যাধি ইংরাজ-শাসনকালেও
এই সকল বিধি অনুসারে হিন্দুসমাজ শাসিত হইতেছে।
ইংরাজ এই হিন্দু-বিধিগুলির কোনও পরিবর্তনসাধন করিতে
পারেন নাই বা এই হিন্দুবিধির স্থলে কোন প্রকার উচ্চতর
আদর্শের বিধি-ব্যবস্থাও প্রণয়ন ও প্রচলন করিতে পারেন
নাই। ইহা অতিরঞ্জন নহে। যে সকল ছাত্র ব্যবহারশাস্ত্র
অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা রোমীয় এবং যুরোপীয়
ব্যবহারশাস্ত্র বহু বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে
হিন্দু-ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ; নচেৎ তাহাদিগের পাঠ
সমাপ্ত হয় না।

আগি ইতঃপূর্বে আমার প্রথম অভিভাষণে প্রকাশ
করিয়াছি যে, বৌদ্ধযুগের পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব ১৪ শত
বৎসর হইতে খৃঃ-পূঃ ৬ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুগণ ষড়্দর্শন
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু-জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান, সাংখ্য-
বিজ্ঞান, কপিলের ক্রমবিকাশতত্ত্ব, কণাদের বৈশেষিক
দর্শন, চিন্তাবিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান, একেশ্বরবাদমূলক দর্শনসমূহ

এবং বেদান্ত, এ সমস্তই ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত। ছাত্রগণ
 পরিষদে এই সকল বিষয় শিক্ষালাভ করিতেন। অঙ্কশাস্ত্র,
 অর্থাৎ পাটীগণিত, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ত্রিকোণমিতি,
 দশমিক ভগ্নাংশ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের পূর্বে হিন্দু
 ছাত্রগণ শিক্ষা করিতেন। আপনারা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত
 হইবেন যে, এত প্রাচীন যুগেও হিন্দুগণ এই সকল
 বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্বসমূহ আলোচনা করিতেন এবং
 ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল
 কেন্দ্রস্থল ভারতের বৈদিক ধর্ম। বেদোক্ত যজ্ঞবেদী বেদে
 বর্ণিত নিয়ম অনুসারে নির্মাণ করিতে যাইয়াই জ্যামিতি বা
 ক্ষেত্রতত্ত্বের সৃষ্টি হইল। কারণ, কোথায়ও বা বৃত্ত, কোথায়ও
 ত্রিভুজ, কোথায়ও বৃত্তের অভ্যন্তরে ত্রিভুজের অঙ্কন প্রভৃতি
 নানা প্রথায় ক্ষেত্র অঙ্কন করিতে হইত! বৌদ্ধযুগে আর
 যজ্ঞ বা যজ্ঞবেদীর আবশ্যক হইত না; তখন ক্ষেত্র-
 তত্ত্বের কোনও ব্যবহার ছিল না; সে সময় বীজগণিত ক্ষেত্র-
 তত্ত্বের স্থান অধিকার করিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে
 বীজগণিতের যথেষ্ট অনুশীলন হইত এবং বীজগণিতের বিশেষ
 উন্নতিও হইয়াছিল। জ্যোতিষের নানাপ্রকার তত্ত্ব আবি-
 ষ্কারে এবং জ্যামিতির অনেক সমস্যাসমাধান ব্যাপারে
 বীজগণিতের ব্যবহার হিন্দুদিগের বিশেষ প্রতিভার
 পরিচায়ক হইয়াছে কোন সন্দেহ নাই। এ সকল স্থলে

পাশ্চাত্য গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাহাতে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন।” *

ইহা ব্যতীত মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত কেবল যে হিন্দুদিগের প্রাচীন ইতিহাস, তাহা নহে। রামায়ণ ও মহাভারতে হিন্দুর সর্বপ্রকার বিজ্ঞান এবং দর্শনের সারাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের সময় ও বৌদ্ধ যুগের পূর্বে সর্বজাতি ও সর্বশ্রেণীর নর-নারীই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিতেন। যাহাদের বেদপাঠে অধিকার ছিল না, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদের জন্তই লিখিত হইয়াছিল। লিখিত ভাষার আবিষ্কারের বহু পূর্বেই হিন্দুগণ বেদ সকল এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যাহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইলে শত শত গ্রন্থের সৃষ্টি হইত, এত বড় বিরাট ব্যাপার কেবল মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল; পুরুষপুরুষানুক্রমে ইহা এই ভাবে রক্ষিত হইত—ইহা কি সহজ কথা? এই হিন্দুজাতির কি আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তিই না ছিল। এক মহাভারতেই এক লক্ষ সংস্কৃত শ্লোক। যখন আমি ভারতে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি, এক জন ব্রাহ্মণ-মহিলা এই সমগ্র মহাভারতের আত্মত্ব কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। একটি বাক্যও তাহার ভুল হইত না। এখনও অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা একটি শব্দও ভুল না করিয়া, একবারও না দেখিয়া

এক একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ মুখস্থ বলিয়া ধাইতে পারেন। এই সমস্ত বিজ্ঞান ও দর্শন প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল ; কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষের প্রায় ১৫০টি প্রচলিত ভাষায় সংস্কৃত বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুবাদ হইয়াছে। এই সকল পুস্তক পাঠের ফলে ভারতের জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। যাহারা নিরক্ষর, তাহাদিগের শিক্ষার জন্ত প্রায় প্রতি হিন্দুপ্রধান গ্রামেই এই সকল বিষয়ের সভা ও কথকতা হইয়া থাকে। অত্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক পাঠ করিয়া সাধারণের বোধগম্য প্রচলিত ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া সকলকে শিক্ষাদানের প্রথা প্রচলিত আছে। যাহারা লিখিতে বা পড়িতে পারেন না, তাহারা এই প্রকারের কথকতা শুনিয়া থাকেন ; ইহাতেই তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ বা চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। “আয়ু” শব্দের অর্থ জীবন, “বেদ” অর্থে জ্ঞান বা বিজ্ঞান বুঝায় ; অতএব “আয়ুর্বেদ” অর্থে “জীবন-বিজ্ঞান” বুঝিতে হইবে। হিন্দু-ভেষজ-বিজ্ঞান ইহারই অন্তর্গত। হিন্দুর এই ভেষজ-বিজ্ঞান খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্বে রচিত হইয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্মদাতা হিপোক্রেটিসের—(হিপোক্রেটিসের সময় খৃষ্টপূর্ব

কি, বৌদ্ধযুগের পূর্বে এত প্রাচীনকালেও হিন্দুর চিকিৎসা-শাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে রচিত হইয়াছিল এবং চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ও কলেজ ছিল। বৌদ্ধযুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং গবেষণাপূর্ণ অনেক চিকিৎসা-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে চরক ও সুশ্রুতপ্রণীত চিকিৎসাশাস্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দুইখানি গ্রন্থ এতদূর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়াছিল যে, আরবগণ হারুন-উল-রসীদের রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্ট শতাব্দীতে ইহাদিগের অনুবাদ সাদরে গ্রহণ করেন। অতীত চরক ও সুশ্রুত-প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থই হিন্দু-চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম রত্ন বলিয়া পরিগণিত। ইহাতে শরীর-তত্ত্ব, প্রাণি-তত্ত্ব, লক্ষণ দ্বারা রোগনির্ণয়, নানাবিধ রোগের কারণ-নির্ণয় ও চিকিৎসাপ্রণালী অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দগুলি হয় ত আজ অপ্রচলিত, কিন্তু তাঁহাদিগের লিখিত চিকিৎসাপ্রণালী সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত এবং সেই অতীত যুগে অত্র কোনও জাতি চিকিৎসার এতদূর উন্নতিসাধনে সমর্থ হন নাই।

অতি প্রাচীন যুগেও হিন্দুগণ রাসায়নশাস্ত্র অবগত ছিলেন। বহুপ্রকার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করণের জন্য নানাবিধ যৌগিক পদার্থ ভারতে পাওয়া যাইত। পশ্চিম-ভারতে পার্কত্য লবণ পাওয়া যাইত, তিস্ত হইতে সোহাগা আনীত হইত। সোরা এবং

সোরা ও গন্ধকের মিশ্রণে যৌগিক পদার্থ লবণাকার সহজেই প্রস্তুত হইত। কচ্ছ নামক স্থানে ফটুকিরি প্রস্তুত হইত। হিন্দুগণ নিশাদল প্রস্তুত করিতে পারিতেন। চূর্ণ, কয়লা এবং গন্ধকের ব্যবহার স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহাদিগের জানা ছিল। ক্ষার ও অম্লজাতীয় পদার্থগুলির ব্যবহারও তাহারা অবগত ছিলেন। এ সকল পদার্থের ব্যবহার আরবগণ তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। ধাতব পদার্থের রোগনাশক শক্তিও তাঁহাদিগের অবিদিত ছিল না। রসায়ন এবং হরিতাল তাঁহারা ঔষধার্থে ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা—পারদ, হরিতাল এবং অন্যান্য নয়টি ধাতুর রাসায়নিক সংমিশ্রণে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা অক্সাইড্ অফ আয়রন, কপার, লেড, টিন, জিঙ্ক অর্থাৎ লৌহ, তাম্র, সীসক, টিন, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর অম্লজানের ক্রিয়াপ্রভাবে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থসকলের এবং সীসকের ব্যবহার জানিতেন। সালফিউরেট অফ আয়রন, কপার, এন্টিমনি, মারকারি এবং আরসেনিক অর্থাৎ লৌহ, তাম্র, রসায়ন পারদ এবং হরিতালের সহিত গন্ধকের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ তাঁহারা ঔষধার্থে ব্যবহার করিতেন। ইহা ব্যতীত সালফেট অফ কপার (তুঁতিয়া), দস্তা এবং লৌহের ব্যবহারও জানিতেন; ডায়াসিটেট অফ কপার এবং কার্বোনেট অফ লেড এবং

করিতেন ।” * *Essay on Hindu Medicine* নামক গ্রন্থে ডাঃ রয়লি (Dr. Royle) লিখিয়াছেন :—“প্রাচীন গ্রীক ও রোমানগণ ধাতব ঔষধগুলির বাহ্য প্রয়োগ করিতে জানিলেও সাধারণের বিশ্বাস যে, আরবগণই সর্বপ্রথম এই সকল ধাতব পদার্থ ঔষধরূপে পানের ব্যবস্থা করেন ।...কিন্তু আমরা চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, ইহারা বহুপ্রকার ধাতব ঔষধের পান ও গ্রহণ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহাও প্রমাণিত সত্য যে, আরবগণ চরক ও সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থের অনেক বিষয় অবগত হইয়াছিলেন ।” †

আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে, মহাবীর সেকেন্দর রোগের চিকিৎসার জন্ত কয়েকজন হিন্দু চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কারণ তাঁহার গ্রীক চিকিৎসকগণ সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা সম্যক্রূপে অবগত ছিলেন না । খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান বাদশাহ হারুণ-অল্ রাসিদ তাঁহার রাজসভায় দুই জন হিন্দু চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন । খৃষ্টপূর্ব ২৬০ সালে বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক পুরুষ, স্ত্রী, শিশু এবং পশুগণের চিকিৎসার জন্ত দেশের নানাস্থানে বহু সাধারণ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন ।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মেগাস্থিনিন্স মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের

*Civilisation on ancient India. Vol. II. p. 254.

† Royle, p. 45.

রাজসভায় বহু দিন অবস্থান করিয়া অবশেষে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান যে, তিনি সে সময় বিভিন্ন জাতির শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক স্কুলের প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ জাতির জন্য যে সকল স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণ বালকগণকে যাজকতা ও শিক্ষকতা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। ক্ষত্রিয়গণের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ক্ষত্রিয় বালকগণ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ব্যবসায়ী শ্রেণীর বালকগণ পৃথক বিদ্যালয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য শিক্ষা করিতেন। সর্বাপেক্ষা নীচ শ্রেণীর বালকগণের জন্য যে বিদ্যালয় নির্দিষ্ট ছিল, তাহাতে বালকগণ নানাপ্রকার শ্রমজীবির কার্য শিক্ষা করিত।

বৌদ্ধযুগে অর্থাৎ মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের পূর্বে হিন্দুগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চায় অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষী ভারতের নিউটন আর্থাভট্ট বীজগণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার অভ্যুত্থান কাল খৃষ্টীয় ৪৭৬ সাল। পৃথিবী স্থায়ী অক্ষের উপর আবর্তিত হইতেছে, এ সত্য সর্বপ্রথম ইনিই প্রকাশ করিয়াছিলেন। জনৈক ইহুদী লেখক বলেন, —“পৃথিবী যে গোলাকার এবং স্থায়ী অক্ষের উপর আবর্তিত হইতেছে, এ অমরকীর্তি কোপারনিকাসের নির্ণয়ের

ইহা আবিষ্কার করেন।” * সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ ইনিই প্রথম নির্ণয় করেন, এবং মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে সমস্ত পদার্থই যে কেন্দ্রাতিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে, এ তথ্যও এই হিন্দুজ্যোতির্বিদদের আবিষ্কৃত। ইনিই পৃথিবীর পরিধির পরিমাণ সর্বপ্রথমে নির্ণয় করিয়াছিলেন। ইহার পর প্রসিদ্ধ হিন্দুজ্যোতির্বিদ বরাহমিহির (খৃষ্টীয় ৫০০—৫৮৭) তাঁহার “বৃহৎ সংহিতা” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই বৃহৎ অপূর্ব গ্রন্থখানিতে বহু প্রাকৃতিক তত্ত্ব অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুপ্ত হিন্দু জ্যোতির্বিদগণের অন্যতম। ইহার অভ্যুত্থান কাল খৃষ্টীয় ৬২৮ সাল। ইনি স্বীয় প্রণীত জ্যোতিষ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে গ্রহ ও উপগ্রহগণের স্থান নির্দেশ এবং চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ইনি গোলাখ্যান বা বস্তুলবিজ্ঞা সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অত্যাঁপি বারাণসী এবং অন্যান্য স্থানে হিন্দু মানমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হিন্দু-সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চার চরম উৎকর্ষের দিন বলিয়া খ্যাত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তখন হিন্দুসম্রাট ছিলেন। রোমীয়গণের মধ্যে যেমন আগষ্টাস, ইংরাজগণের মধ্যে এলফ্রেড, ফরাসীগণের মধ্যে চার্ল-ম্যাগ্নি, বৌদ্ধগণের মধ্যে মহারাজ অশোক, মুসলমানগণের মধ্যে বাদশাহ হারুণ-উল-রসিদ, হিন্দুগণের মধ্যে মহারাজ

*Jewish Encyclopedia, Vol. XII, p. 689.

বিক্রমাদিত্য তেমনই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি
 বিদ্যোৎসাহী নরপতিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বিদ্যা ও শিক্ষা-
 বিস্তারে তাঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। কি পণ্ডিত, কি
 মূর্খ, কি কবি, কি উপাখ্যান-কথক বা নাট্যকার,
 ঔপন্যাসিক, জ্যোতির্বিদ, শব্দকোষ-লেখক কিম্বা ঐতিহাসিক,
 যিনিই ইউন না কেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নাম ভারতের
 আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। বিজ্ঞান,
 নাটক, কাব্য বা সাধারণ শিক্ষার উৎসাহদাতা আধুনিক
 ইউরোপের যে কোন সম্রাটের সহিত হিন্দু-সম্রাট বিক্রমা-
 দিত্যের তুলনা হইতে পারে। তাঁহার রাজসভা নবরত্ন-
 সমন্বিত ছিল ; হিন্দু-নাটককার মহাকবি কালিদাস এই নব-
 রত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপীয়রের
 স্থায় হিন্দু মহাকবি কালিদাস বিশ্ববিখ্যাত। বস্তুতঃই
 তাঁহাকে ভারতের সেক্সপীয়র বলা হইয়া থাকে। তাঁহার
 সর্বোৎকৃষ্ট নাটক “শকুন্তলা” আধুনিক ইউরোপের একাধিক
 ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ; এবং অগাষ্টাস্ উইলিয়ম্ ভন্
 সেগেল্, আলেকজেন্দার ভন্ হামবোর্ট এবং গেটে প্রমুখ
 মনীষীসকল মহাকবি কালিদাস প্রণীত এই “শকুন্তলা”কে
 জগতের শ্রেষ্ঠ নাটক-শ্রেণীর অন্ততম বলিয়া নির্দেশ করিয়া-
 ছেন। জার্মান পণ্ডিত মহাকবি গেটে শকুন্তলা সম্বন্ধে
 লিখিয়াছেন :—“অগ্নি শকুন্তলে, যদি তোমাকে মনুষ্য যৌব-

বলিয়া সম্বোধন করি ; যাহাতে আত্মার তৃপ্তি, আত্মার সন্তোষ, আত্মার হর্ষোৎপত্তি হয়, যদি তাহাই বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করি ; যদি একই মধুনয় নাম স্বর্গ ও মর্ত্যের যাবতীয় সুখকর পদার্থের সংজ্ঞা স্বরূপ হয় ও সে নামে তোমাকে সম্বোধন করিতে পারি, তাহা হইলেই মনে হয় তোমার সম্বন্ধে বুঝি সকল কথা বলা হইল ; নচেৎ তোমার গুণকীর্তন ভাষায় সম্ভব নহে ।”

আপনারা বোধ হয় মহাকবি কালিদাসপ্রণীত “শকুন্তলা”, “বিক্রমোর্বশী” এবং অন্যান্য নাটক ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-সমূহ সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত আছেন । তাঁহার প্রণীত “মেঘদূত” ইংরাজ-কবি সেক্সপীয়র কিম্বা শেলির প্রণীত শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এ কথা বাদ দিলেও তুমি বলিয়া গণ্য হইতে পারে । জনৈক সমালোচক বলেন :—“ইংরাজ-কবি ওয়া-র্ডসওয়ার্থের গ্রাম্য তিনিও প্রকৃতিকে প্রেমের চক্ষে দেখিতেন এবং অন্য কোনও হিন্দু-কবি প্রাকৃতিক তত্ত্বসম্বন্ধে তাঁহার গ্রাম্য বহুদূরী ছিলেন না ।” মহাকবি কালিদাসের পর ভারবি, দামিনী, বাণভট্ট, সুবন্ধু, ভর্তৃহরি ও ভবভূতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই সকল হিন্দু-কবি ও নাট্যকারগণের সকলেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন । ইঁহাদিগের লিখিত কাব্য-গ্রন্থগুলি ১২০০ বৎসর পূর্বের গ্রাম্য অত্যাপি সংস্কৃত কলেজগুলিতে অধীত হইয়া থাকে ।

পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশের * উপকথাগুলিই ঈশপের এবং পিল্লের উপকথার ভিত্তি-স্বরূপ। এগুলি অতীত ভারতের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রগণের পাঠ্য। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঐ উপকথাগুলি লিখিত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ভাষায় উহাদের অনুবাদ হইয়াছে। “বাদশা নওশারোয়ানের রাজত্বকালে (খৃষ্টীয় ৫৩১—৫৭২) পারস্য ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয়। পারস্য ভাষা হইতে আরবী ভাষায় এবং আরবী ভাষা হইতে অনুমান খৃষ্টীয় ১০৮০ সালে সাইমিয়ন্ শেঠ (Symeon Seth) কর্তৃক গ্রীক ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। অনুমান ১২৫১ সালে আরবী হইতে স্পেনদেশীয় ভাষায় পঞ্চতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।” ইহা ব্যতীত হিন্দুর “পুরাণ,”—সেগুলি একত্র করিলে পঞ্চতন্ত্রের প্রমাণ হয়। এই পুরাণ-গুলি সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন হিন্দু-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পাঠ্য ছিল, অতীত সেইরূপ আছে।

বৌদ্ধ-যুগের পূর্বে এবং মধ্যযুগে হিন্দুদিগের সভ্যতা,

* The fables of Hitopadesha have been translated by Sir Edwin Arnold under the name of “The Book of Good Counsels.”

† Civilization in Ancient India. Vol. II.

তঁাহাদিগের শিক্ষা কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, ইহা হইতেই
 আপনারা তাহা অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন এবং ভারতে
 ইংরাজগণের আগমনের পূর্বে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল,
 তাহাও বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুজাতি কত বার বিভ্রান্ত—
 নির্যাতিত হইয়াছে, হিন্দুর জাতীয় জীবনে কতবার কত
 বিপত্তি আসিয়াছে, কত বার হিন্দু-ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়াছে,
 তাহার ইয়ত্তা নাই। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারত
 মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়; প্রায় ছয় শত বৎসর
 ভারতে মুসলমানগণ রাজত্ব করেন; এই দীর্ঘকালের
 মধ্যে হিন্দুগণ প্রায় কোনও প্রকার বিজ্ঞান-চর্চার
 অবসর পান নাই; সুতরাং এ বিষয়ে কোনও প্রকার
 উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। আক্রমণকারীদিগের
 হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুগণকে বহুবার
 যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। এ সময় তঁাহাদিগকে রাজনীতির
 চর্চায় অবহিত হইতে হইয়াছিল; সুতরাং বিজ্ঞানচর্চায়
 মনোযোগ দিবার অবসর তঁাহারা পান নাই। উপরন্তু
 মুসলমানগণ মুক্ত তরবারি হস্তে, কখন বা অগ্নিপ্রয়োগ
 দ্বারা হিন্দু শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরবময় নিদর্শন সকল ধ্বংস
 করিয়া ফেলিয়াছেন। মুসলমান সম্রাটগণ কোরাণপাঠ
 ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার গ্রন্থপাঠ বা বিদ্যাচর্চার প্রশ্রয়
 দেন নাই, এই উদ্দেশ্যে সাধারণের জন্য মসজিদে কোরাণ-
 পাঠের ব্যবস্থাও ছিল। কেহ কেহ বলেন, মোগল-সম্রাট্

আওরঙ্গজেব সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের প্রধান প্রধান নগর-
গুলিতে বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরে স্কুল স্থাপন
করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রকার
ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা এক্ষণে বিশেষ দুষ্কর। সাধা-
রণতঃ মুসলমানগণের ধারণা—সর্বপ্রকার সাহিত্য এবং
বিজ্ঞানের সার-সংগ্রহ করিয়া কোরাণ রচিত হইয়াছে। সুতরাং
কোরাণ ভিন্ন অপর কোনও গ্রন্থ পাঠের আবশ্যকতাই নাই।
যদি জগতের বাহ্য কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমুদায়ই একমাত্র
কোরাণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় তবে অন্য পুস্তক পাঠে
প্রয়োজনই বা কি? এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা
হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রগুলির ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন; এই জন্যই
হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে কোনও পুস্তক তাঁহাদিগের
হস্তগত হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু
হিন্দুর জাতিভেদমূলক একটা কুসংস্কার বশতঃ ব্রাহ্মণগণ
মুসলমানদিগের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছিলেন; এই জন্যই
হিন্দুর পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ধর্মোন্মত্ত মুসলমানগণের ধ্বংস-
কারী হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কুসংস্কারাপন্ন জাতিভেদ
প্রথার ইহা একটি শ্রেষ্ঠ দান।

পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য মুসলমানগণ বহু
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু হিন্দু বালকও
মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত এই সকল স্কুলে ঐ সকল ভাষা শিক্ষা

বিদ্যেবতাব ছিল না। ইহা ব্যতীত মুসলমানের প্রতিষ্ঠিত বহু উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ও ছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে অলঙ্কার, তায়, ব্যবহারশাস্ত্র, মুসলমানধর্ম-সম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কাণ্ড ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ছাত্রগণকে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা হইত। এ সকল স্কুলে কিন্তু হিন্দু ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। হিন্দু ছাত্রগণ আরবী ভাষা কিংবা এই সকল উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভকালেও এই সকল উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে কেবল মুসলমান ছাত্রগণই ইউক্লিডের জ্যামিতি, টলেমির জ্যোতিষ প্রভৃতি প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেন।

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তক ও প্রথম পথপ্রদর্শক খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন ওলন্দাজ খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক দক্ষিণ-ভারতে ত্রাঙ্কুবর নামক স্থানে পদা-র্পণ করেন ও সঙ্গে সঙ্গেই বাইবেল প্রচার জন্য স্থানীয় প্রচ-লিত ভাষাগুলি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা এই প্রচারকার্যের জন্য কতকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ; তবে বিদ্যালিক্ষা হিসাবে ঐগুলির উপকারিতা অতি অল্পই ছিল ; কেন না, ছাত্রগণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় ধর্মপ্রচার সভা ভারতে প্রথম খৃষ্টীয় ধর্মজ্ঞানের উন্নতি ও প্রচার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় উনবিংশ

শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই সমিতি বিশেষ কোনও উন্নতি করিতে পারেন নাই । ইহার পর তৃতীয় বার বঙ্গদেশে ইংল-
ণ্ডীয় ধর্মপ্রচারকগণের এক সভা স্থাপিত হয় । এই উপলক্ষে
কেরি (Carey) এবং মার্সম্যান (Marshman) প্রভৃতি
কয়েক জন প্রতিভাসম্পন্ন খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক বঙ্গদেশে আগমন
করেন । ইঁহারা প্রচলিত ভাষা শিক্ষা করিয়া বাইবেলের
শিক্ষা ও প্রচার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ।

ভারতীয়গণকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-
নীর কর্তৃপক্ষগণের ইতস্ততঃ ভাব ছিল । ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের
রাজমন্ত্রী উলবারফোস কোম্পানীর ঐ খৃষ্টাব্দের সনন্দপত্রে
ভারতবাসীর ইংরাজী শিক্ষার জন্য তথায় ইংরাজী শিক্ষক
প্রেরণের এক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে
ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ তাহাতে বিশেষ আপত্তি
উত্থাপন করিয়াছিলেন । “সে সময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর
ডিরেক্টরগণের মধ্যে এক জন বলিয়াছিলেন—নির্বুদ্ধিতা
বশতঃ আমেরিকায় স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা করায় আমেরিকা
আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, ভারতবর্ষে সেই নির্বুদ্ধিতার
পুনরাবৃত্তি করিতে আমরা চাই না । যদি ভারতবাসীর শিক্ষা-
লাভের এতটা আগ্রহই থাকে, তবে তাহারা সে জন্য ইংলণ্ডে
আসিতে পারে ।” * আধুনিক ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তারকল্পে

ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার গূঢ় অস্তঃস্থলে এই নীতিই অত্যাধিক বর্তমান। ইষ্টে-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের সেই নীতি বা সেইরূপ একটা ভীতি এতদিনে দৃশ্যতঃ অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু ইংলণ্ড, ইউরোপ ও আমেরিকার ছাত্র-গণকে যে ভাবের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে, তেমন শিক্ষা প্রদানে এখনও ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণ যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন ; ইহাদের বিশ্বাস, তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। এই প্রকার ভীতিবশতঃই ইংরাজ রাজত্বকালের ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলিকাতায় মুসলমানগণের শিক্ষার জন্ত ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একটি মাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কালীধামে হিন্দুদিগের শিক্ষার জন্ত একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। ভারতের ইংরাজ বিচারকগণকে বিচারকার্যে সহায়তা করিবে, এরূপ হিন্দু ও মুসলমান এই উভয়বিধ আইনজ্ঞ লোককে শিক্ষিত করাই এই দুইটি কলেজ-স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইহার পর হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারকল্পে পরাজুখ ছিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহাসভা সর্বপ্রথম ভারতের রাজস্ব হইতে ১০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০,০০০ টাকা বঙ্গ,

বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিন প্রদেশের অধিবাসিগণের শিক্ষার্থে ব্যয় করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী দশ বৎসরকাল অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অনুমতি অনুসারে কোন কার্যই করা হয় নাই। * ইতঃমধ্যে বিশ্ববিশ্রুত স্বনামধন্য হিন্দু-সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে হিন্দুগণ স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের মধ্যে রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম স্বীয় উত্তম ও অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। সে সময় ভারতবর্ষে ইংরাজীশিক্ষার জ্ঞাত কোনও স্কুল-কলেজ ছিল না। ভারতবাসিগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বিলাত যান; সেখানেই ইঁহার মৃত্যু হয়। ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নামক সহরে অद्याপি ইঁহার সমাধি বিদ্যমান। সেই সময়েই কলিকাতায় ডেভিড হেয়ার নামক এক জন নিরক্ষর ইংরাজ ছিলেন। তিনি ঘড়ি মেরামত ও প্রস্তুতাদি করিতেন। তিনি অদ্ভুতকর্মী ও অসাধারণ উদ্যমশালী পুরুষ ছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই সঙ্কল্পানুসারে কার্যারম্ভ হইল; এই উদ্যমশীল ডেভিড্ হেয়ার এই মর্মে কতকগুলি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া বিলি করিতে

লাগিলেন। প্রথমতঃ, কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজকর্মচারী এবং কতিপয় প্রভাবশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তির সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় একটি স্কুল স্থাপন করেন। ইহাই বর্তমানে হেয়ার-স্কুল নামে খ্যাত। এই স্কুলটিই বঙ্গদেশে উল্লেখযোগ্য প্রথম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। ভারতে ইংরাজ রাজপুরুষগণ কর্তৃক ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের কোনরূপ অনুষ্ঠানের পূর্বে কেবল হিন্দুদিগের উত্তম ও চেষ্টার ফলেই এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল।*

১৮২০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গদেশের হিন্দু অধিবাসিগণের শিক্ষার জন্য এ দেশীয় উপযোগী কি প্রকার শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হইতে পারে, এই বিষয় নির্ণয়করণার্থ ভারত গবর্ণমেন্ট একটি তদন্ত-কমিটী নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুই বৎসর যাবৎ কিছুই করা হইল না। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশের গবর্ণর সার টমাস্ মন্রো সাহিত্য ও শিল্পের অবনতি এবং মাদ্রাজবাসীর গভীর অজ্ঞতায় ব্যথিত হইয়া একটি তদন্ত-কমিটীর সৃষ্টি করেন; এই কমিটী অনুসন্ধান করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, প্রাচীন হিন্দুপ্রথানুসারে কেবল এক মাদ্রাজ প্রদেশেই এক কোটি বিশ লক্ষ নরনারীর মধ্যে শিক্ষার জন্য ১২,৪৯৮টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

*Vide Rev. Alexander Duff's Evidence, Lords' Report, 1853.

ছিল। তিনি এই বিষয়ে কোর্ট অফ ডিরেক্টরগণের নিকট নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রেরণ করেন ; ইহা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল :—“আমার মনে হয়, সমগ্র অধিবাসিগণের এক-চতুর্থাংশ হইতে অধিক, এবং বালিতে পারা যায়, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিক্ষার অবস্থা তেমন উন্নত না হইলেও আমাদের দেশের তুলনায় এবং কিছু দিন পূর্বে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে শিক্ষার যে অবস্থা ছিল, তাহার তুলনায় এই অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত ভাল, ইহা বলিতেই হইবে।” *

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএর গভর্নর লর্ড এলফিনষ্টোন তদন্তের কালে অবগত হন যে, এক বোম্বাই প্রদেশেই হিন্দুদিগের ১৭০৫টি স্কুল ও কলেজ ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলফিনষ্টোন জানিতে পারেন যে, বঙ্গের ন্যায় কোটি অধিবাসীর বিদ্যাশিক্ষার জন্য বঙ্গদেশে ৩৩৫৫টি হিন্দু-প্রতিষ্ঠিত স্কুল ছিল। হিন্দুগণ জ্ঞান, বিদ্যা ও সভ্যতার কতটা আদর করিতেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া পাঠশালা থাকিত ; এই সকল পাঠশালায় গ্রামের বালকগণ পঠন, লিখন, গণিত এবং পরিমিতির প্রাথমিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিত। এগুলিকে পাঠশালা বলা হইত। এই সকল পাঠশালা ব্যতীত পূর্ব-কথিত পরিষদগুলির দ্বারা বহু কলেজও ছিল। এই সকল

কলেজে ব্যাকরণ, গণিত, অলঙ্কার, কাব্য, জ্যোতিষ এবং বিজ্ঞান ও দর্শনাদি সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত। এই সকল কলেজের সংখ্যা উল্লিখিত পাঠশালার এক-তৃতীয়াংশ ছিল।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাধারণের শিক্ষার জন্ত একটি কমিটির সৃষ্টি করেন এবং ইহার দশ বৎসর পূর্বে পালার্মেন্টে মহাসভা ভারতে শিক্ষার বিস্তারকল্পে যে ১০ হাজার-পাউণ্ড ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন, সেই অর্থ ব্যয় করিয়া কোম্পানী কলিকাতায় 'হিন্দু-কলেজ' নামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়, প্রাচ্য শিক্ষার জন্ত অপর ছয়টি কলেজ এবং বঙ্গ-দেশ ও রাজপুতনায় কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কমিটি প্রাচ্যদেশীয় পুস্তক প্রকাশেও মনোযোগী হন এবং তদনুযায়ী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮২৩ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার সৌকার্যার্থ প্রধান প্রধান কলেজগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার জন্ত কতকগুলি শ্রেণী খুলিয়া দেওয়া ভিন্ন উল্লেখযোগ্য তেমন বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড় লর্ড বেটিন্স সাধারণ শিক্ষাবিভাগীয় কমিটির কলেবরবৃদ্ধি করিয়া ম্যাকলে সাহেবকে তাহার সভাপতি নিযুক্ত করেন। কলিকাতার সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও রসময় দত্ত সে সময়কার এই দুই জন খ্যাতনামা

হিন্দু এবং বঙ্গের মুসলমান নবাব তাকাওয়ার জঙ্গ ঐ কমি-
টির সভ্যপদে নিযুক্ত হন। ম্যাকলে সাহেবের আনুকূল্য
ও সহায়তায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ
তারিখের সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্য স্থাপন করেন। এই মন্তব্যানু-
সারে ইংরাজী ভাষা দ্বারা ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইবে,
ইহাই স্থিরীকৃত হয়। সে মন্তব্যগুলি যথা :—

(১) ভারতে যুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার
সম্যক উন্নতিসাধন করাই সরকারের শিক্ষাপদ্ধতির মুখ্য
উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

(২) অতঃপর আর কাহাকেও বৃত্তি দেওয়া হইবে
না, তবে বর্তমানে যে সকল বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, যত
দিন তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা ভারতীয়গণ প্রদর্শন
করিবেন, ততদিন তাহা প্রচলিত থাকিবে—রদ করা
হইবে না।

(৩) প্রাচ্যদেশীয় পুস্তকাদির মুদ্রণকার্য বন্ধ করিয়া
দেওয়া হইবে ; ইহাতে যে অর্থ উদ্ভূত হইবে, তাহা হইতে
ইংরাজী ভাষার সাহায্যে যুরোপীয় বিদ্যালোচনার ব্যবস্থা
করা হইবে।

মাদ্রাজে এই সময়ে পাচিয়াপা নামক জনৈক হিন্দু প্রায়
৮০ হাজার পাউণ্ড ধর্মার্থে দান করেন। মাদ্রাজের হিন্দুগণ
ঐ অর্থের অংশ গ্রহণ পূর্বক ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে অধুনা
পরিচিষ্ট পাচিয়াপা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাজে

এই কলেজ পূর্বের ত্যায় অত্যাধিক ইংরাজী শিক্ষার জন্য সর্ব-
শ্রেষ্ঠ কলেজ বলিয়া পরিগণিত ; ইহাই মাদ্রাজের সর্বপ্রথম
কলেজ । ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ স্কচ্ কার্কের
জেনারেল এসেমব্লির ধর্মপ্রচারকস্বরূপ কলিকাতায় আগমন
করেন এবং একটি স্কুল স্থাপন করেন । প্রথমতঃ এই
স্কুলটি ভালই চলিয়াছিল । কিন্তু ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্মে
দীক্ষিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ; তদনুযায়ী কয়েক জন
ছাত্রকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য সম্মত করাইলে পর
সমগ্র হিন্দু-সমাজ মিশনারী স্কুলের উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতির
তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তৎকালে ছাত্রগণকে সে সকল
স্কুলে পাঠাইতে বিরত হন । এ দেশে অবস্থানকালে
আলেকজান্ডার ডাফ তাঁহার স্কুলের ছাত্রগণের মধ্য হইতে
কেবলমাত্র চল্লিশ জনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে
সমর্থ হইয়াছিলেন । এই ধর্মাস্তর গ্রহণের ফলে কলিকাতায়
প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল । এই সময় হিন্দুগণ টমাস পেন
প্রণীত (Thomas Paine's) 'যুক্তি-তর্কের যুগ' (Age
of Reason) নামক গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করেন । এই পুস্তকের
প্রভাব দাবানলের ত্যায় ছাত্র ও স্মৃধী সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া
পড়িল । ডাফ সাহেব যখন দেখিলেন, এই পুস্তক হিন্দু-
গণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার পথে বিশেষ অন্তরায়স্বরূপ
হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তিনি বাজারে যত পুস্তক ছিল, সব-
গুলি ক্রয় করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে স্তূপীকৃত করিয়া ভস্মসাৎ

করিলেন। কিন্তু হিন্দুগণ পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণ করিয়া আপনাদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কলিকাতায় হিন্দুসমাজের চক্ষু উন্মীলিত হইল। তখন তাঁহারা হিন্দুবালকগণের ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিতে বন্ধপরিকর হইলেন। ইঁহা-দিগের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ কার্যে অগ্রণী ছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র সরকারী সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে কলিকাতায় মেট্রপলিটন স্কুল স্থাপন করিলেন। অত্যাপি এই মেট্রপলিটন কলেজ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কলেজগুলির অন্যতম। ইহার প্রভাব অসীম এবং ইহার বিধিব্যবস্থাও চমৎকার। ঈশ্বরচন্দ্র প্রাতিষ্ঠিত এই কলেজ কেবল হিন্দুগণের ভদ্রাবধানেই চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার অধ্যাপকগণের সকলেই হিন্দু। শত সহস্র ছাত্র এই কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া থাকে এবং ভারতীয় অধ্যাপকের অধ্যাপনায় তাহারা প্রতিবৎসর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিতেছে।

ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার পূর্বে যাহাতে ছাত্রগণ প্রচলিত ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলায় এক শত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের সুপ্রসিদ্ধ

মধ্য হইতে রাজকর্মচারী নির্বাচিত হইতে পারে, তজ্জন্ম তিনি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। সরকারী পদলাভের প্রবল প্রেরণায় উৎসাহান্বিত হইয়া বঙ্গবাসিগণ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে নূতন নূতন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিলেন। সর্ব-জাতি ও সর্বশ্রেণীর মধ্যেই ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকল্পে একটা তীব্র উৎসাহ ও অমুরাগ আত্মপ্রকাশ করিল। ইহাতে কোনও জাতিবিচার পরিলক্ষিত হয় নাই। সর্বজাতি ও সর্বশ্রেণীর মধ্য হইতেই ছাত্রগণ দলে দলে আসিয়া স্কুল-কলেজে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের জন্ম দেশের সর্বত্র ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কেবল-মাত্র তিন দিনের মধ্যেই ১ হাজার ২ শত ছাত্রের নাম কলেজের তালিকাভুক্ত হইল। ঐ সঙ্গে একটি স্কুলও স্থাপিত হইল; অবিলম্বে স্কুলটিও ছাত্রপূর্ণ হইয়া গেল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল, ৫১টি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সে-গুলিতে ৮ হাজার ২ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ৫ হাজার ১ শত ৩২ জন ইংরাজী, ৪ শত ২৬ জন সংস্কৃত, ৫ শত ৭২ জন আরবী এবং ৭ শত ৬ জন পারসী ভাষা শিক্ষায় রত ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যান্ড প্রাচ্য শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকারী তহবিল হইতে ২৫ হাজার টাকা (প্রায় ৮ হাজার ডলার) মঞ্জুর করেন; ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে

যুক্তপ্রদেশের গবর্নর টমাসন সাহেব ভারতের চিরচলিত হিন্দুদিগের গ্রাম্য স্কুলসমূহের উন্নতির জন্ত এক নূতন নিয়ম অবলম্বন করেন। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে :—(১) কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রস্থানীয় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। গ্রামগুলি এই কেন্দ্রস্থ বিদ্যালয় হইতে অর্ধক্রোশের অধিক দূর হইবে না। (২) প্রত্যেক মহকুমার সদরে একটি করিয়া মধ্য-শ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হইবে। (৩) প্রত্যেক জিলা সদরে একটি করিয়া উচ্চ শ্রেণীর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। ডাইরেক্টরগণ এ ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া এই ভাবে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নিয়মানুসারে কার্য্যারম্ভ হইল এবং চারি বৎসরের মধ্যে সমস্ত যুক্তপ্রদেশে আটটি উচ্চ শ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হইল। এই সকল সরকারী স্কুলগুলি অবৈতনিক ছিল না। এ নিমিত্ত এই গুলির রক্ষার জন্ত প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে এক টাকা হইতে বার টাকা পর্য্যন্ত বেতনস্বরূপ গ্রহণ করা হইত। বে-সরকারী স্কুলগুলির বেতনের হার অপেক্ষা সরকারী স্কুলের বেতনের হার অধিক ছিল।

মিশনারীগণের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির অধিকাংশই প্রাথমিক বা আইয়ারী শ্রেণীর ছিল ; ইহাদের মধ্যে তিনটি বা চারিটি স্কুলে মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষা প্রদত্ত হইত। কতকগুলি আবার অবৈতনিক ছিল : এগুলিতে দরিদ্র ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ

করিত। এ পর্যন্ত সরকার বালিকাগণের শিক্ষার জন্ত কোন প্রকার অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। সরকার পক্ষ হইতে এ বিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টাই করা হয় নাই। এ দিকে মিশনারীগণ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকবালিকাদিগকে খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হিন্দু-বালিকাগণের পূর্বপুরুষের ধর্মের নিন্দা ও ত্রুটি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বালকগণের জন্ত স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা যে ভাবে বালকগণের হৃদয়ে যাহা কিছু হিন্দুসমাজ ও ধর্মপ্রসূত অথবা যাহা কিছুর হিন্দু-সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে কোনও সংস্রব ছিল, তাহারই অযথা নিন্দা করিয়া হিন্দুধর্মের প্রতি একটা বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিলেন। বালিকাবিদ্যালয় সমূহেও তদনুরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্তিত হইল। মিশনারীপ্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর ইহা একটি প্রধানতম ত্রুটি। বাহাই খৃষ্টধর্মের অনুকূল নহে, খৃষ্টীয় আদর্শের বিরুদ্ধ এবং সে মাপকাঠির গণ্ডী-বহির্ভূত, তাহাই তাঁহারা নিন্দনীয় বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অত্যন্ত সক্ষীর্ণ মন অল্প ধর্মের সত্য ও তত্ত্বগুলির মাহাত্ম্যদর্শনে নিতান্তই বাতস্পৃহ। তাঁহারা হিন্দুধর্মকে ধর্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; হিন্দুর পরি-জ্ঞাতা মহাপুরুষগণকে তাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া অস্বীকার করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, হিন্দুর আত্মা অনন্ত নরকের পথে অগ্রসর হইতেছে; তাঁহারা এই নিরয়গামী আত্মার

উদ্ধারকল্পে এত উদ্বিগ্ন। জনৈক আমেরিকান মিশনারী অখুষ্ঠানদিগের জন্য স্থাপিত মিশনারী স্কুল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—“অখুষ্ঠান সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলামিশা ও তাহার উপর প্রভাববিস্তার করিবার জন্যই এই সকল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।……এই সকল স্কুল ভারত-বর্ষে খৃষ্টধর্মের বীজস্বরূপ। এই সকল স্কুল অনুকূল ও প্রীতিজনক ভাবের ভিতর দিয়া অসংখ্য অল্পবয়স্ক বালকবালিকার নিকট যীশুর মাহাত্ম্য ও তাঁহার যুক্তিপ্রদায়িনী অমর বাণী প্রচার করিবার বেশ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে!……আমি নির্ভয়ে এ কথা বলিতে পারি যে, এই সকল স্কুলের সাহায্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও খৃষ্টধর্মে দীক্ষাকার্য্য বেরূপ সহজ হইয়াছে, অন্য কোন প্রকারে ততটা সহজ হইতে পারে না।” ইহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, ধর্মোন্মত্ত এবং ধর্ম্মান্ন এই খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ কি প্রকার বস্তু। ইহারাই দক্ষিণ, নিরক্ষর ভারতবাসীর সমুদানসমুত্তিগণকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের ভান করিয়া থাকেন। হতভাগ্য হিন্দু বালক-বালিকাগণ এই স্কুলে শিক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা প্রকৃত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া কতকগুলি কুসংস্কারপূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অসত্য ধর্ম্মমত দ্বারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখে এবং বাধ্য হইয়া পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সংসর্গ এবং স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই

কিসের জন্ত এই হিন্দু বালকবালিকা হিন্দুর অবতার ও পরিত্রাতাগণের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সেমিটিক জাতির বিশেষতঃ ইহুদী জাতির পরগণারের আরাধনায় অবহিত হইবে ! কি জন্ত হিন্দুগণ তাঁহাদের আর্য্যবংশীয় পূর্বপুরুষগণের প্রাচীন রীতিনীতি এবং সনাতন ধর্ম্য পরিতাগ করিবেন ? কি কারণে তাঁহারা আর্য্যবংশীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার আশ্রয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তৎপরিবর্তে ইহুদীবংশীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার আশ্রয়ে চরিতার্থ বোধ করিবেন ? তাঁহাদের উচ্চ শ্রেণীর দর্শন, ধর্ম্ম বা যীশুর জায় পবিত্রাতা কখনও ছিলেন না, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আনন্দের সহিত যীশুর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুগণ তাহা করিবেন কেন ? তাঁহাদের ত কোনও দিন তেমন হীন অবস্থা নহে ! তাঁহাদিগের পরিত্রাতা ধর্ম্মোপদেষ্টার অভাব কি ? কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ হিন্দুদের মতে ইহাদের প্রত্যেকেই যে নেজারেথের পরিত্রাতা যীশুর সমকক্ষ । তবে আর কেন ? হিন্দুর নিকট খৃষ্ট-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার পূর্বে খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচারকগণ ইহুদীগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন ।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের পরমায়ু-রুদ্ধি হইল । সেই সঙ্গে লর্ড সভায় একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্তৃপক্ষ ভারতের শাসনকার্য্যে সমরোপযোগী পরি-বর্তন প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । অন্ত্যান্ত

বিষয়ের মধ্যে কমিটিতে ভারতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থারও আলোচনা চলিতে লাগিল। সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কমিটি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এই মন্তব্য ভারতে শিক্ষাসম্বন্ধে অতি মূল্যবান বস্তু। অত্যাপি ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা এই মন্তব্য অনুসারেই চলিতেছে। কমিটি ভারতে উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তনের ও ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের তিনটি প্রধান নগর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অমুকূলেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থা দ্বারা ভারতে শিক্ষার বিস্তৃতি সাধিত হয়। নিম্নলিখিত সংস্কার ইহার অঙ্গীভূত বিষয় ছিল ;—“(১) শিক্ষার বিস্তৃতি-সাধন ও তত্ত্বাবধান জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করিতে হইবে। (২) প্রেসিডেন্সী সহরগুলিতে এক একটি করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। (৩) দেশে যত প্রকার স্কুল আছে, সেই সকল স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার মত স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। (৪) বর্তমানে যে সকল সরকারী স্কুল-কলেজ আছে, সেগুলির ব্যয়ভার গ্রহণ ও পোষকতা করিতে হইবে এবং আবশ্যক-মত ভবিষ্যতে আরও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। (৫) মধ্যম শ্রেণীর (Middle) নূতন স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। (৬) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারকল্পে

মনোযোগ দিতে হইবে। (৭) এই সকল বিদ্যালয়ে অর্থ-সাহায্য জন্ত একটি ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে।”

“যে সমস্ত স্কুলে ছাত্রগণকে রীতিমত ভাবে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, ধর্মসম্বন্ধীয় কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণতার প্রশয় দেওয়া হয় না, যে সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থা স্থানীয় ভদ্রলোকগণ আগ্রহের সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন, সরকার-পক্ষের প্রতিনিধিগণ যে সকল স্কুল আবশ্যিকমত পরিদর্শন করিতে পারিবেন, যাহাতে ছাত্রগণের নিকট হইতে যত অল্পই হউক, অন্ততঃ কিছু কিছু বেতন গ্রহণের প্রথা আছে, সেই সকল স্কুলের রক্ষা ও উন্নতির জন্ত সরকার যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিবেন।” তবে এই সরকারী অর্থসাহায্য প্রদানের পাঁচ প্রকার বিভিন্ন নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছিল; যথা;—

(১) শিক্ষকগণের বেতনের আংশিক ভার গ্রহণ। এ প্রথা এক মাদ্রাজ প্রদেশেই প্রচলিত। শিক্ষকের ঘোণাতা অনুসারে তাহার বেতন নির্দিষ্ট হইলে সরকারী তহবিল হইতে তাহার বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হয় মাত্র। এ প্রথা মধ্যম শ্রেণীর (Secondary) স্কুল-গুলিতেই বিদ্যমান।

(২) পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে সরকারী সাহায্য—মাদ্রাজে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এবং বোম্বাই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর (Secondary) বিদ্যালয়ে এই নিয়মানুযায়ী

সরকারী সাহায্য প্রদান করা হয়। যে সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, সরকার কেবল সেই সকল বিদ্যালয়েই অর্থসাহায্য করিবেন।

(৩) শিক্ষকগণের বেতনের আংশিক ভার গ্রহণ এবং পরীক্ষার ফল অনুসারে অর্থসাহায্য দান এতদ্ব্যতিরিক্ত সম্মিলিত ব্যবস্থা।

(৪) একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য একটা নির্দিষ্ট অর্থসাহায্য দান। উত্তর ও মধ্য-ভারতে অধিকাংশ স্থলেই এই নিয়মানুবর্তী কাজ করা হয়। সরকার এককালীন তিন বা পাঁচ বৎসরের জন্য সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন।

(৫) পুরস্কার প্রদান দ্বারা শিক্ষায় আগ্রহ-বৃদ্ধি। এ ভাবে সাহায্য কেবল বঙ্গদেশেই কতিপয় বালিকা-বিদ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থার সাতটি নিয়মের ফলে ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে সুব্যবস্থিতভাবে শিক্ষার পথ বিস্তৃত হইতেছে। ভারতবাসী ক্রমশঃ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছে ; ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার জন্য দেশীয় ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সরকারী সাহায্যদান ব্যাপারে কোথাও পক্ষপাত করা হয় না ; সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই ঐরূপ সাহায্যদানের মূলনীতি। যে সকল

হয় না, অথচ সাধারণ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকার ঐ সমস্ত স্কুলেই অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। লর্ড ক্যানিং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ভারতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণা অধিকতর লোকের উপর প্রভাব-বিস্তার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং এলাহাবাদ এই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জন করিয়া চ্যান্সেলার আছেন। সাধারণতঃ প্রাদেশিক গবর্নরই এ পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত এক জন ভাইস চ্যান্সেলার থাকেন এবং অন্যান্য ত্রিশ জন সভ্য লইয়া একটি করিয়া সিনেট সভা গঠিত হয়। এই সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের কর্তা; সিনেটই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন জন্ত নিয়মাদি প্রণয়ন করেন, তবে নিয়মগুলি সরকারের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যিক। সিনেটের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট সময়ে নানাবিধ সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহীত হয়। সিনেটের সভ্যগণের মধ্য হইতে অথবা অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তি মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষণীয় বিষয়-ভেদে সিনেট চারিটি বিভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। যথা—(১) সাহিত্য-

দর্শন-বিজ্ঞানাদি, (২) ব্যবহার-শাস্ত্র, (৩) চিকিৎসা-শাস্ত্র, (৪) ইঞ্জিনীয়ারিং বা কলকারখানা। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গীভূত সিণ্ডিকেটই কন্সলিডেইট সভা। এই কন্সলিডেইট সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আট জন সভ্য লইয়া গঠিত। পরীক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষার ব্যবস্থা, উপাধি, সম্মান ও পুরস্কার প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রাগ্র কার্যসম্পাদনের ভার এই সিণ্ডিকেটের উপর হস্ত হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনার্থ সিণ্ডিকেট কর্তৃক সভ্যগণের মধ্য হইতে বোর্ড গঠিত হইয়া থাকে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সভ্য বা ফেলো আর আমেরিকা, ইউরোপ, এমন কি, ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এক বস্তু নহে। যাহারা কোনও সম্প্রদায় বা সঙ্ঘের প্রতিনিধি এবং শিক্ষিত কিংবা যাহারা শিক্ষার উন্নতিকামী ও শিক্ষার জন্য বহু প্রকার স্বার্থ ত্যাগ ও আত্মসম্মতিকার করিয়াছেন, তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হন, ইহারা কোনও প্রকার বেতন গ্রহণ করেন না। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতবাসী এবং যুরোপীয় সকলেই সভ্য হইতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা হয় না, কোন অধ্যাপকও থাকেন না। এখানে ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও যোগ্য ছাত্রদিগকে উপাধি প্রদান করা হইয়া থাকে। অধ্যাপনার

অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আদর্শে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভারতে কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে, আমি তাহারই একটি বিবরণ প্রদান করিতেছি :—

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে।

(১) ইংরাজী সাহিত্য ; (২) প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য প্রাচীন ভাষা অথবা প্রচলিত ভাষা ; (৩) পদার্থবিজ্ঞা ও রসায়ন ; (৪) ইতিহাস ; (৫) ভূগোল ; (৬) পাটীগণিত, বীজগণিত এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতি। এই সকল বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিতে হয়। ভারতীয়গণ দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত বহু স্কুল ও কলেজ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই আছে। কলেজে প্রবেশ করিয়া দুই বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর ছাত্রগণ এফ, এ, পরীক্ষার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। এফ, এ, পরীক্ষার নির্দিষ্ট বিষয় যথা :—

(১) ইংরাজী সাহিত্য ; (২) প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য প্রাচীন ভাষা অথবা প্রচলিত ভাষা, (৩) গ্রায়, (৪) অঙ্ক, (৫) ইতিহাস ও ভূগোল ও (৬) পদার্থ-বিজ্ঞা। ইহার দুই বৎসর পর বি, এ, পরীক্ষা। বি, এ, পরীক্ষা বিষয়-ভেদে দুই প্রকার ; যথা :—(১) সাহিত্য-বিভাগ ও (২) বিজ্ঞান-বিভাগ। সাহিত্য-বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে :—(১) ইংরাজী সাহিত্য ; (২) প্রাচীন অথবা প্রচলিত ভাষা ; (৩) অঙ্ক এবং (৪) ও (৫) নিম্নলিখিত বিষয়-

গুলির যে কোন দুইটি :—নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস ও উচ্চ-গণিত। বিজ্ঞান-বিভাগের বিষয় :—(১) ইংরাজী সাহিত্য ; (২) গণিত ; (৩) রসায়ন ; (৪) প্রাকৃতিক ভূগোল ; (৫) পদার্থ-বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের মধ্যে যে কোন একটি বিষয়।

এম, এ, পরীক্ষার বিষয় :—সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, অথবা ইতিহাস এবং গণিত। ইহা ব্যতীত ব্যবহার-শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধেও পরীক্ষা গ্রহীত হইয়া থাকে এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপাধি দান করা হয়।

বিগত ৪৮ বৎসর বাবৎ এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য চলিতেছে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে বর্তমানে স্কুল ও কলেজ-গুলির ছাত্রসংখ্যা ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার ৪২ জন। বর্তমানে মহরগুলির কথা বাদ দিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রিটিশ-ভারতে যত গ্রাম আছে, তাহার প্রতি চারিটির মধ্যে একটিতে মাত্র স্কুল আছে এবং প্রতি আট জন বালক-বালিকার মধ্যে এক জন মাত্র শিক্ষা পাইতেছে ; বাকি সাত জনের বিজ্ঞান-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। অজ্ঞতার অন্ধকারে তাহাদিগের জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদম-শুমারী অনুসারে জানিতে পারা যায় যে ব্রিটিশ-ভারতে মোট ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৬টি বিদ্যালয়

স্কুলের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭ শত ৪৩। এ সকল
 স্কুলে বেতন দিয়া সকল শ্রেণীর ছাত্রগণই পড়িতে পারে।
 ইহার মধ্যে আবার ৪৪টি কলেজে ব্যবসায়গত শিক্ষা
 প্রদান করা হইয়া থাকে, ১ শত ৪১টি কলেজে সাধারণ
 শিক্ষা দেওয়া হয়; ৫ হাজার ৪ শত ৬১টি মধ্যম শ্রেণীর
 স্কুল আছে; প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৯৮ হাজার ১ শত
 ৩৩; শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য ১ শত ৭০টি ও যে
 সকল স্কুলে বিশেষ ভাবের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের
 সংখ্যা ৪ শত ৯৪। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ-ভারতে বে-সর-
 কারী স্কুলের সংখ্যা ৪২ হাজার ৩ শত ৪৩। ইহার মধ্যে
 ৪ হাজার ৩ শত ৬টি উচ্চ শ্রেণীর, ২৬ হাজার ৬ শত
 ৬৮টি প্রাথমিক ও কেবল কোরাণ শিক্ষার জন্যই ১১
 হাজার ১৬টি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগের নির্দিষ্ট
 নিয়মের সহিত সম্পর্করহিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ শত ৬৩।
 “গত তিন বৎসরের মধ্যে বৃত্তপ্রদেশের জনসাধারণ শিক্ষার
 উন্নতিকল্পে ৪০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছে। এই অর্থের
 প্রায় অর্ধ-পরিমিত টাকা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়া হইয়াছে।
 সরকারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু
 বে-সরকারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। গত
 বৎসর কয়েকটি স্কুল ও ছাত্রাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।
 ইহা ব্যতীত সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার উন্নতির জন্য নূতন
 নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে, আগার মেডিকেল কলেজে

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও রুড্‌কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কারিগরী ও তড়িৎ বিষয়িনী শিক্ষার বিস্তারের জন্য নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লক্ষী সহরেও কারিগরী ও শ্রমশিল্প-শিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।” *

ইংরাজ সরকার ভারতবাসী প্রজার সন্তান-সন্ততিগণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই; ইংরাজ এই ভারতবাসী প্রজার নিকট হইতে গ্রেট-ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের ইংরাজ প্রজা অপেক্ষা শতকরা ৪০ টাকা অধিক কর গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং এই ভারতবাসী সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয়শীল শাসন-নীতির সহায়তা সমর্থন করিয়াও অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। গবর্ণমেন্ট অধুনা সমর-বিভাগের জন্য বার্ষিক ২ শত ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ভারতীয় প্রজার শিক্ষার জন্য মাত্র সাড়ে ৭ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন। রেভারেন্ড জে, টি, সাণ্ডারল্যান্ড বহুদিন ভারতবর্ষে বাস করিয়া শেষে বলিয়াছেন;—“এ দেশীয় প্রজার শিক্ষার জন্য ভারত সরকার যাহা করিতেছেন সে জন্য তাঁহাদিগকে শত ধন্যবাদ। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহারা যৎসামান্য যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ সুখ্যাতি তাঁহারা উপভোগ করুন। কিন্তু প্রজার অভাব, তাহারা যাহা কিছু চাহিতেছে তাহা বা গবর্ণমেন্টের সামর্থ্যের তুলনায় গবর্ণমেন্ট প্রজাদের জন্য কতটুকুই না

করিয়াছেন ! হায়, গবর্ণমেন্ট যদি কেবলমাত্র তাহাদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ অবহিতচিত্তে অনন্তমানে ভারতের উন্নতি বিধানে প্রয়োগ করিতেন ! প্রজার প্রদত্ত অর্থের এমন সামান্য এতটুকু একটা অংশ প্রজার শিক্ষার জন্ত ব্যয়িত হয় কেন ? দেশীয় রাজ্যসমূহ সহিত এই বিশাল ভারতে উচ্চ ও নিম্ন সর্বশ্রেণীর স্কুলে অন্যান্য মাত্র ৪৪ লক্ষ ১৮ হাজার জন ছাত্র অধ্যয়ন করে । কিন্তু প্রায় সমগ্র ইউরোপের লোকসংখ্যায় সমকক্ষ ভারতের এই জনসংখ্যায় উক্ত সংখ্যার পরিমাণ কতটুকু ? এই ভারত গবর্ণমেন্ট প্রজার শিক্ষার জন্ত প্রতি বৎসর কত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন ? প্রতি প্রজার শিক্ষার জন্ত বার্ষিক মবলক একেবারে ১½ পেনি খরচ হইয়া যাইতেছে ! (১½ পেনি = ১/৫ মাত্র) উঃ ! কি টাকাটাই না ব্যয় হইতেছে ! এই ভাবের ব্যবস্থাই যখন প্রচলিত, তখন দেড় শত বৎসর ইংরাজ রাজত্বের পর লিখন ও পঠন-সমর্থ ভারতবাসীর সংখ্যা পুরুষের মধ্যে শতকরা মাত্র ১১ জন ও স্ত্রীলোকের প্রতি ২ শতে ১ জন হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? ভারতের জাতীয় শিল্পকলার একেবারে ধ্বংস সাধিত হইয়াছে । এ অবস্থায় শিল্পকলা ও কারিগরী-বিত্তা শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজন । কিন্তু শাসক-সম্প্রদায় এ বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণই উদাসীন, বুটেন যে ভাবে ভারতীয় প্রজার শিক্ষায় অবহেলা ও উদাসীনতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা

বৃটেনের ভারতীয়ের প্রতি দুর্ব্যবহারের ঘন কলঙ্ক-কালিমা ভিন্ন আর কিছুই নহে।” *

খ্রীশিক্ষার জন্ম ভারতে কোন সরকারী স্কুল বা কলেজ নাই। বড়লাটের কাউন্সিলের ব্যবহার-সচিব মিঃ ড্রিস্ক-ওয়াটার বেথুন স্বয়ং ১০০০০ পাউণ্ড দান করিয়া সর্বপ্রথম একটি বালিকা-বিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি ভারতের বালিকা-বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রীগণকে উপাধি প্রদান করা হইয়া থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ছাত্রীগণ এইভাবে উপাধিলাভ করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ বহু বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বহু বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাগণের একত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। সমগ্র ভারতে বালিকা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। কিন্তু হিন্দুবালিকার অধিকাংশই স্ব স্ব পরিবারে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে এবং ভারতের নিরক্ষর নারীগণ ইউরোপের মহিলাগণ অপেক্ষা অধিকতর ভাবে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মসম্বন্ধীয়, কর্তব্য এবং স্বদেশের চিরাচরিত প্রথা ও সাহিত্যবিষয়িণী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন।

অধুনা ভারতের শতকরা প্রায় ৮৫ জন প্রজা কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। তথাপি ভারত সরকার ভারতে কৃষি-শিক্ষার জন্য কোনও স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের পুণায় একটি কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতের অধিবাসিগণের বার্ষিক আয় জনপ্রতি মাত্র ২ পাউণ্ড বা ৩০ টাকা। এই আয়ের ১৪।১৫ ভাগ সরকারী কর দিতে হয়। এ সকল বিবেচনা করিয়া বলিতে হয় যে, ভারতে শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। বিশেষতঃ যে সকল হিন্দু এই স্বল্প আয় হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাও রাজসরকারে উচ্চপদের আশা করিতে পারেন না। কারণ, উচ্চশ্রেণীর পদগুলি ইংরাজের অধিকৃত। এই সকল ইংরাজ কর্মচারী উচ্চহারে বেতন পাইয়া থাকেন; অথচ ইহাদের অধীনে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী ভারতীয় প্রজা তিন হইতে দশ ডলার পর্যন্ত মাসিক বেতনে সামান্ত সামান্ত কেরানীর কার্য করিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। এই কিছুদিন পূর্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী হিন্দুগণ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী অফিসে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র সুযোগ পাইতেন; কিন্তু লর্ড কার্জন যে “ইউনিভারসিটি বিল” বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলসমূহ

সরকারের সম্পূর্ণ শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রতি-
 যোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী আফিসে প্রবেশ-
 পথ এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে গভর্নমেন্টের
 মনোনয়ন ভিন্ন অন্য কেহ সরকারী কর্মের যোগ্য বলিয়া
 বিবেচিত হন না। লর্ড কার্জন “অফিসাল সিক্রেটস্ বিল”
 বিধিবদ্ধ করিয়া দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করিয়া
 দিয়াছেন। দেশের মধ্যে জনকতক হিন্দু এখনও ইংরাজী
 ভাষায় মুদ্রিত কতকগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
 প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু সরকারের রাজনীতি বা অর্থ-
 নীতির অবাধ সমালোচনা করিয়া স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার
 অধিকার তাহাদের নাই। এইরূপভাবে জনসাধারণকে
 একেবারে কোণ-ঠেসা করিয়া রাখা হইয়াছে। লর্ড কার্জন
 যথেষ্টাচারী শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাথমিক
 শিক্ষার বিস্তার জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব হইতে বার্ষিক ২২০০০০
 পাউণ্ডের এক স্থায়ী সাহায্য মঞ্জুর করিয়া একটি উপকার
 করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের বর্তমান অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে
 ভারতবর্ষে জনসাধারণের উন্নতিকল্পে এখন অবৈতনিক
 শিক্ষার প্রচলন এবং অবৈতনিক প্রশিক্ষণ ও কারিগরী শিক্ষা
 প্রদানের জন্য অনেক স্কুল ও কলেজ স্থাপন বিশেষ প্রয়ো-
 জন। ইহা বাতীত বালিকাশিক্ষার শিক্ষার জন্য স্কুল

মিশনারীদের উপর না দিয়া হিন্দুদের স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে ভারতবর্ষে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যক, তাহাতে বালক-বালিকাগণ বিনা ব্যয়ে সাধারণ শিক্ষা ও সর্বপ্রকার শ্রমশিল্প ও কারিগরী শিক্ষা লাভে সমর্থ হইবে।

অতীতের ত্রায় বর্তমানেও হিন্দুগণ ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা মস্তিষ্ক চালনায় ইউরোপ ও আমেরিকার নরূপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জাতিরও সমকক্ষ ; তবে তাঁহারা দরিদ্র ও পদদলিত জাতি। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সমগ্র দুর্কিসহ গুরুভার হিন্দুজাতিকে নিষ্পেষিত করিতেছে এবং হিন্দুর উন্নতি আকাঙ্ক্ষা ও উত্তম ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। অধিকন্তু ইংরাজ-শাসনের ফলে ভারত দিন দিন ধনহীন হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও হিন্দুগণ নিজেরা অর্থসংগ্রহ করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে প্রাপ্ত শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রগণকে আমেরিকা ও জাপানে প্রেরণ করিতেছেন। কারণ, ইংরাজ যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ অসম্ভব। হিন্দুগণ শিক্ষার প্রতি বীতরাগ নহেন, তাঁহাদের জ্ঞানলিপ্সা প্রবল এবং ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন জন্য তাঁহারা ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ। যদি ইংলও ভারতের কোনও প্রকার উপকার করিয়া থাকেন, তাহা এই পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রচলন। ইংরাজ-শাসনকালে ভারতের ভাগ্যে ইংরাজ দত্ত

অনুগ্রহের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । ভারতে পাশ্চাত্য-শিক্ষার
বীজ উগ্ৰ হইয়াছে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ইহার সুফল ভোগ
করিবেন । ১

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন :—“শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য-জীবনের
পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় ।” হিন্দুগণ বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা
প্রণালীর অসম্পূর্ণতা দোষ এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন
এবং ইহার সংস্কার সাধন করিয়া স্বাধীন ও অবৈতনিক
শিক্ষাদানে ব্যবস্থিত দেশের শিক্ষা-প্রণালীর স্থায়
ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন ।
তাহাদের এই মহান প্রচেষ্টা সমুজ্জ্বল সাফল্যমণ্ডিত হউক,
ইহাই আমার প্রার্থনা ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের প্রভাব ও ভারতের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

আর্য্যসভ্যতার উজ্জ্বল পুণ্যালোক গ্রীস বা রোম, আরব কিম্বা পারস্যের গগনে সর্বপ্রথম প্রতিভাত হয় নাই ; এ জ্যোতিঃ সর্বপ্রথমে ভারত-আকাশেই বিকীর্ণ হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষই অধ্যাত্মশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান কলাবিদ্যা, সঙ্গীত, ভেষজবিজ্ঞান এবং প্রকৃত নৈতিক ধর্মের আদি জন্মভূমি। যদিও আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, গ্রীক ও রোমানগণই পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মদাতা এবং প্রাচীন গ্রীসই দর্শন ও বিজ্ঞানের আদি জন্মভূমি ; তথাপি ইউরোপের প্রাচ্য সাহিত্যবিদ মনীষিগণ এবং প্রাচীন ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ সকলেই ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, জ্ঞানানুশীলন এবং বহু প্রকার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্ম সেই গ্রীস ও ভারতবর্ষের নিকট বিশেষভাবে ধনী।

যদি আমরা প্লিনি, ষ্ট্রাবো, মেগাস্থিনিস্, হিরোডোটাস্,

পর্য্যাপ্তি প্রমুখ বিভিন্ন দেশের অনেকাংক মনীষী কর্তৃক
 লিখিত গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ করি, তাহা হইলেই
 বুঝিতে পারি, সেই প্রাচীন যুগে ভারতের আৰ্য্যসভ্যতার কি
 অমল-ধবল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং বিভিন্ন দেশীয়
 পণ্ডিতগণই বা তাহাকে কি আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি-
 তেন। বস্তুতঃ খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ হইতে ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত
 এই সময়ে হিন্দুগণ ধর্ম্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, কলা-
 বিদ্যা, সঙ্গীত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে এতদূর উন্নতিলাভ
 করিয়াছিলেন যে, অথবা যে কোনও জাতি এ সকল বিষয়ে
 প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের সমকক্ষ
 ছিলেন না। অপর পক্ষে যে সকল জাতি বাণিজ্যসূত্রে বা
 অথবা কোনও প্রকারে হিন্দুর সংসর্গে আসিতেন তাঁহারা
 হিন্দু আদর্শ সানন্দে গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগের আদর্শ হিন্দু-
 আদর্শের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া লইতেন। উদাহরণস্বরূপ
 এক ক্ষেত্রতত্ত্বের বিষয়ই চিত্তা করিয়া দেখুন। আমি পূর্ব্বই
 বলিয়াছি, প্রাচীন হিন্দুগণ বেদোক্ত নিয়মানুসারে যজ্ঞের
 বেদি-নির্মাণের সূত্র হইতে ক্ষেত্রতত্ত্ব আবিষ্কার করেন।
 ইহা হইতেই ক্রমশঃ জ্যামিতির উৎপত্তি একথা পাশ্চাত্য
 পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ
 বলেন, ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ে জগৎ ভারতের নিকটই খলী, গ্রীসের
 নিকট নহে। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন

সমচতুর্ভুজ দুইটির সমষ্টির সমান জ্যামিতির এ সত্য গ্রীক-গণের মতে পিথাগোরাসই প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু পিথাগোরাসের জন্মগ্রহণের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্বে এ তত্ত্ব ভারতীয় হিন্দুগণ অবগত ছিলেন । উল্লিখিত সত্য হিন্দুগণের নিম্নলিখিত দুইটি সূত্রে পাওয়া যায় :—“(১) কোন সমচতুর্ভুজের কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের পরিমাণফল সেই সমচতুর্ভুজের পরিমাণ-ফলের দ্বিগুণ । (২) কোনও সমকোণবিশিষ্ট আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণের উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজের পরিমাণ-ফল ঐ আয়ত ক্ষেত্রের (কর্ণের সম্মুখীন) অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত দুই সমচতুর্ভুজের পরিমাণ-ফলের সমান ।” হিন্দুর সূত্রসূত্রে এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় ; এই সূত্রসূত্র খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত । গ্রীকগণের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, পিথাগোরাস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন । মনে হয়, তিনি প্রকৃতই ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন । কারণ তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহে যে সকল তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি তৎকালীন হিন্দুগণই অবগত ছিলেন । অপর কোন দেশেই তখনও তাহার আবিষ্কার বা প্রচার হয় নাই । সম্ভবতঃ তিনি হিন্দুগণের নিকট জ্যামিতি, গণিত, জন্মান্তরবাদ, আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ, পরিণামে স্বর্গপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ, যোগসাধন, আমিষভোজনের নিষিদ্ধতা, নিরামিষভোজন, সংখ্যাজ্ঞান এবং পঞ্চমভূতের অস্তিত্ব এই সকল বিষয়ের

প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ এই তত্ত্বগুলি যখনও গ্রীসে কিম্বা মিশরে কেহই অবগত ছিলেন না। মিশরবাসী এবং গ্রীসবাসী তখন চারিটি ভূতেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন। পঞ্চম পদার্থ বোম্ব সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কোন ধারণাই ছিল না। সেই প্রাচীন যুগে ভারতের হিন্দুগণই বোম্বের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পিথাগোরাসের জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্বে হিন্দুগণ এ সকল তত্ত্বকথা ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ই, উল্লিউ, হপ্‌কিন্স তাহার প্রণীত “Religions of India” অর্থাৎ ভারতের ধর্মতত্ত্ব সমূহের বিবরণ নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, “খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই ভারতে পিথাগোরাসের সর্বপ্রকার ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল।”

হিন্দুগণের মধ্যে জ্যানিতির ব্যবহার ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়; বীজগণিত ও অঙ্কশাস্ত্রই ক্রমশঃ তাহার স্থান অধিকার করে। গ্রীকগণ অঙ্কশাস্ত্রে হিন্দুগণের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষ হইতেই দশমিক ভগ্নাংশ তত্ত্ব জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। আরবগণ হিন্দুদিগের নিকট এই তত্ত্ব প্রথমে গ্রহণ করেন এবং আরবগণ দ্বারাই ইহা পরে ইউরোপে প্রচারিত হয়। গ্রীক বা রোমীয়গণ দশমিক তত্ত্ব অবগত ছিলেন না; এবং দশমিক তত্ত্ব বাদ

পারিত না। হিন্দুগণই আরবগণের সাহায্যে বীজগণিত ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। আরবগণ এই হিন্দু বীজগণিত খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরে লিওনার্ডো, ডা, পিসা নামক এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা ইউরোপে প্রচার করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ হইতেই বীজগণিত তত্ত্ব সর্বপ্রথম জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দুগণই সমতল ও বর্তুলাকার ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতির প্রথম শিক্ষক। বিশ্ববিখ্যাত হিন্দু গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ১১১৪—১১৫০ এই সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া উল্লিখিত গণিত শাস্ত্রের আলোচনা ও গ্রন্থ * প্রণয়ন করেন; তিনি ঐ সকল বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার সমাধানে সমর্থ হন নাই। † জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে হিন্দুগণই সর্বপ্রথমে নক্ষত্র,

* ঐ সকল অঙ্ক শাস্ত্র ও বীজগণিত সম্বন্ধীয় তত্ত্ব মিঃ কোল ব্রুক (Colebrooke) অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং বর্তুলাকার ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতির তত্ত্বগুলি উইলকিনসন (Wilkinson) অনুবাদ করেন।

† “To find the value of X so that $ax + b$ shall be a square number.” এই কূট প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। ফ্রেম্যাট (Fremat) এই পুরাতন প্রশ্নের কতকটি সমাধান করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ বীজগণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ইহার সমাধানে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইউলার (Euler)

চক্র, রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের বিভাগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। চীনবাসী ও আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ এ সকল তত্ত্ব হিন্দুদিগ্নের নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক স্তোত্র গান হইতেই হিন্দুগণ সর্বপ্রথম সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সামবেদ প্রকৃতপক্ষে গীত হইত এবং এই উদ্দেশ্যেই ইহা প্রণীত হইয়াছিল। সপ্ত স্বর ও তিন গ্রাম গ্রীকগণের বহু শতাব্দী পূর্বে হিন্দুগণ অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ গ্রীকগণ হিন্দুদিগ্নের নিকটেই ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত (Wagner) ওয়াগনার তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতশাস্ত্রে যাহাকে সঙ্গীতের ধূয়া বা "Leading motive" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেজন্ম তিনি ভারতীয় হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের

শেষে ইহার সমাধান করেন এবং ১১১০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু বীজগণিতসম্বন্ধে পণ্ডিত ভাস্কর যে ভাবে ইহার সমাধান করিয়াছিলেন, তিনিও ঠিক সেই ভাবেই তাহার সমাধান করেন। আর একটি প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে, ভাস্কর যে ভাবে সমাধান করিয়াছিলেন ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে লর্ড ব্রুনকারও (Brounker) ঠিক সেইভাবেই তাহার সমাধান করেন। সেই প্রশ্নের একটা সাধারণ সমাধান হিন্দু পণ্ডিত ব্রহ্মগুপ্ত ৭ম শতাব্দীতে যে ভাবে করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউলার তাহা পারেন নাই, অবশেষে ডি, লা, গ্রাঞ্জ (De la Grange) ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সমাধানে সমর্থ হন। হিন্দুগণের প্রিয় কুটক (Kuttaka) প্রথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন না। অবশেষে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাচেট ডি, মেজেরিয়াক (Bachet de Mezeriac) ইহার অনুবাদ ও প্রকাশ করেন।—

নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। এই Leading motive হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রের ছাত্রগণ Wagnerএর সঙ্গীত রীতিমত হৃদয়-ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়াই তিনি প্রাচ্য সঙ্গীত-বিজ্ঞার অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যে এ বিষয়ে জার্মান দার্শনিক সপোনহরের সহিত আলোচনাও করিয়া-ছিলেন, সে কথা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন।

পাশ্চাত্য জগৎ চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলির জন্ম ভারতের নিকট ধনী। পূর্বে অভিভাষণে আমি বলিয়াছি যে, মহাবীর সেকেন্দর কেবল তাঁহার শিবিরেই যে হিন্দু-চিকিৎসকগণকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন, তাহা নহে ; তিনি গ্রীক চিকিৎসক অপেক্ষা হিন্দু-চিকিৎসকগণকেই সমধিক আদর করিতেন। মেগাস্থিনিস্, নিয়ার্কাস ও আরিয়ান ইঁহারা সকলেই হিন্দু-চিকিৎসকগণের চিকিৎসার দক্ষতা সম্বন্ধে ভূয়সা প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন কিংস কলেজের (King's College) ডাঃ রলি "Hindu Medicine" হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, Hippocrate's (হিপোক্রেটীস) চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক বলিয়া অভিহিত ; তিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার প্রণীত Materia Medica ভারত হইতেই গৃহীত। ডাঃ রলি

বলেন. “আমরা হিন্দুগণের নিকট হইতেই চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক তত্ত্বসকল গ্রহণ করিয়াছিলাম।”

হেরোডোটাস্ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সে সময় হিন্দুগণই পৃথিবীর সর্বপ্রধান জাতি ছিলেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, হিন্দুগণ মিশরের সহিত বাণিজ্য করিতেন; ইহা বাতীত অগ্ৰাণু স্থান হইতে আমরা সংগ্রহ করিয়াছি যে, বাবিলন এবং সিরিয়ার সহিতও হিন্দুদিগের ব্যবসায়গত সম্বন্ধ ছিল। অপর এক স্থান হইতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, জনৈক হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিত এথেন্স নগরে সক্রেটিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এ কথা অধ্যাপক মোক্ষমূলার তাঁহার প্রণীত “Psychological Religion” নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা জানি, এই হিন্দু দার্শনিকের সহিত প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকের ‘দর্শন’ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। হিন্দু পণ্ডিত সক্রেটিসকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, “তাঁহাদিগের দর্শনে কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে,” তাহার উত্তরে সক্রেটিস বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা দর্শনে মনুষ্যজীবনের আলোচনা করিয়া থাকেন। উত্তর শুনিয়া হিন্দু দার্শনিক হাসিয়া বলিয়াছিলেন—“ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় না করিয়া, মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আপনারা কি অবগত হইতে পারেন?” এইরূপ

হিন্দুই বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর-জ্ঞান হইতেই সর্বপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি এবং হিন্দুগণ ঈশ্বর-জ্ঞানলাভ না করিয়া, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবগত না হইয়া, মনুষ্যজীবনের আর কোন বিষয় জানিতে উৎসুক নহেন।

রাল্ফ ওয়ালডো এমারসন বলেন, “প্লেটো এসিয়া ও ইউরোপের মিলনক্ষেত্রবৎ এবং বস্তুতঃ তাঁহার প্রণীত দর্শন গ্রন্থসমূহে প্রাচ্যতত্ত্বগুলির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়; এই প্রাচ্য দার্শনিক তত্ত্বসমূহের প্রভাবেই তাঁহার দর্শন-গ্রন্থগুলি যেন প্রভাতের স্বর্ণ-অরুণকিরণে সমুজ্জ্বল।” বস্তুতঃ প্লেটোর মুখে যখন যোগসাধনা-শিক্ষার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, হিন্দু দর্শনের কতটা প্রভাব তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে তখনই বুঝিতে পারা যায়; কারণ, সকল জাতির মধ্যে এক গ্রীক জাতিই যোগসাধনায় অল্পপ্রয়াসী। আমার বন্ধু অধ্যাপক এডওয়ার্ড হাওয়ার্ড গ্রিগস্ নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতির একটা অধিবেশনে “Philosophy of Plato” প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, “ইন্দ্রিয়-জয় দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের কথা যখন প্লেটো বলিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে হইবে তিনি প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব বশতঃই একথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন। গ্রীক দর্শনের কোথাও এ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না।” বিশেষতঃ আমরা যখন প্লেটো প্রণীত দর্শন অধ্যয়ন করি, এবং তাঁহার ভাব-গুলির সহিত উপনিষদ্ এবং অন্যান্য বৈদিক তত্ত্বসকলের

তুলনা করি, তখনই বুঝিতে পারি যে, তাঁহার রচিত গুহা-
মুখ্যস্থিত শৃঙ্খলিত নরমূর্তি বেদান্ত-উক্ত মায়া এবং এই পরি-
দৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নবৎ অলৌক বেদান্ত-কথিত এই তত্ত্ববাক্যেরই
রূপক মাত্র। প্লেটোর অন্য রূপক চিত্র “রথ”। এ
চিত্র প্লেটোর জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্বে বৈদিকযুগের
লেখকগণ অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কঠ উপনিষদে আমরা
দেখিতে পাই :—“মনুষ্যদেহকে রথের সহিত তুলনা করা
যাইতে পারে ; তাহা হইলে সেই মনুষ্যদেহরূপী রথের
চালক বুদ্ধি ; মন সেই রথের অশ্বের বস্ত্রাস্বরূপ ; পঞ্চ
ইন্দ্রিয় রথের পাঁচটি অশ্ব এবং রথের পথ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য
পদার্থ।” ইংরাজ জাতির মধ্যে প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ মনীষী স্যার
উইলিয়াম জোন্স একথা স্বীকারপূর্বক লিখিয়াছেন :—
“বেদান্ত পাঠ করিলে অথবা বেদান্তের রূপক চিত্রসকল
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, একথা আর অস্বীকার করা যায় না
যে, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যে উৎস হইতে এই মহান
তত্ত্বসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পিথাগোরাস এবং প্লেটোও
সেই উৎসেরই অমিয় ধারা পান করিয়াছিলেন।” *

অধ্যাপক মোক্ষমূলার এবং অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য-দর্শনা-
ভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, এরিষ্টটল প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র হিন্দু
ন্যায়শাস্ত্রেরই রূপান্তর মাত্র। এ কথা বোধ হয় আপনারা
সকলেই জানেন। আপনারা ইহাও জানেন, অধ্যাপক হপকিন্স

তাহার প্রণীত “Religions of India” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, থেলস্ এবং পারমিনাইডিজের তত্ত্বসকল ভারতীয় দার্শনিক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং গ্রীসের ইলেটিক (Eleatic) দর্শন-শাখা হিন্দু উপনিষদেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র । তাহার বিবেচনায় এমন কি এনাক্সিমেন্ডার এবং হেরাক্লিটাসের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিও গ্রীস-প্রতিভার মৌলিক সম্পত্তি নহে । আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, মহাবীর সেকেন্দারের ভারতাক্রমণের পর গ্রীস ও ভারতের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল । বহু হিন্দু দার্শনিক গ্রীস-রাজধানী এথেন্স এবং গ্রীসের অন্তর্গত অন্যান্য নগরেও বাস করিতেন । গ্রীস দেশে ইহারা Gymnosophists অর্থাৎ হিন্দু দার্শনিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন । তৎকালে গ্রীস ও ভারতের মধ্যপথে দ্বিতীয় আলেকজেন্দ্রিয় নামক সহরেই গ্রীসীয় ও ভারতীয় পণ্যের বিনিময় হইত ; ইহা উভয় দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল । এই আলেকজেন্দ্রিয় সহরেই হিন্দুর প্রাচ্য সভ্যতার ও ইউরোপীয় সভ্যতার আদান-প্রদান কার্য চলিত । (Porphyry) পরফিরি ভারত হইতে আগত মনোবী ও মনস্বী ব্যক্তিগণের জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র এবং জগতের গুঢ় তত্ত্বসমূহের অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । প্লেটোর মতাবলম্বী যে সকল দার্শনিক-প্রাচ্য দর্শন-

অধ্যাপক গারবে বলিয়াছেন যে, (Plotinus) প্লাটিনাস হিন্দু দার্শনিকগণের সমমতাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য (Porphyry) যে যোগক্রিয়াদ্বারা ঈশ্বরের সত্ত্বার উপলব্ধি হয়, তাহাও অবগত ছিলেন। তৎকালে হিব্রু, পারসী কিম্বা মিশরবাসী কোন জাতিরই এ যোগপ্রথা জানা ছিল না। প্লেটো হইতেই তাঁহার মতাবলম্বী দার্শনিকগণ, প্রাচ্য দর্শনে ও প্লেটোর দর্শনে বিশ্বাসী দার্শনিক পাণ্ডিত্যসকল, সুখে ও দুঃখে সমভাবে উদাসীন নির্লিপ্ত ঈশ্বিক মতাবলম্বী দার্শনিকগণ এবং আলেকজান্দ্রিয়ার ফাইলো— ইহাদিগের সকলেরই উপর হিন্দুদর্শন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে Logos তত্ত্ব (বাক্) প্লেটোর দর্শনশাস্ত্রের মূলভিত্তি, এবং যাহা প্লেটোর শিষ্যগণের (Neo-Platonists), ইহুদা দার্শনিক ফাইলোর ও বাইবেলের জন-লিখিত স্মরণাচারেরে মূলে আছে তাহা প্রথমে ভারতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। বেদেতে আমরা ইহার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। হিন্দু দর্শনও ইহার প্রভাবক্ষেত্র এবং অসংখ্য জাতির আধ্যাত্মিক আদর্শও এই Logos তত্ত্ব দ্বারা গঠিত হইয়াছে।

এমন কি, খৃষ্টধর্মও ভারতের নিকট ঋণী। একপ কথায় ইয় ত আমার বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ স্তুতিত হইবেন ; কিন্তু ইতিহাস বিশ্বাস করিতে হইলে এ কথায় আর

ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, তাহাতে এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অবিশ্বাস্য নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ অশোকের সময় খৃষ্টপূর্ব ২৬০ সাল। মহারাজ অশোক তাঁহার জীবদ্দশায় নানাস্থানে প্রস্তরস্তম্ভে তাঁহার অনুশাসন খোদিত করাইয়াছিলেন। এই সকল অনুশাসন-বাক্যপাঠে জানা যায় যে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের জন্য পৃথিবীর নানাদেশে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সাইবেরিয়া হইতে সিংহল, চীনদেশ হইতে মিশর সর্বত্রই বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকগণ সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানেও বৌদ্ধধর্মের মহতী নাতিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্ট স্বয়ং জীবনে এই সকল নীতিবাক্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বী ঐতিহাসিক (Mahaffi) মহাকি এই সকল বৌদ্ধধর্মপ্রচারক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইঁহারা ইহা যে খৃষ্টীয় ধর্মের অগ্রদূত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব (Essenes) ইসেনিজ নামক ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর পতিত হইয়াছিল। রোমীয় ঐতিহাসিক, যিনি খৃষ্টীয় ২৩ হইতে ৭৯ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্বনাম-ধনু প্রিনি এই সকল ইসেনিজের আচার-ব্যবহারের কথা

স্বীয় ইতিহাসে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহারা যতি সন্ন্যাসীর আশ্রয় জীবনযাপন করিতেন; কামেন্ড্রি-য়ের ব্যবহার কেমন তাহা ইহারা জানিতেন না। ইহারা চিরকুমারব্রত ধারণ পূর্বক তালবৃক্ষতলে কালাতিপাত করিতেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, যে সকল বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক ভারত হইতে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং মিশরে আগমন করিয়া যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, এই ইসেনিজগণ সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। (Schelling) সেলিং এবং (Schopenhauer) স্কপেনহরের আশ্রয় দার্শনিক (Dean Mansel) ডিন ম্যানসেল ও (D. Millman) ডি, মিলম্যানের আশ্রয় খৃষ্টান মনোবিগণও একথা স্বীকার করেন যে, যে সকল বৌদ্ধধর্মপ্রচারক ভারত হইতে এই প্রদেশে আগমন করিয়া-ছিলেন, তাহাদের প্রভাবেই এই ইসেনিজ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। একথা সকলেই জানেন যে, ব্যাপ্টিষ্ট জন এই ইসেনিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ব্যাপ্টিষ্ট জন সম্বন্ধে আরনেস্ট রেনান (Ernest Renan) বলেন,—“তিনি ভারতীয় যোগীর আশ্রয় জীবনযাপন করিতেন। তিনি পশুচর্ম, অথবা উটের লোমে প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান এবং locusts ও বস্ত্রমধু মাত্র আহার করিয়া জীবনধারণ করিতেন।……যদি ইসরায়েলের পয়গম্বরগণের সহিত এই শেষ বংশধরের কীর্তন কোনও ইতিহাসে না থাকিত, তাহা হইলেও ইহাদের কীর্তন ইহাদের পয়গম্বরগণের সহিত এই

আর ইহুদী দেশে নাই, সে দেশ ত্যাগ করিয়া হিন্দুর দেশে ভারতে গঙ্গাতীরে বসবাস করিতেছি।” * তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন—“যাহারা যুবকগণের প্রতি শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সংসারত্যাগী যতি ছিলেন ; ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপদেষ্টা দীক্ষাগুরুগণের সহিত ইহাদিগের অনেক সোসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কি সুদূর ভারতের মুনি-ঋষিগণের প্রভাব হইতে পারে না ? যেমন খৃষ্টীয় ফ্রান্সিস্ক্যান সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপ্রচারকগণ মধ্যযুগে ধর্মপ্রচারের জন্ত দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তেমনই সেই প্রাচীনযুগেও যে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ ও পরিত্রাজকগণ সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যাহারা যে সকল দেশের জনসাধারণ বৌদ্ধ ভাষা জানিতেন না, সেই সকল স্থানে পবিত্র চরিত্রের আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেন, তাঁহারাই সিরিয়া ও বাবিলোনিয়ার ভ্রমণ হয় ত জুডিয়া দেশেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবিলন কিয়দিনের জন্ত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থল-স্বরূপ হইয়াছিল। (Boudasp) বোধিসত্ত্ব একজন বিজ্ঞ চ্যালডিয়ান (চ্যালডিয়া দেশবাসী) এবং (Sabeism) সাবিজমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাবিজম অর্থে (Baptism) ব্যাপ্টিজম অর্থাৎ স্নানান্তে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণ বুঝায়।” †

তিনি আরও বলেন,—“যেহেতু ইহুদী, আগাদিগের বিশ্বাস
 যে, জন ইসেনিজগণ এবং আধুনিক ইহুদী দীক্ষাগ্রহণের
 বহু প্রকার বাহ্যিক আচার-ব্যবহার সেই প্রাচীন যুগের
 প্রভাব হইতেই সৃষ্ট হইয়া সম্প্রতি সুদূর প্রাচী হইতে গৃহীত
 হইয়াছে। জন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের যাহা বৈশিষ্ট্য
 এবং যাহা হইতে জন নামের সার্থকতা, চ্যালডিয়া প্রদেশই
 সেই বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং অতীত তাহাই তথায়
 ধর্ম বলিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই বৈশিষ্ট্য ব্যাপ্টিজম
 অর্থাৎ পূর্ণ অবগাহন। ইহুদীগণ এবং প্রাচ্য ধর্মাবলম্বী-
 দিগের মধ্যে অঙ্গপ্রক্ষালনের অভ্যাস সর্বত্রই দেখিতে
 পাওয়া যায়। ইসেনিজগণ এই অবগাহনে একটা নূতন
 আনন্দ করিয়াছেন।” *

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ধর্মকার্যে এই
 অবগাহনপ্রথা মূলতঃ ভারতীয় এবং ভারত হইতেই বৌদ্ধ
 ধর্মপ্রচারকগণ ইহা ইসেনিজগণের মধ্যে প্রচলিত করিয়া-
 ছিলেন। অবশেষে এই অবগাহন-মানই জনের ধর্মমতে
 দীক্ষাগ্রহণ করিবার সর্বপ্রধান আচার বলিয়া নির্দিষ্ট
 হইয়াছিল। ম্যাথু, মার্ক এবং লিউক প্রণীত যীশুর পৃথক
 পৃথক জীবন-চরিতে কুমারী মেরীর পবিত্র গর্ভসংস্কার, তাঁহার
 গৃহ ও ব্রহ্মসময় জন্মগ্রহণ ব্যাপার, হেরড কর্তৃক শিশুবধ এবং

যীশুর জন্মের বহু ঘটনা সম্বন্ধে গঙ্গারগণের মধ্যে

কোনও মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই আবার কৃষ্ণ (খৃঃ পূঃ ১৪০০ সাল) এবং বুদ্ধের (খৃঃ পূঃ ৫৪৭ সাল) জীবনে ঘটিয়াছিল। সুতরাং যীশুর জীবনের ঘটনাগুলি যেন কৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্তেরই পুনঃপ্রকাশ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ এই অবতারবাদ একমাত্র হিন্দু-ধর্মেরই বিশিষ্টতা। ইহুদী-গণের মধ্যে এ ভাবের প্রচার ছিল না। ইহুদীগণ যীশুকে কখনই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু হিন্দুগণ বৈদিক যুগ হইতে ঈশ্বরের মনুষ্যরূপে বহু অবতার স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাই অর্থাৎ এই অবতারবাদই হিন্দু-ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। খৃষ্টীয় ধর্মের ধর্মমূলক বহু প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা খৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা অপব্যয়ী পুত্র এবং বিবাহ ভোজের আখ্যায়িকা দেখিতে পাই, যাহা খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চশত বৎসর পূর্বে স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন, সর্বাংশে তাহারই অনুরূপ আখ্যায়িকা আমরা যীশুর জীবন-চরিতেই দেখিতে পাই। রোমান ক্যাথলিকগণ ভারতের বৌদ্ধগণের নিকট হইতে তাঁহাদিগের বহু প্রকার আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোমান ক্যাথলিকগণের উপসনাপ্রণালী

সকলই বৌদ্ধ-ধর্মোক্ত আচার। পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্মের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বুদ্ধদেবই সর্বপ্রথম সংসারত্যাগী পুরুষ ও স্ত্রী-ধর্মোপাসক-বর্গের ও তাঁহাদিগের জন্ত স্বতন্ত্র আশ্রমের সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। (Barlaam) বারলাম এবং (Josaphat) জোসাফাটের বৈচিত্র্যপূর্ণ আখ্যায়িকা অনুসারে বুদ্ধদেবের নাম রোমান ক্যাথলিক ধর্মাত্মা গুরুগণের তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং গ্রীক ও রোমীয় ধর্মোচার অনুসারে তাঁহার জন্তও একটি স্বতন্ত্র পর্বদিন নির্দিষ্ট আছে।

বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণই ইউরোপীয় খৃষ্টান জ্ঞানযোগী এবং ম্যানিচিয়ানগণের (যাহারা আলোক ও আধার কিম্বা সূ ও কু হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন) ধর্মমতের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে আত্মার পুনর্জন্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। * Origen (অরিজেন) প্রমুখ প্রাচীন খৃষ্টীয় যুগের বহু ধর্মাত্মা, আত্মা যে বারম্বার শরীর ধারণ পূর্বক সংসারে আগমন করিয়া থাকেন এবং আমরাও বহু বার জগতে আসিয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতেও আসিব, এ সকল কথাই স্বীকার করিতেন। খৃষ্টীয় ৫৩৮ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ খৃষ্টানই পূর্বজন্ম এবং জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস

* Professor E. W. Hopkins declares that "Neo-

করিতেন, কিন্তু ৫৩৮ সালে (Justinian) জুষ্টিনিয়ান আইন প্রচার দ্বারা ইহা বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি এই বিশ্বাসের দমনকরে নিম্নলিখিত শাসনবাক্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন :—
 যে কেহ এই মিথ্যা ও অবিদ্বান্ধ উপকথার বিশ্বাস করিবেন
 যে, আত্মা পূর্বেও ছিলেন এবং বার বার দেহপরিগ্রহ-
 পূর্বক ধরাধামে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাকে
 গৃহদগ্ধরূপে বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।” ইহুদীগণও খৃষ্টীয়
 অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিতেন না ;
 কিন্তু পরে হিন্দু অধ্যাত্মবাদের প্রভাবেই কারাইত
 (Karaites) প্রভৃতি অন্যান্য ইহুদী সম্প্রদায় এই জন্মান্তর-
 বাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করেন। ইহুদীয় শকার্থ-
 বোধিকায় লিখিত আছে :—“(Cabala) কাবালি অর্থাৎ
 গুপ্ত যোগশাস্ত্রের আধিক্যের সময় হইতেই এই জন্মান্তরবাদে
 একটা বিশ্বাস ইহুদী জাতির মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে এবং
 ক্রমশঃ যে সকল ব্যক্তি অবাস্তব কোন গুঢ় কথার বিশ্বাস
 করিতেন না, তাঁহারাও ইহা বিশ্বাস করিতে থাকেন।
 আরও লিখিত আছে যে, “(Origen) অরিজেন ও
 অন্যান্য খৃষ্টীয় ধর্মযাজকের দ্বারা এই কাবালিষ্টগণ মানবাত্মার
 পুনর্জন্মবাদের প্রধান প্রধান যুক্তিগুলি তর্কদ্বারা সমর্থন
 করিয়া ঈশ্বরের দ্বায়-বিচারশীলতা স্থাপন করিতে প্রয়াস
 পাইতেন।” *

জন্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলারের মতে পাণিনিই জগতের
 'সর্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক'। এই পাণিনি-প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ
 আপেক্ষিক ভাষা-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।
 যে সকল ইংরাজী শব্দ আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া
 থাকি, তাহার মধ্যে বহু শব্দের উৎপত্তিস্থল যে সংস্কৃত
 সাহিত্য, ইহা অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। যথা, Mather
 (মাদার অর্থাৎ মাতা) ইংরাজী শব্দ, লাতিন ভাষায় ইহা
mater (মেটার), সংস্কৃতে মাতর্; ইংরাজী Father
 (ফাদার অর্থাৎ পিতা) শব্দ, লাতিনে *Pater* (পেটার),
 সংস্কৃতে পিতর্; ইংরাজী Brother (ব্রাদার অর্থাৎ
 ভ্রাতা) শব্দ, সংস্কৃতে ভ্রাতর্; ইংরাজী Sister (সিস্টার
 অর্থাৎ ভগিনী) শব্দ, সংস্কৃতে স্বসর্ শব্দ; ইংরাজী
 Daughter (ডটার অর্থাৎ কন্যা), সংস্কৃতে দুহিতার শব্দ;
 ইংরাজী Path (পাথ), সংস্কৃত পথ, ইংরাজী Serpent
 (সারপেন্ট) সংস্কৃত সর্প; ইংরাজী Bond (বণ্ড) সংস্কৃতে
 বন্ধ ইত্যাদি। ইংরাজী Punch (পান্চ) শব্দের ইতিহাস
 অনেকটা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহার মূল অর্থ সংস্কৃত ভাষায়
 পঞ্চ। সূত্রাং "Give him a punch" (গিভ হিম এ
 পঞ্চ) অর্থে সরল ভাষায় "তাহাকে পঞ্চ অঙ্গুলি মুষ্টি প্রদান
 কর" ইহাই বুঝায়। ইংরাজীতে Punch শব্দ এক প্রকার
 পানীয়ও বুঝায় কিন্তু এই পানীয় দ্বারা পান্চ প্রকার দ্রব্যের

গত অভিভাষণে আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, (Æsop) ঈষপ ও (Pilpay) পিলপে লিখিত আখ্যানগুলির প্রথম উৎপত্তিস্থল ভারত। বস্তুতঃ হিন্দু-নীতিজ্ঞানসম্পন্ন এই সকল পণ্ডিত অদ্ভুত বৃত্তান্ত বহু শতাব্দী বাবৎ ইউরোপ ও আমেরিকায় বালক-বালিকাগণ আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছে। আমার মনে হয়, এমন বালক-বালিকা নাই যে, এই সকল পণ্ডিতগণ পাঠ করে নাই বা এই সকল গল্প পাঠে নীতিজ্ঞান সঞ্চয় করে নাই। রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্র ও রোমীয় ব্যবহারবিজ্ঞানের উপরও অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ প্রাচীন হিন্দু-ব্যবহার শাস্ত্রের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

ইদানীন্তন কালেও পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের প্রভাব কতকটা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই দু একটি দৃষ্টান্ত দিব। যাহারা দার্শনিক স্বপেনহরের দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারাই উপলক্ষ করিয়াছেন যে, স্বপেনহর বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং বেদান্ত-দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি তাহার মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি বেদান্ত-শাস্ত্রের গুণমুগ্ধ হইয়া অমর ভাষায় তাহার গুণগান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—“উপনিষৎ-পাঠে মনুষ্য সমাজের নৈতিক চরিত্রের যতটা উৎকর্ষ সাধিত হয়, উপনিষৎপাঠে মনুষ্য সমাজের যত মঙ্গল সম্ভব, তেমন

আর কিছুতেই সম্ভব নহে । * এই উপনিষৎ বা বেদান্ত
 আমার জীবনে শান্তিসুখা ঢালিয়া দিয়াছে ; আমার মরণেও
 এই উপনিষৎ আমার শান্তিস্বরূপ হইবে—উপনিষৎ আমার
 ইহলোকে ও পরলোকে শান্তির অনন্ত উৎস ।” যোক্ষমূলার
 বলিয়াছেন :—“দর্শনজ্ঞান লাভ দ্বারা যদি কখন মৃত্যু সুখময়
 হয়, তবে সে দর্শন হিন্দুর বেদান্ত ।” অপর পক্ষে স্কপেন-
 হরের শিষ্য (Paul Deussen) পল ডুসেন লিখিয়াছেন :—
 “আমাদিগের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাহা আছে, ঈশ্বর
 তাহারই স্রষ্টা ; কিন্তু খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র মতে এমন ঈশ্বর ও
 আমরা স্বতন্ত্র বস্তু ; আর বেদান্ত মতে সেই ঈশ্বর আর
 কেহই নয় ; আমাদিগের মধ্যেই অবস্থিত আমাদিগের
 আত্মা । এই তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তান্ত বহু তত্ত্বকথা আমরা
 উপনিষৎ পাঠে জ্ঞাত হইয়া থাকি । যদি আমরা
 খৃষ্টানগণের বিবেক-বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা ও অসামঞ্জস্য দূর
 করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি, তবেই
 আমরা এই উপনিষৎ-কথিত মহতী তত্ত্বকথা উপলব্ধি
 করিতে পারিব ।” বস্তুতঃ যে দিন কইতে আধুনিক

* “Fifty Upanishads, under the name of Oupenek-
 hat, were translated from the Sanskrit into Persian
 in 1656 at the instance of the Sultan Mohammed
 Dara Shakoh; and from the Persian into Latin in
 1801—2 by Anquetil Duperron.”—Philosophy of the

ইউরোপীয় দর্শনে বেদান্তের অমিয়ধারা আসিয়া পতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই তাহাতে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে চার্লস উইলকিন্স কর্তৃক ভগবদ্গীতা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল; * ইহা “Song Celestial” অর্থাৎ “স্বর্গীয় সঙ্গীত” নামে খ্যাত। ভগবদ্গীতাতে প্রকাশিত শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশামৃত পান করিয়া ইংরাজ সাহিত্যিক ও দার্শনিক কার্লাইল ধন্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত অনুবাদ বাতীত ইউরোপ ও আমেরিকায় ভগবদ্গীতার বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ফ্রেডারিক গ্রেগেল, ভিক্টর কজিন, এমিল, পল ডুসেন, মোক্ষমূলার, এমারসন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ বেদান্ত দর্শনের গুণমুগ্ধ। আর আমেরিকায় হিন্দু আদর্শের প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক এমারসন। তিনি তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, উপনিষৎ পাঠে তাঁহার অন্তরাগ্না পরম পরিতোষলাভ করিয়া থাকে। আপনারা হয় ত তাঁহার প্রণীত “ত্রয়” নামীয় পঞ্চাংশ পাঠ করিয়া থাকিবেন। তিনি ইহাকে “ত্রয়” বলিতেন। এই পণ্ডের প্রথম চারি ছত্রের অনুবাদ এদন্ত হইল :—

“যাতক হননকর্তা ভাবে আপনারে,

হত ভাবে আজি সব কুরাল আমার,

* Published in London in 1785 and in New York in 1867.

মুখ এরা, জানে নাকি মৃত্যু তত্ত্বকথা—

আমি যে অমর নিত্য আসি বারম্বার ।”

মূলপট্যংশঃ—If the red slayer thinks he slays,
Or if the slain thinks he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again,”

এই ইংরাজী পট্যংশটি মূল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ের
নিম্নলিখিত উনবিংশ শ্লোকের সরল অনুবাদ মাত্র :—

“য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চেনং মৃত্যুতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাশং হস্তি ন হন্ততে ॥”

এমারশনের স্তায় খৃষ্ট ধর্মগ্রাণ ঋষি (Thoreau)
থোরো বেদান্ত দর্শনের অমৃতোপম ভাবে বিমুক্ত হইয়া-
ছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন :—“হিন্দুগণ হিন্দুদিগের
অপেক্ষা ধর্মগ্রাণ ; ইহারা শাস্ত্র পবিত্রভাবে জানীর
স্তায় ধর্মোচরণ করিয়া থাকেন । ঈশ্বর সত্ত্বার উপলক্ষি
তাহারা যে ভাবে করিয়াছেন, তেমন পবিত্র, তেমন
স্বাধীন ভাব জগতের কোন ধর্ম্যে দৃষ্ট হয় না । হিন্দু-
ধর্ম্য বলে ঈশ্বরের বিষয়ে প্রথম জিজ্ঞাসা তৎপর ধ্যান ;
এইভাবে ভক্ত ক্রমশঃ ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু
হিন্দু বাইবেল ঈশ্বরভক্ত বিবেকের তাড়নায় কাতর, অনুতপ্ত
ও ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্রমশঃ দূরে নিক্ষিপ্ত । অনুতাপ

জ্ঞানী, অনুতাপ তাঁহার সর্ব্বথা পরিহার্য্য। অনুতাপ
মনুষ্যকে স্তম্ভিত করে এবং ভীতির ভাব আনয়ন করে।
ঈশ্বর চাহেন তরু, সে তরু যত বড়ই পাপী হউক না
কেন, অনুতাপ বিসর্জনপূর্ব্বক জ্ঞানের প্রেরণায় অধীর
হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে। আপনাকে বিসর্জন
কর ; ভুলিয়া যাও ; তবেই তুমি সে পথে অগ্রসর হইতে
পারিবে।”

“যে রূপ ধীরতা ও নম্রতার সহিত হিন্দু দার্শনিকগণ
অকর্তব্য ও অসাধু কর্ম্মের আলোচনা ও বিচার করিয়াছেন,
তাহাতে তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।”

“আমি যখনই বেদের সে অংশ অধ্যয়ন করিয়াছি,
তখনই মনে হইয়াছে যে, এক পবিত্র দিব্যজ্যোতি উদ্গদেশ
হইতে আসিয়া আমার পথ সেই আলোকচ্ছটার উদ্ভাসিত
করিয়া দিল—যেন সে পথের কোথায় সঙ্কীর্ণতা নাই,
কুটিলতা নাই ; তাহা সরল প্রশস্ত ও সার্বজনীন। মনে
হইয়াছে, যেন নিদাঘকালে নক্ষত্রখচিত ; সেই নক্ষত্রখচিত
আকাশে ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল ; আর আমি
তাহার রজত-ধবল কিরণসাগরে ডুবিয়া গেলাম।”

“তরু কিরূপে যাগযজ্ঞাদি পরিহারপূর্ব্বক মনের পবি-
ত্রতালাভ করিতে সমর্থ হ’ন, বেদান্ত তাহাই শিক্ষা দেন।”

“বেদান্তের একটি জ্ঞানগর্ভ বাক্য আনোরিকার শত শত
মেসোচুসেট প্রদেশ অপেক্ষা মূল্যবান।”

“বেদে ঈশ্বরের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বার্থহীন জ্ঞানগর্ভ।”

“হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু দর্শন উক্ত জাতির নানা প্রকার উদ্যম ও অমার্জিত ভাব ও ধারণায় পূর্ণ; হিন্দুধর্ম ও দর্শনে যে প্রকার সূক্ষ্ম বিচার, গবেষণা এবং মার্জিত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু দর্শনে তাহার অস্তিত্ব নাই।”

“আমি কোনও ধর্ম ও দর্শনবিশেষের পক্ষপাতী নহি। যে ধর্মাক্রান্ত ও অজ্ঞ তাবশতঃ লোকে এক জনকে খৃষ্টান এবং অপর ব্যক্তিকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকে, পরস্পরের ধর্মের মধ্যে একটা পক্ষপাতদোষদৃষ্ট, অনিত্য এবং যুক্তি-বিকল্প পার্থক্যের কল্পনা করিয়া থাকে, আমি সেরূপ অজ্ঞতা কিম্বা ধর্মাক্রান্ততার প্রশংসা দিই না। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে সঙ্কীর্ণতা, পক্ষপাতিতা, অতিরঞ্জন-প্রিয়তা এবং ধর্মাক্রান্ততা হইতে রক্ষা করেন। যিনি প্রকৃত দার্শনিক, তিনি সর্বসম্প্রদায় ও সর্বজাতির প্রতি সম্ভাব-সম্পন্ন। আমি ব্রহ্ম, হরি, অথবা বুদ্ধ, পরমাত্মা এবং ঈশ্বর সকলের প্রতিই সমান ভক্তিসম্পন্ন।”

অধুনা সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ হিন্দুর আদর্শে ও হিন্দুর আধ্যাত্মিক ভাবের বহু প্রাণে প্রাণিত। ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষিত নরনারী এখন খৃষ্ট-ধর্মের সেই অজ্ঞতা, সঙ্কীর্ণতা, অধৌক্তিক ধারণা এবং ধর্মাক্রান্ত পরিচায়

সমাধান করিতেছেন, বিশ্বব্যাপী রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন এবং বেদান্ত-উক্ত সার্বজনীন ধর্ম মনুষ্যকে কি অতুল সুখশান্তি সম্পদ প্রদান করিতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ইহাও বুঝিয়াছেন যে, এই বেদান্ত-উক্ত ধর্মই আধুনিক ইউরোপের বিজ্ঞান, জ্ঞান এবং দর্শন-সঙ্গত ধর্ম। অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের এবং বেদান্ত-দর্শনের নৈতিক প্রভাব পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আপনারা দেখিতেছেন যে, এই পাশ্চাত্য সমাজে দলে দলে আমিষ আহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। কিছু দিন পূর্বে আমি নিউইয়র্ক সহরের কুকুর এবং বিড়ালের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়াছি; কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতে বৌদ্ধ সম্রাট অশোক খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ২৬০ বৎসর পূর্বে প্রাণিগণের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্বত্র লোকে একাগ্রতা, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে—প্রাচ্যের প্রভাবই এ অনুরাগের কারণ। মিসেস এডির (Mrs. Eddy) "Science and Health" নামক পুস্তকের প্রথম কয়েক সংস্করণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং সিলিয়া থাক্সটার (Celia Thaxter) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কৃষ্ণের

উপদেশবাণী পাঠ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন । এ দিকে খ্রিস্টজন্মের ভক্তবর্গ সমগ্র পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম ও দর্শন প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন । এমন কি, মেক্সিকোতেও বেদান্ত-দর্শনের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই অগ্ন্যায়ের অপ্রতীকার (non-resistance of evil) এই মতের সত্য হিন্দুজাতির হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল । অগ্ন্যয় অবিচার, অত্যাচারের পরিবর্তে প্রেমদান হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য । “বস্তুধৈব কুটুম্বকম্” বিশ্বপ্রেমিক হিন্দুরই মর্ম্মবাণী । যৌত্তও বলিয়াছিলেন— “নিম্ন আত্মার মত তোমার প্রতিবেশীকেও ভালবাস ।” কিন্তু কেন ? এ ভালবাসার কারণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই । বেদে আমরা এ বিশ্বপ্রেমিকতার কারণ প্রাপ্ত হইয়াছি । বেদ বলিতেছে :—তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে । কারণ, তুমি ও তোমার প্রতিবেশী আত্মায় এক ও অভিন্ন । তোমাতে আর তাহাতে কোন পার্থক্যই নাই । ‘তত্ত্বমসি’ “সেই তুমি ।” প্রেম কি ? প্রেম একত্বের ভাবব্যঞ্জক । হিন্দুগণ আবহমানকাল হইতে এই মহান নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলনতৎপর ; কিন্তু ইহার ফল কি হইল ? ইহার প্রতিদানস্বরূপ হিন্দুর ভারত বারম্বার ইউরোপ এবং

এশিয়ার অপর্যায়ালপ ক্ষান্তিগণ দাব্য আদায় ও বিশ্বাস

অন্ত্যায়ের অপ্রতীকার, অত্যাচারের প্রতিদানে প্রেম, শত্রুর প্রতি ভালবাসা মনুষ্যের পরমধর্ম বলিয়া কীর্তন করিলেন, সেই খৃষ্টান জাতি আজ পাশবিক বলের প্রভাবে ভারতবাসী হিন্দুকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। ইউরোপের তথাকথিত খৃষ্টানজাতিগণ আজ সে প্রেমময় প্রভুর নির্দিষ্ট ধর্মপথে বিচরণ করিতে এত বীতশ্রদ্ধ! অন্ত্যায়ের প্রতি তাঁহাদের সে অপ্রতীকার কোথায়? কৈ আর তাঁহারা শত্রুর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন? আজ তাঁহারা ধনেশ্বরের উপাসক, আজ তাঁহারা স্বর্গরাজ্য উপেক্ষা করিয়া ইহলোকে সমৃদ্ধিপ্রাপ্তির জন্ত, নশ্বর জগতে সুখ উপভোগের কামনার ক্ষিপ্ত। তাঁহারা দেশে দেশে ধর্ম-প্রচারের জন্ত প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? ধর্মপ্রচারের জন্ত প্রচারকগণ আজ পরের দেশ অধিকার, আর রাজ্যবৃদ্ধির অগ্রদূতমাত্র। তাঁহারা পৃথিবীতে শান্তি ও সন্তাবের প্রতিষ্ঠা করেন না; তাঁহারা এক্ষণে অগ্নি এবং অনলবর্ষণকারী তোপ দ্বারা কত দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। ইংরাজের তিব্বত আক্রমণই ইহার অন্ততম দৃষ্টান্ত। নিরপরাধ হতভাগ্য তিব্বতবাসী কলের কামানে সহস্রে সহস্রে ধ্বংসপুরে প্রেরিত হইল। এ স্মৃতি আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারি কৈ? আমরা কৈ ভুলিতে পারিলাম যে, এক দিন পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ জাতি ভারতে এক হাতে বাইবেল, অপর হাতে

আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ পূর্বক ভারতের কত শত হিন্দুমন্দির ভূমিসাৎ
করিয়া দিয়াছিল। আমরা কেমন করিয়া ভুলিব যে, এই
খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ এক দিন জাপানে যাইয়া খৃষ্টধর্ম-
প্রচারের জলনায় বৌদ্ধধর্মের মূর্তিচিহ্নগুলি চূর্ণ ও বিধ্বস্ত
করিয়াছিল। তাহার পর জাপানের রাজশক্তি ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে
এই খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকগণকে জাপান হইতে বিতাড়িত
করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকগণ কোনও
যুগে কোন দেশে এমন ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ করেন নাই ;
তাঁহারা যে দেশে যখনই গিয়াছেন, তখনই সে দেশ শান্তি ও
সমৃদ্ধির বস্ত্রায় প্রাবৃত হইয়াছে ; সে দেশবাসী উচ্চ
সভ্যতার আদর্শে সভা হইয়াছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, এই বৌদ্ধধর্ম চীনে, জাপানে,
তিব্বতে ও ব্রহ্মদেশে কি করিয়াছিল। জাপানী সভ্যতার
শিল্পকলা কিম্বা জাপানে যাহা কিছু শ্রাঘনীয় আছে, সে
সকলের জন্মই জাপান বৌদ্ধধর্মের নিকট খণী। খৃষ্টীয়
৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। সেই
সময় হইতে এতাবৎকাল এই বৌদ্ধধর্ম তথায় সিনটোইজম্
(প্রেতাঙ্গার উপাসনা) কনফুচে প্রবর্তিত পিতৃপুরুষদিগের
আত্মার উপাসনা এবং কনফিউসিয়ানিজম্ (চীনদেশীয়)-
এর সহিত বন্ধুত্বে অতিবাহিত করিল। চীনদেশে খৃষ্টীয়
৬৫ সালে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। বিগত দুই সহস্র বৎসর

টাইজম্ কিম্বা কনফিউসিয়ানিজম্ ধর্মের কোন প্রকার স্বার্থহানি উপস্থিত করে নাই। অপর পক্ষে এই বৌদ্ধধর্ম চীনদেশবাসীর ধর্ম আদর্শ—আরও উদার করিয়া তুলিয়াছে, চীনবাসীকে মানুষ করিয়াছে; তাঁহাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা প্রদান করিয়াছে। (Lafcadio Hearn) লাক্কাডিও হার্ন জাপান সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম জাপানের কি অসীম মঙ্গলসাধন করিয়াছে, তাহা তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহারা এইচ, ফিল্ডিং হল প্রণীত (The Soul of a People) “দি সোল অব এ পিপ্পল” নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাতিগণের দয়ালীনতা, প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ধর্মবিষয়ে সহনশীলতা হিন্দু ও বৌদ্ধ জাতির চিরাচরিত অভ্যাস। যখন মুসলমানগণ পারস্যদেশ হইতে পারসিগণকে বিতাড়িত করিলেন, তাঁহারা ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ভারতে আজ তাঁহারা সমৃদ্ধ; কিন্তু কোন ভারতবাসীই তাঁহাদিগের প্রতি কোনও দিন কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার করেন নাই। ধর্মবিষয়ে হিন্দুর এই অসামান্য সহনশীলতা দর্শন করিয়া পাশ্চাত্য জাতিগণ, বিশেষতঃ ইংরাজগণ আজি এই গুণের অনুশীলন করিতেছেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধগণ কখনও তাঁহাদিগের প্রতিবেশিগণের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়া আপনাদিগের ধনবৃদ্ধির প্রয়াস পান

নাই। তাঁহারা জগৎকে মহত্তম নীতি ও শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সত্য দান করিয়াছেন—কেবল বাক্যে নহে ; আপনাদিগের জীবন তাঁহারা সেই সকল মহাসত্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ করিয়া গিয়াছেন। এই হিন্দু এবং বৌদ্ধগণই আধ্যাত্মিক জ্ঞান-দানে জগতের প্রকৃত গুরুস্থানীয় বলিতে হইবে। কিরূপে ধর্ম-প্রচার করিতে হয় এবং কিরূপে সেই প্রচারিত ধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা তাঁহারাই জ্ঞানেন। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর উপহাস! আজ সেই জাতিকেই ইউরোপের সাম্রাজ্য-লিপ্সু অত্যাচারপরায়ণ জাতি সকল বর্ষের অসভ্য পৌত্তলিকের জাতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে !*

“Unhappy Asia! Do you call it unhappy Asia? This land of divine needs and divine thought! Its slumber is more vital than the waking life of the rest of the globe, as the dream of genius is more precious than the vigils of ordinary men. Unhappy Asia, you call it? It is the unhappiness of Europe over which I mourn.”—Benjamin Disraeli (Lord Beaconsfield).

ইহার অর্থ—কাহাকে আজ অশুখী বলিতেছ? এশিয়াকে? এশিয়া অশুখী! যে এশিয়া ঈশ্বরের কর্মক্ষেত্র, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিকাশের স্থল! সেই এশিয়া! মুখ! আজ যদি এশিয়ার তল্লা উপস্থিত হইয়াও থাকে, তবে সে তল্লা যে সমগ্র জগতের জাগরণের কারণকর পোষণময়। অতি মামুষের অপ্রাণ যে সাধারণ নারের মতক

হিন্দুগণ চিরদিনই ধৌশক্তির অনুশীলন অপেক্ষা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চরিত্রের অনুশীলন উচ্চতর কর্তব্য মনে করিতেন। ভারতে ধর্ম হইতেই দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, সঙ্গীত প্রভৃতি ষাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি। ধর্ম হইতেই হিন্দুগণের শিক্ষা এবং সভ্যতা ; এই জন্য হিন্দুগণ ধর্মকেই সারাৎসার মনে করিয়া থাকেন। ধর্মোচরণ সর্বপ্রথম কর্তব্য ; বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তৎপশ্চাৎ। হিন্দুগণ হৃদয়ে সদগুণগুলির উৎকর্ষসাধনে সদাই তৎপর ; বাহ্যিক উন্নতি বা সংস্কারে তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা নাই। এই জন্যই হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি উচ্চতম নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ। জাতির ব্যবসায়-গত বা শিল্পগত স্বার্থের উপর হিন্দু-সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে। যে সনাতন নৈতিক বিধি এবং আধ্যাত্মিক বিধি দ্বারা জীবন মূলতঃ পরিচালিত হইতেছে—হিন্দু সভ্যতা তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু সভ্যতার আদর্শ ও আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ একবস্ত্র নহে। অত্যাণ্ড জাতির স্বার্থ-ধ্বংস পূর্বক স্বজাতির স্বার্থরক্ষা ও সমৃদ্ধিলাভই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র। যে সকল জাতি নিরপরাধ, দয়ালু ও দুর্বল, সেই সকল জাতির ধনসম্পত্তি অপহরণ পূর্বক তাঁহাদিগের গ্রামসম্প্রদায় অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত

করিও না। এমিয়ার জন্য নহে, আজ আমি ইউরোপের অস্থগ, ইউরোপের যাতনার জন্যই হা হতাশ করিতেছি।—বেঞ্জামিন ডিসরেলি (লর্ড বেক্সফোর্ড)।

করিয়া আপনাদের ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতিবিধানই পাশ্চাত্য সভ্যতা ।

হিন্দু আদর্শ অনুসারে সভ্য কে ? যে ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্র-সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি বিদ্বান্ এবং সর্বশাস্ত্র ও বিজ্ঞান-পারদর্শী ও যিনি সত্যবাদী, স্বার্থকলুষবিহীন, যিনি নৈতিক বিধি অনুসারে কর্তব্য-সম্পাদননিরত, যিনি দরিদ্র ও আত্মের প্রতি দয়ালু, যিনি অত্মের দ্বারা প্রলোভিত ও নির্ধাতিত হইয়াও তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, যিনি প্রেম দ্বারা বিদ্বৈষ, দানশীলতা দ্বারা লোভ জয় করিয়া-ছেন, সেই ব্যক্তিই হিন্দুর আদর্শমতে সভ্য । যাহার চরিত্র এই সকল নৈতিক গুণ দ্বারা ভূষিত, কেবল তাঁহাকেই সভ্য বলা যাইতে পারে । সভ্য ব্যক্তি সদা এই সকল গুণের অনুশীলন করিবেন এবং যে সকল নীচ ও পশুপ্রবৃত্তি মনুষ্যের জন্মগত রিপু, সভ্যব্যক্তি সদা তাহাদিগকে দমন করিবেন । এই সকল সদগুণশালী বলিয়াই সভ্য ব্যক্তি অসভ্য বর্ষের পশুগণ হইতে পৃথক্ । যিনি সভ্য, তাঁহার ব্যবহার ও আচরণ সূক্ষ্ণচিস্তত ও মার্জিত হইবে ; কিন্তু আধুনিক ইউরোপীর সমাজে এই মার্জিত ব্যবহার সম্পূর্ণ বাহ্যিক ; ইহা সভ্যতা নহে ; এষ্ট সূক্ষ্ণচিস্তত আচরণ আন্তরিক না হইলে তাহাকে সভ্যতা বলা যাইতে পারে না ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা * মনুষ্যের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক

বৃত্তিগুলিকে সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকে ; ঐহিক ঋদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনই পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয়। সেই অতি প্রাচীন বর্ষের প্রথা—জোর যার মূলুক তার—পাশ্চাত্য সভ্যতার এই নীতিরই প্রাধান্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টি বাহ্য আবরণে, প্রাচীর লক্ষ্য চিরদিনই অন্তরে। পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম লক্ষ্য ঐহিক সমৃদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্যলাভই ইহার মূলমন্ত্র। প্রাচ্য সভ্যতার চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভ ; নৈতিক বিধির অনুশীলন তাহার সহায় মাত্র। ইউরোপে ধর্ম্যই চিরদিন প্রকৃত সভ্যতার পথে কণ্টকস্বরূপ, ধর্ম্যরক্ষার্থ প্রবর্তিত বিধিই এবং ধর্ম্যযাজকগণের অবিশ্রান্ত অত্যাচার ও দণ্ডবিধান তথায়

The European comfort, which they call civilization, is, after all confined to a very small space, the Island of Great Britain, France, and the course of a single river, the Rhine. The greater part of Europe is as dead as Asia, without the consolation of climate and the influence of immortal traditions."—Benjamin Disraeli (Lord Beaconsfield).

“এই এশিয়া আবার জাগিবে, আবার ইউরোপের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাহা আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিয়া অভিহিত, সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই বা ইউরোপেব কয় জন উপভোগ করিতেছেন? গ্রেটব্রিটেন দ্বীপটি ফ্রান্স এবং রাইন নদীর উত্তর তীরে কিয়দূরের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ ইউরোপ এশিয়ারই স্রাব্য অসাড়, নিষ্পন্দ। কিন্তু এশিয়ার সান্ত্বনা তাহার জলবায়ু ;

স্বাধীন চিন্তার অন্তরায়। একবার গ্যালিলিও (Galileo) জিয়ার্ডিনো ব্রুনো (Giardino Bruno) প্রভৃতি মধ্য-যুগের বৈজ্ঞানিক মনীষিগণের তুর্দশা স্মরণ করুন ! ইহার ফল কি হইল ? দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্বাধীন চিন্তা প্রকৃত সভ্যতার নিত্য সহচর। যে সভ্যতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার অবশ্যস্বাভাবী ফল। স্বাধীনতা মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য ; কিন্তু সে স্বাধীনতা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইউরোপের শাসনলিপ্সু সমরপ্রিয় সভ্যতার প্রভাবে ভারত আজ তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় বঞ্চিত, ভারত-মাতার ভাগ্যে আজ দাসীবাণ্ড। মাতার অন্তরের কথা প্রকাশ করিবারও অধিকার নাই। মাতা যে আজ তথাকথিত রাজশক্তির দাসী, সেই শক্তির আত্ম-বিরুদ্ধ নীতি বা নির্যাতন সম্বন্ধে তাহার কথা কহিবারও অধিকার নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতে আজ আদর্শ ব্যবসায়গত, এই আদর্শ হইতে অতি ঘোর স্বার্থ-পরতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং ইহারই ফলে হিন্দুর সেই

এসিয়ার সান্ত্বনা তাহার অধর গৌরবময় ইতিহাস ; সুখ-স্বচ্ছন্দ্যহীন অধিকাংশ ইউরোপের যে সান্ত্বনাও যে নাই”—

মহান নীতি এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের মূল ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। বণিকবৃত্তির এবং ঐহিক সুখলিপ্সার বেদীর উপর আজ হিন্দুর সে মহতী সরলতার এবং বিশ্ব-প্রেমিকতার উচ্চ আদর্শের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। যাঁহারা আজ ভারতে মহাপ্রাণ বীণুর ন্যায় পবিত্র ধর্মচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে প্রয়াস পান, ইংলণ্ডের উদাম সভ্যতার স্বার্থপর সেবকগণ তাঁহাদিগেরই সর্বস্বাপহরণ করেন। আজ ইংরাজ-শাসনের মহিমায় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। শঠতা এবং ঐহিক স্বার্থলাভের জন্য বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন আজ হিন্দুর সে উচ্চনীতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের স্থান অধিকার করিয়াছে। আজ সভ্য ইংরাজের শাসনের জন্য খৃষ্টীয় সভ্যতার অশেষবিধ কলঙ্ক, কলাইখানা, মদের দোকান রাজার আয়বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ সরকারী একচেটিয়া মত্ত ও অহিংসের আবগারী ব্যবসায় ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুসমাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুর পারিবারিক জীবনে যে শান্তি ও ঐক্য ছিল, আজ তাহা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ একটা সুফলও হইয়াছে। ইহা হিন্দুর জাতিগত পার্থক্য এবং জাতিগত বিধি-ব্যবস্থার

দোষে সমাজ জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে দোষ
 'ক্রমশঃ' অপসারিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ-কুল পুরোহিতের
 অত্যাচারে হিন্দুসমাজ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল; আজ
 ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সমাজে আবার শান্তি আসিয়াছে।
 কিন্তু অপর পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার ফলে সমাজে একটা
 ওলট-পালট আরম্ভ হইয়াছে; জনসাধারণ ধর্মে অবিশ্বাসী
 হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে
 বিজ্ঞানচর্চার ফলে যে সকল দোষ উপস্থিত হয়, তাহাই
 আত্মপ্রকাশ করিতেছে; অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমশঃ
 নিরীশ্বরবাদী, অজ্ঞেয়বাদী কিম্বা উপযোগিতাবাদী হইয়া
 পড়িতেছেন। বৎসর বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু যুবক বিশ্ব-
 বিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরে ইহাদিগের
 বিশ্বাস নাই। মনুষ্যের আত্মা বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা
 তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না। ইহাদিগের লক্ষ্য আর
 কিছুতেই নাই, একমাত্র লক্ষ্য ইহজীবনে কৃতকার্যতা,
 সমাজে উচ্চপদ, যশঃ এবং গৌরব। সাধু পথ অবলম্বন-
 পূর্বক অর্থোপার্জন এবং জীবনে সুখ উপভোগ হইলেই
 ইহারা চরিতার্থ হইল। জীবিকা উপার্জনের হৃদয়হীন
 ভীষণ প্রতিযোগিতার ফলে দিন দিন জাতির নৈতিক
 অবনতি ঘটিতেছে; জাতি-বিভাগানুসারে যে দিন সমাজে
 নৈতিকতা উপনীত হইবে, সেদিন পথ পথ দিলে, বৎসর

জীবন-সংগ্রামের চাতুরী ও কূটরাজনীতি ভারতে এখন রীতি-
মত আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের শিক্ষিত হিন্দু সম্ভ্রানগণ
এখন জীবনে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, আর স্থির
করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা ক্রমশঃ কিংকর্তব্য-
বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছেন। বালক যেমন বিপদে পড়িয়া
প্রাণরক্ষার জন্য পিতার আশ্রয় গ্রহণে ধাবিত হয়,
দিগ্ভ্রান্ত শিক্ষিত হিন্দু এখন বিপন্ন হইয়া রাজশক্তির
সাহায্যপ্রার্থী হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা
ও সভ্যতার সাহায্যপ্রাপ্তি আকাশকুসুমমাত্র। সাহায্যের
পরিবর্তে তাহাদিগের খেতাব প্রভুর অকুঞ্চন দেখিয়া
তাহাদিগের হৃদয় নিরাশায়— ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িতেছে।
ভারতে এখন সভ্য ইংরাজ প্রভুর এক পদাঘাতেই কত
ভারতীয় ভৃত্য ভবলীলা সাজ করিতেছে; এই ভাবে
নরহত্যার অপরাধে বৃটিশ সরকারের বিচারে, অপরাধী
খেতাবের হয় ত মাত্র পনের টাকা অর্থদণ্ড হইতেছে।
সভ্য ইংরাজ আসামের ঢা-বাগানে কুলীব্যবসায় আরম্ভ
করিয়াছেন; ইহা সেই পুরাতন ঘনিত পরিত্যক্ত
দাসব্যবসায়-প্রথাই প্রায় তুল্য, কিন্তু বৃটিশ সরকার
এ অপরাধে প্রায় কোন ইংরাজকেই দণ্ডিত করেন না।
আজ ভারতে হিন্দুগণ প্রায় প্রতিদিন এই সকল ঘটনা
প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

ইংরাজ শাসনকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে

জনসাধারণের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ ঘটানো ; সকলেরই এখন এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিদেশী শক্তির শাসন জাতির উপর ঈশ্বরের একটা অভিশাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে জাতি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য জাতির উপর যথেষ্টাচার করে, হিন্দু সভ্যতার আদর্শ অনুযায়ী সে জাতিকে সভ্য বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এ কথা আমাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারত বহু বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। দেড় শত বর্ষব্যাপী যথেষ্টাচার ও নির্যাতনের ফলে আজ ভারতের হিন্দু স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং বিগত শত বৎসরের মধ্যে তাহারা যে জাতীয় সম্মান ও গৌরব হারাইয়াছিল, তাহারই পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ইংরাজ শাসনের ফলে ভারত আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা-দীক্ষার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহারই ফলে হিন্দুগণ বহুদিনের কত কুসংস্কার ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাণিজ্যব্যাপারে হিন্দু এখন ছাত্র, সভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ এখন শিক্ষক। হিন্দু এখন ইউরোপীয় আচার ও রীতি শিক্ষা করিতেছে ; মনে হয়, অদূর-ভবিষ্যতে ভারতবাসী এই শিক্ষকদিগের যোগ্যশিষ্য হইতে সমর্থ হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দীক্ষিত হইয়া পশ্চাত্য

সম্প্রমাণ করিয়াছে। এখন দেখা যাউক, দরিদ্র অধঃ-
পতিত ভারত কি করিতে পারে। আমাদের ভাগ্যে
হয় ত সে দৃশ্য দেখা না-ও ঘটতে পারে। তবে যে
স্বাধীনতা জাতিমাত্রেই লক্ষ্য, আমাদের সম্মানসম্মতিগণ সে
স্বাধীনতা উপভোগ করিবেই করিবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ততম সফল এই যে, ভারতের
জনসাধারণ অশেষ-কল্যাণকর বিজ্ঞানশিক্ষা প্রাপ্ত
হইতেছে। ইহা ভারতবাসীর জন্য একটা নূতন
কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিজ্ঞানশিক্ষার
অসামান্য শক্তি এই কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে প্রযুক্ত হই-
তেছে। দীর্ঘ ষট্‌শতবর্ষব্যাপী মুসলমান শাসনকালে
ভারত যে অজ্ঞান-তিমিরে ঘোরতর আভিভূত ছিল, আজ
সে তন্ম্রা হইতে ক্রমশঃ জাগরিত হইতেছে। ভারত-
সম্মানের নেত্র আজ বিজ্ঞানের অরুণ কিরণাভায় উদ্ভাসিত
— হইয়াছে; ভারত-সম্মান আজ বিজ্ঞানশিক্ষার মঙ্গলময়
সুফল প্রাপ্ত হইতেছে। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধই ইহার কারণ। ভারত এই উপকারের জন্য চিরদিন
প্রতীচোর প্রতি, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা-পাশে
আবদ্ধ থাকিবে। মঙ্গলময় বিধাতা আজ যে ভারতকে
তাহার ভবিষ্যতের উন্নতি, তাহার রাজনৈতিক মুক্তির
এই গৌরবময় সুযোগ দান করিয়াছেন, সে জন্য ভারত-
বাসী চিরদিন তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিবে।

ভারত এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেরণায় জাগিয়া উঠুক ;
 ভারতের কল্যাণের জন্ত ইহা এখন আবশ্যিক ; আর
 প্রতীচী এখনও ভারতের নিকট কৰ্ম্মবিষয়ে উদারতা
 শিক্ষা করুন এবং ভারতীয় সভ্যতার মুকুটমণি বেদান্তের
 সার্বজনীন ধর্মের সেই মহোত্তম নীতি এবং প্রকৃত
 আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর যাহাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার
 প্রতিষ্ঠা হয়, প্রতীচী এখন সেইরূপ কার্যে অবহিত হউন ।

সপ্তম অধ্যায়

হিন্দুধর্মের নারীর স্থান

সুবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক লুইস জ্যাকোলিয়েট * সত্যই বলিয়াছেন,—বৈদিক ভারতে নারী-জাতির প্রতি এতদূর সম্মান ছিল যে, উহাকে পূজা বলিলেও অত্যাধিক হয় না। কিন্তু এ কথা আমরা, সুদূর প্রাচ্যেও স্ত্রীজাতি যোগ্য সম্মানে বঞ্চিতা, উপভোগের সামগ্রী এবং মুক দাসী মাত্র বলিয়া প্রাচীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার সময় একবারও ভাবি না।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই সত্যতাই যে তোমাদিগের সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন, সে কথা তোমাদিগের অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং এই সত্যতাই কি সমাজে, কি পরিবারে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের তুল্য স্থান প্রদান করিয়াছে।”

যে রোমীয় আইন যুরোপ ও আমেরিকার সকল দেশের আইনের ভিত্তিস্বরূপ, সেই রোমীয় আইন জাষ্টিনিয়ান † কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইবার বহু শতাব্দী পূর্বে

* “Bible in India.”

† Roman Emperor Justinian I (483-565 A. D. codified the body of Roman law,

হিন্দুসমাজভুক্ত জাতি সকল মনু-প্রণীত বিধি অনুসারেই চলিত। কোন বিধি অনুমাত্র লঙ্ঘন করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জাষ্টিনিয়ান এবং প্রাচীন বাইবেলোক্ত ইহুদী মুশার (Moses) অনুশাসন সমূহের সহিত মানবধর্মশাস্ত্রাদি হিন্দু বিধির তুলনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পিতার সহিত পুত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, মনুর অনুশাসন-বিধির সহিত রোমীয় কিস্বা মুশার অনুশাসন-বিধির সম্বন্ধও তদ্রূপ। কিন্তু হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্রকারগণ বেদোক্ত নৈতিক আদর্শ সমূহের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। বেদোক্ত উপদেশবাক্য অনুসারেই হিন্দু ব্যবস্থাপক স্ত্রীজাতিকে পুরুষের তুল্য অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎসৃষ্টির পূর্বে স্বয়ং আপনাকে দ্বিধা করিয়া, এক অংশ হইতে পুরুষ ও অপর অংশ হইতে নারীর সৃষ্টি করেন,* এই উপমাটি হিন্দুমাত্রের মনে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে মৌলিক সমতা আছে, তাহা স্থাপিত করিয়াছে।

যেমন কোন একটি ফলকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে তাহার উভয় অংশই স্বভাবে, গুণে এবং উপাদানে পরস্পর

* “দ্বিধা কৃৎসনো দেহমর্ধ্বেন পুরুষোহভবৎ।

অর্ধেন নারী তস্তাং স বিরাজমশ্রজৎ প্রভুঃ।”

সমান হয়, সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষ একই বস্তুর দুই সমানাংশ বলিয়া দুইয়েরই সমান ক্ষমতা, সমান স্বযোগ ও তুল্য অধিকার আছে। নরনারীতে সমত্ববুদ্ধিরূপ এই মূল ভিত্তির উপর হিন্দুর সুবিশাল ধর্ম ও নীতি-সৌধ দণ্ডায়মান। সেই সৌধ কাল এবং পরিবর্তনের ধ্বংসলীলা এবং জগতের অদূরদর্শী সমালোচকগণের ক্রুর আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া এত যুগ ধরিয়া অটল, অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই জগত্বে ভারতে যাহা পুরুষের প্রাপ্য ও বাহাতে পুরুষের অধিকার, নারীজাতিরও তাহাই প্রাপ্য এবং তাহাতেই তাঁহাদিগের অধিকার বর্তমান, এ বিষয়ে কোনও প্রকার একদেশদর্শিতা হিন্দুর নৈতিক আদর্শ বা ধর্মোন্মোদিত নহে।

ঋগ্বেদেও স্ত্রীপুরুষের তুল্যাধিকার স্পষ্ট ভাষায় লিখিত — হইয়াছে (মণ্ডল ৫, সূক্ত ৬১, শ্লোক ৮), ভাষ্যকার এই ভাবে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—স্ত্রী ও পুরুষ একই পদার্থের সমান অংশ বলিয়া তাঁহারা সর্ববিষয়েই তুল্য এবং সেই হেতু তাঁহারা উভয়ে কি ঐহিক, কি পারত্রিক সর্বপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ডে মিলিত হইয়া কার্য করিবেন ও তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।” হিন্দুর বেদ নারীকে বেক্রপ পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিয়াছে, পৃথিবীর কোন ধর্মশাস্ত্র সেক্রপ দেয় নাই। প্রাচীন

বাইবেলে (Old Testament), কোরাণে এবং জেন্দ আবেস্তায় (Zend Avesta) পুরুষের কৃত সর্বপ্রকার পাপের জন্য স্ত্রীজাতিকেই অপরাধিনী করা হইয়াছে। প্রাচীন বাইবেলে লিখিত 'নারীজাতির সৃষ্টি এবং নরের অধঃপতন' বিবরণটি, নারী পুরুষের ভোগসুখের জন্যই সৃষ্ট এবং সেই হেতু নারী নির্বিচারে পুরুষের আত্মপালনে বাধ্য, এই ধারণাকে বদ্ধমূল করিয়াছে। প্রাচীন বাইবেলে ইহাও বর্ণিত আছে যে, নারী পবিত্র নিষ্পাপ আদমের (Adam) সহিত ভূ-স্বর্গে যখন নানা সুখ উপভোগ করিতেছিল, তখন দয়তানের হস্তে ক্রীড়াপুতলিকাস্বরূপ হইয়া পুরুষকে প্রলোভিত ও অধঃপতিত করিবার কারণ হইয়াছিল। অধঃপতনের সময় স্বকৃত অপরাধের সমস্ত ভার স্ত্রীর স্বন্ধে অর্পণ করিতে হইবে, এই চিন্তা আদমের মনে সর্বপ্রথম উদিত হইয়াছিল। সেন্ট পল (Saint Paul) নব বাইবেলে (New Testament) দেখাইয়াছেন যে, আদমের এই অধঃপতন ব্যাপারের মধ্য দিয়া নারীই জগতে পাপ, তাপ, ক্লেশ এবং মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে। সম্প্রতি এই ভাবটি খৃষ্টধর্ম হইতে অপসারিত করিয়া জনসাধারণের মনস্তৃষ্টি করিবার নিমিত্ত খৃষ্টধর্ম-বাজকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া খৃষ্টধর্ম-প্রধান দেশসমূহে তাঁহাদেরই কৃত স্ত্রীজাতির উপর সুপীকৃত স্তুতিবাদের অন্তরালে সেই বাইবেলের ইতিহাস এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যখন বাইবেলের

সৃষ্টিপ্রকরণে লিখিত আছে যে, নারীই পুরুষের প্রলোভন ও অধঃপতনের মূল কারণ এবং নারীই জগতের পাপ, দুঃখ ও মৃত্যু আনিয়াছে, তখন যিনি বাইবেলের উক্তি সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি এ কথা কিরূপে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা করিবেন ? যে ব্যক্তি বাইবেলোক্ত বিবরণ সমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে নারীর প্রতি উক্তরূপ ভাব-পোষণ ব্যতীত গতান্তর নাই।

ভারতে বৈদিক ঋষিগণের মনে ঐরূপ ভাব কদাচ উদ্ভিত হয় নাই ; কিম্বা বেদের পরবর্তী কালেও স্মৃতিকারগণের কোনও বিধি বা গ্রন্থে অনুরূপ ভাবের বর্ণনাও দৃষ্ট হয় না। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা, জ্ঞানার্জন, বিদ্যাশিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সহিত নারীর তুল্য অধিকার আছে। — আর এই জন্তই ঋগ্বেদে বহু দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যলাভে সমর্থ বিদ্বদ্বী নারীর নামোল্লেখ আছে। সকল বর্ণের হিন্দুই তাঁহাদিগকে পুরুষের অনুরূপ সত্যদ্রষ্ট্রী, ধর্মশিক্ষয়িত্রী, ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া মান্য করেন ; ঋষিদিগের জায়গাঁহারাও বৈদিক যজ্ঞদ্রষ্ট্রী। যাঁহারা মনে করেন যে, হিন্দুধর্ম স্ত্রীজাতিকে বেদাধ্যয়নে অধিকার প্রদান করেন নাই বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা যেন ভারতের ধর্মোতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর ভাষায়

লিখিত বিবরণসমূহ পাঠ করিয়া নিজেদের ভ্রম সংশোধন করেন। ঋগ্বেদের প্রথম অধ্যায়ের একশত ছাব্বিশ সূক্তের প্রকাশিকা রোমশা-নাম্নী জনৈকা হিন্দু মহিলা। লোপামুদ্রা-নাম্নী অপরা এক হিন্দু নারী উক্ত অধ্যায়ের একশত উনআশী সূক্তের যজুদ্রষ্টী ঋষী। বিশ্ববারা, শাশ্বতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপাঙ্গা, ঘোষা এবং অদিতি প্রভৃতি অন্ততঃ দ্বাদশটি দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন নারীর নামোল্লেখ করিতে পারা যায়, ইহাদিগের মধ্যে অদিতি দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারা প্রত্যেকেই ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রেরণায় জগতে পরমতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই আদর্শ ধর্ম-জীবন যাপন করিতেন, ঐহিক বস্তুসকল তাঁহাদিগের মনে কখনও রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিতেন বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগকে “ব্রহ্ম-বাদিনী” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারা নিষ্ঠার সহিত ধর্মকর্ম্য সকল সম্পাদন করিতেন, পবিত্র স্তোত্র-সকল গান করিতেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের সহিত জীবন ও মৃত্যু, আত্মা ও ঈশ্বর এবং এতদ্ব্যতয়ের সম্বন্ধ প্রভৃতি অতি জটিল সমস্যা-সমূহের আলোচনা করিতেন। কখন কখন ইহারা মহা প্রতিভাশালী প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ দার্শনিককেও বিচারে পরাস্ত করিতেন।

যাহারা বৃহদারণ্যক উপনিষদ অর্থাৎ যজুর্বেদের জ্ঞান-

যে, ব্রহ্মবিৎ ও বেদবেদান্তপারদর্শী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন গার্গী ও মৈত্রেয়ী কিরূপ যোগাতার সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যসকল বিচার করিয়াছিলেন। একরূপ বহু দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে, পুরুষ দার্শনিকগণের বিচারকালে বিদুষী নারী মধ্যস্থার কার্য্য করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যখন পূর্ব্বমীমাংসায় পারদর্শী মণ্ডনমিশ্র নামক সুবিখ্যাত দার্শনিকের সহিত বেদের শাস্ত্রার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন অখিল-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন বিদুষী মণ্ডন-মিশ্রপত্নী উভয়ভারতীকে মধ্যস্থা হইয়া বিচারের ফলাফল নির্ণয় করিতে হইয়াছিল।

একরূপ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মে নারীর বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ অথবা ধর্ম্মকার্য্যে হিন্দু মহিলার স্থান নাই, তাহা হইলে আমরা এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব যে, আমাদের মিশনারী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের — দৃষ্টি নিজ নিজ ধর্ম্মের ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঐ গণ্ডীর বাহিরে যে সকল সত্য রহিয়াছে, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বেদের বিশেষ অনুশাসন এই যে, কোন পরিণীত ব্যক্তি তাঁহার পত্নীর সাহচর্য্য ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম্ম, কর্ম্ম বা যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। যদি কেহ ইহার অত্যাচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ বা অর্দ্ধপূর্ণ থাকিবে; এবং তিনি তাহার পূর্ণ ফললাভে বঞ্চিত হইবেন; কারণ, স্ত্রী তাহার স্বামীর আধ্যাত্মিক জীবনের

অর্দ্ধাংশরূপিণী এবং ধর্মের অর্দ্ধাংশভাগিনী। এই নিমিত্তই সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীকে “সহধর্মিণী” বলা হয়। হিন্দু জাতির আর হিন্দুর এই আদর্শ ও স্মৃতি প্রাচীন। তবে এ কথা সত্য যে, কোন কোন বেদমন্ত্রের উচ্চারণ এবং কোন কোন ক্রিয়া-কাণ্ড স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, কারণ, হিন্দুরা অধিকারিভেদ স্বীকার করে। আধ্যাত্মিক জীবনে নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষতালাভে সমর্থ না হইলে ঐ সকল অধিকার প্রদান করা হয় না। তদ্রূপ কোন কোন শ্রেণীর পুরুষদের পক্ষেও বেদের অংশবিশেষ অধ্যয়ন বা ক্রিয়াবিশেষ সম্পাদন নিষিদ্ধ ছিল। উহার কারণ ‘অধিকারিভেদ’ মাত্র, অর্থাৎ তাহারা ঐ সকল বিষয়ের উপযুক্ত অধিকারী হয় নাই।

বৈদিক যুগের পর পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগ পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সে যুগেও হিন্দু নরনারীর অধিকারের সমত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। বৈদিক যুগের বিধিসকলও সে যুগে অব্যাহত ছিল। যাহারা মহাকাব্য রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাঁরাই রামায়ণের শ্রেষ্ঠ স্ত্রীচরিত্র সীতাদেবীর আদর্শ চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন। তিনি কিরূপ পবিত্রা, সতী ও দয়া-স্বরূপিণী ছিলেন; তিনি কিরূপ আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্ত বিকাশস্বরূপা ছিলেন। অত্যাপি তিনি জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সকল হিন্দু রমণীর হৃদয়েই নারী-চরিত্রের পূর্ণ আদর্শরূপে বিবাজ করিতেছেন। সমগ্ৰ জগতেব

দেখিতে পাইবেন না। তাঁহার জীবন-কথা অতুলনীয়। খৃষ্টান-গণ যেরূপ যীশুখৃষ্টকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করেন, সীতাদেবীও তদ্রূপ হিন্দুগণ কর্তৃক ভগবানের অবতার সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া আরাধিতা হইলেন। একমাত্র ভারত-বাসী হিন্দুদেরই এই বিশ্বাস আছে যে, ভগবান্ কেবলমাত্র পুরুষরূপেই যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা নহে, তিনি নারীরূপেও অবতীর্ণ হইলেন।

আমরা মহাভারতে শূলভা-নাম্নী এক হিন্দু যোগিনীর আখ্যান পাঠ করিয়াছি। ইনি রাজর্ষি জনকের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার যোগবল-লব্ধ অতি আশ্চর্য্য শক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যোগাভ্যাসে নারীরও অধিকার ছিল। অত্যাধিক ভারতে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন বহু যোগিনী বর্তমান। তাঁহাদিগের অনেকেই আবার পুরুষের গুরু হইয়া আধ্যাত্মিক যোগশিক্ষা দান করিয়া থাকেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক যোগিনীর নিকট আধ্যাত্মিক যোগশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগে ধর্ম্মবিষয়েই কেবল যে নারীজাতি পুরুষের তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নহে, ঐহিক ব্যাপারেও তাঁহারা পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করিতেন এবং তুল্য শক্তি পরিচালনা করিতেন। বৈদিক-যুগ

হইতেই ভারতে নারী পুরুষের ত্যায় বিষয়-সম্পত্তির অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদিগের ধর্ম্যাধিকরণে ঘাইয়া স্বপক্ষসমর্থন করিবার অধিকার ছিল। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও পারিতেন।

যাহারা মহাকবি কালিদাসকৃত ‘শকুন্তলা’ নাটক পাঠ করিয়াছেন, তাহারা অবগত আছেন যে, শকুন্তলা মহারাজ তুম্বন্তুর সভায় স্বপক্ষসমর্থন করিয়া আপনার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অষ্টোত্তর-শতসংখ্যক সূক্তে অনুরূপ বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। খৃষ্টের জন্মগ্রহণের দুই সহস্র বৎসর পূর্বেও হিন্দুরমণীগণ শত্রুদমনে রণক্ষেত্রে ঘাইতে পারিতেন। অসামান্য শক্তিশালিনী বৈদিক রমণী ‘সরমা’ স্বামী কর্তৃক দস্যুদিগের অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই বীর রমণী দস্যুদিগের গুপ্ত আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান পূর্বক তাহাদিগের বিনাশসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়, মহারাজ নমুচী স্বীয় পত্নীকে শত্রুদমনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে দমনপূর্বক জয়লাভে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, রমণী উচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা

বিচারকার্য ও প্রজাপালন করিয়াছেন। কোন কোন রমণী বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ-নিবারণেও সমর্থ হইয়াছিলেন। * ভারতের ইতিহাসে ঝাঁসির রাণীর অপূর্ব সৈন্যপতিত্বের বিবরণ চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। ইনি ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অসামান্য দক্ষতার সহিত সৈন্য-পরিচালনা পূর্বক বৃটিশ বাহিনীর এক অংশের গতিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাণী অশ্বারোহী প্রধান সেনাপতির বেশে স্বীয় বাহিনীর পুরোভাগে অবস্থান পূর্বক ইংরাজের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রামের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বরণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন। সার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) বিপক্ষদলের মধ্যে ঝাঁসির রাণীর বীরত্বই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইংরাজ সেনাপতি ইঁহাকে ঝাঁসির রাণী বলিয়া বৃত্তিতে পারেন নাই। তিনি ইঁহাকে পুরুষভ্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ 'যোদ্ধাপুরুষ' বলিয়া বর্ণনা করেন।

অধিক দিনের কথা নয়, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাতিয়ালা রাজ্যে বখন বিপ্লব-বহু প্রধুমিত হইতেছিল,

* আহম্মদ নগরের রাণী চাঁদবিবির কথা আপনারা অনেকেই জানেন, এই অসামান্য-বীৰ্য্যবতী রমণী মোগল সম্রাট আকবরের প্রবল আক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া নিজের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহাকে

রাজ্যের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা, শূন্য রাজসিংহাসনের অধিকার
 লইয়া বিষম মতভেদ, এমনই সময়ে হিন্দুপ্রজাগণ মিলিত
 হইয়া ইংরাজ সরকারের সাহায্যে আউন্স কুরার (Aus
 Kour) নামী এক হিন্দু রমণীকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত
 করিয়াছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এই রমণীর
 রাজ্যশাসন-ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকেই
 একমাত্র যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক বৎসরের
 মধ্যেই এই রমণীর শাসনকুশলতায় রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও
 শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

মালব প্রদেশের রাণী অহল্যা বাঈ দীর্ঘ বিংশতি
 বর্ষ-কাল অসামান্য দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়া-
 ছিলেন। তিনি প্রজাহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।
 তিনি এমনই মহৎপ্রাণা ও লোকাপ্রিয়া ছিলেন যে, তাঁহার
 হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণ একযোগে তাঁহার দীর্ঘজীবন
 প্রার্থনা করিত। যশোলিপ্সা তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও
 স্থান পায় নাই। তাঁহার প্রশংসা-কাহিনীপূর্ণ একখানি
 পুস্তক রচিত হইলে তিনি তনুহুর্ন্তে উহা নষ্ট করিবার
 আদেশ দেন। এমন কি, তিনি গ্রহকারকেও কোনও
 প্রকার সম্মান দেন নাই।

আমেরিকা স্বীয় সভ্যতা ও স্বাধীনতার গৌরব
 করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জানি, আমেরিকা নারী-
 জাতিকে যে অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তাহা

অপেক্ষাকৃত কত সামান্য ! ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বাইবেলের সেই উক্তি এখনও সেখানে বদ্ধমূল। অনেকে বলেন যে, খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাবেই নারীজাতির অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে ; কিন্তু ইতিহাস তাহার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাস বলে যে, এই খৃষ্টীয় ধর্মই বহু শতাব্দী ধরিয়া সমাজ ও রাজ-নৈতিক ব্যাপারে তাঁহাদিগের ন্যায় অধিকারলাভে বাধা প্রদান করিয়াছে। এই নারীজাতির উত্থানের জন্ত যে সকল সমিতির (Suffrage Societies) প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেগুলির বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। তাঁহারা আপনাদিগের ন্যায় অধিকারপ্রাপ্তির জন্ত কি কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। * রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্র অনুসারে স্ত্রীজাতি সমাজে যেরূপ উচ্চাসন পাইয়াছিল,

* আমেরিকার নারীর বর্তমান অবস্থার অবগতির জন্ত মিসেস্ এলিজাবেথ কেডি ষ্ট্যানটন্ (Mrs. Elizabeth Cady Stanton) ১৫ই জানুয়ারী ১৯০১ তারিখে নিউ ইয়র্কের বিশপ পটারকে (Bishop Potter) যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে আমেরিকা দেশে নারীর অবস্থা সম্বন্ধে কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

“সে দিন পিটারসন সহরে যে দুষ্কর্মের ও নারীনির্যাতনের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সেরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের নগরগুলির রাজপথে অস্বাভাবিক পাপকর্মের ব্যাপার ঘটিলে জন-সাধারণ উত্তেজিত হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা করে। এরূপ চেষ্টার ফলে কোন এক স্থানে হয় ত পাপের সামগ্রিক ধ্বংস হয়, কিন্তু তখনই আবার তাহা অল্পকাল

খৃষ্টধর্ম তাহাদের সেরূপ প্রদান করে নাই। এই খৃষ্টান জাতি ভারতের হিন্দুদিগের নিকটই নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে। হিন্দুদিগের জ্যায় টিউটনিক (Teutonic) জাতিগণ অর্থাৎ জার্মান, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতি সমূহ সকল প্রকার পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়েই স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই সমান বলিয়া বিশ্বাস করিত।

ভীষণতরভাবে ঘটিতে দেখা যায়। কখন কখন গির্জায় এই সকল ব্যাপার লইয়া ঘোর আন্দোলন হয় এবং খৃষ্টীয় ধর্মযাজক-সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন; কিন্তু এই সকল অত্যাচারের গূঢ় কারণ যে কি, তাহা কেহ নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

এপিস্ কোপাল (Episcopal Church) খৃষ্টীয়-ধর্ম-সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষগণ এত দিন পরে প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাহাতে অতঃপর নারীজাতির মধ্যে একটা উচ্চতর আত্মসম্মানজ্ঞান জন্মে এবং যুবক-সম্প্রদায় নারীজাতির প্রতি গভীরতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়াই এ বিষয়ে প্রথম কর্তব্য।

“খৃষ্টীয় যাজক-সম্প্রদায় এবং বাইবেল নারীজাতিকে ফুটবলের স্থায় সর্বসাধারণের পদাঘাতের সামগ্রীতে পরিণত করিয়াছে অর্থাৎ তাচ্ছল্য, উপহাস ও বিক্রপের পাত্রে পরিণত করিয়াছে।

“যখন দেখিতে পাই যে, তাহাদের বিবাহানুষ্ঠান-পদ্ধতিতে স্বামীর আত্মপালনই নারীর কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে এবং পুরুষই তাহাকে অপরের নিকট দান করিতে পারিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, নারী পুরুষ অপেক্ষা হীন ও পুরুষের অধীন।

“স্ত্রীজাতি গুণে এবং সাধুতায় বিশপ (Bishop) আর্চ বিশপ (Arch-Bishop), এমন কি, পোপ (Pope) মহোদয়ের সহিত তুল্য হইতে পারেন,—যত দিন এ সত্য ধর্মসম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থায় গ্রাহ্য ও স্বীকৃত না হইবে, তত দিন সমাজের এই বলক ও নারীনিধাতন-

এবং রাজা ও রাণীকে সমান ভক্তির চক্ষুতে দেখিত। কিন্তু খৃষ্টান জাতি-সমূহ অত্ৰাপি নর-নারীর এই সমত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

খৃষ্টান জাতি-সমূহের প্রণীত বিধি অনুসারে নারীজাতি বিষয়সম্পত্তির পরিচালনে যতটুকু অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হিন্দু বিধি-ব্যবস্থানুসারে তাঁহারা এ বিষয়ে অনেক বেশী অধিকার প্রাপ্ত হন। ভারতে হিন্দু পরিবারে ঐহিক এবং পারত্রিক সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ বাণিজ্যব্যবসায়ে গৃহস্থানী স্বীয় পরিবারভুক্ত রমণীগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্যই করেন না।

‘প্রকাশ্য রাজপথে এবং পাপের গুপ্ত লীলাক্ষেত্রে নারীর প্রতি যে সকল অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার জন্য উচ্চপদস্থ ধর্মোপদেষ্টাগণের নারীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রধানতঃ দায়ী। ধর্মের অনুষ্ঠানগুলির (উপাসনামন্দির, বেদি ক্রম, প্রতীক প্রভৃতি) প্রতি সর্বসাধারণ যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যদি মাতৃজাতির প্রতি তাঁহা-দিগকে সেইরূপ ভক্তিযুক্ত হইবার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে এ সমস্তার সমাধান হইবে।

“সদাশয় রাজক-সম্প্রদায় ও রাজকর্মচারিবৃন্দ, তাহারা নারীর প্রতি এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের কর্তব্য নারীকে আপনার তুল্য সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা দিয়া ও তাঁহা-দিগকে আপনাদের সমুদয় সুযোগ ও স্বাধীনতার তুল্যাংশ প্রদান করিয়া স্থায়ী সংস্কারকর্ম আরম্ভ করা।

“পুরুষাপেক্ষা নারীর হীনতা সর্বত্রই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; জীবনের এই সকল লোমহর্ষ বাপার, নারীর এই বিশ্বব্যাপী অধঃপতনেরই ফল।

পাশ্চাত্য দেশে প্রায়ই শুনা যায় যে, হিন্দু পরিবারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি ক্রীতদাসীর ভ্রাতৃ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা সত্য নহে। বরং এ কথা সত্য যে, ইংরাজ মহিলাগণ কিম্বা ইংরাজী ভাবাপন্ন আমেরিকাবাসীর পত্নীগণ তাঁহাদিগের স্বামীর নিকট যেরূপ ব্যবহার পাঠিয়া থাকেন, অধিকাংশ হিন্দু রমণী তাঁহাদিগের স্বামীর নিকট তদপেক্ষা অধিক সদ্যবহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সার মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়মস্ (Sir Monier Monier Williams) বলেন,—“ভারতীয় মহিলাগণ যুরোপীয় মহিলাগণ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ও প্রভাবশালিনী।” স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার, প্রহার প্রভৃতি ঘটনার আধিক্য ভারত অপেক্ষা যুরোপীয় ও আমেরিকার সমাজেই দৃষ্ট হয়। যিনি নারীদেহ দেবমন্দিরের ভ্রাতৃ পবিত্র জ্ঞান না করেন, তিনি যথার্থ হিন্দু নহেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া অথবা ঘৃণা কিম্বা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নারীর অঙ্গ স্পর্শ করে, সে জাতিচ্যুত পতিতাদম। হিন্দু ব্যবস্থাপক মনু বলিয়াছেন, “নারী-অঙ্গ পবিত্র, নারী-অঙ্গে সজোরে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে না।” এই কারণেই হিন্দু শাস্ত্রে নারীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা নাই। মনু প্রমুখ কতিপয় হিন্দু ব্যবস্থাপক-প্রণীত বিধি হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, হিন্দুধর্মের নারীগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট হইয়াছে। মনু বলেন,—

বিধবা এবং পীড়িতা স্ত্রীদিগের ধন অনাথ বালকের ধনের
-ক্রায় রাজা রক্ষা করিবেন ।”

(৬) “যে আত্মীয় উল্লিখিত স্ত্রীগণের ধনসম্পত্তি রক্ষা
করিবার ছলে তাহাদিগের জীবদশাতেই অপহরণ করে,
তাহাকে ধার্মিক নৃপতি চৌর্য্যদণ্ড দ্বারা শাসন করিবেন ।”

(৭) “যদি কোন রমণীর আত্মীয়স্বজনেরা কৌশলের
আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে তাঁহার ধনসম্পত্তি, যানবাহন এবং
অলঙ্কারাদি হইতে বঞ্চিত করে, তাহা হইলে সেই দুষ্কৃত্যচারী
পাপাত্মগণ নিরয়গামী হইবে ।”

(৮) “নারী কিম্বা ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্মানুসারে
হত্যা করিলেও সে হত্যাজনিত পাপস্পর্শ হয় না ।”

(৯) “কন্তা পিতার পরম মেহের পাত্রী ; এ জন্য কন্তা
পিতার অসন্তোষজনক কোন কার্য্য করিলেও পিতা অক্ষুণ্ণ
মনে তাহা সহ্য করিবেন ।”

(৬) “জীবন্তীনাশ্ত তাসাং যে তদ্ধরেষুঃ স্ববাকবাঃ ।

তজ্জিহ্বাচৌরদণ্ডেন ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥”

মনু, ৮ম অঃ, ২৯ ।

(৭) “স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বাকবাঃ ।

নারীগানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যাস্তাদ্বোধগতিম্ ॥”

মনু, ৩য় অঃ, ৫২ ।

(৮) “স্ত্রীবিপ্রাভ্যাপপন্তৌ চ ধর্মেণ ঘনং ন হৃষ্যতি ॥”

মনু, ৮ম অঃ, ৩৪৯ ।

(৯) “* * * * * হৃষিতা কৃপণং পরম ।

তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহ্যেতাসংসারঃ সদা ॥”

(যে সকল মিশনারি প্রচার করিয়া থাকেন যে, হিন্দু ধর্ম বালিকা-হত্যা অনুমোদন করে, তাঁহারা এই উক্তির সহিত, উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বাক্যের তুলনা করিয়া দেখুন ।)

(১০) “মাতৃষসা, পিতৃষসা, মাতুলানী এবং স্বশ্রু গুরু-পত্নীর সমান ও তুল্য শ্রদ্ধার্থী ।”

(ভারতে গুরুপত্নী সাক্ষাৎ দেবীসদৃশী ।)

(১১) “পিতৃষসা, মাতৃষসা এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার প্রতি মাতার ত্রায় ব্যবহার করিবে ; কিন্তু জননী ইহাদিগের অপেক্ষা গরীয়সী জানিবে । যেহেতু, মাতৃ-আজ্ঞা ও মাতৃষসা আজ্ঞা পরস্পর বিরোধ হইলে মাতৃ-আজ্ঞাই প্রবল হইবে ।

(১২) “উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য্য দশগুণ অধিক ভক্তির পাত্র ; পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শতগুণ এবং মাতা পিতা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক মাননীয় ।

(১০) “মাতৃষসা মাতুলানী স্বশ্রুপ পিতৃষসা ।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভাষ্যা ॥”

মনু. ২য় অঃ, ১৩১ ।

(১১) পিতুর্ভগিন্যাং মাতৃষ জ্যায়ন্তাক্ষ স্বসর্ষাপি ।
মাতৃবৎ বৃত্তিমাতিষ্ঠেন্নাতা তাভ্যো গরীয়সী ॥

২য় অঃ, ১৩৩ ।

(১২) উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা ।
সহস্রস্ত পিতৃন্নাতা গৌরবেণাতিরিচাতে ॥

২য় অঃ, ১৪৫ ।

(১৩) ব্রহ্মচারিগণের ঋষি, অপুত্রা হইলেও সাধবী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবান্ ব্রহ্মচারিগণের ঋষি স্বর্গে গমন করেন ।

(মিশনারিগণ কর্তৃক প্রচারিত “হিন্দু বিধবাগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্তৃক অভিশপ্ত,” এই বাক্যের সহিত উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত মতের তুলনা করিয়া দেখুন ।)

(১৪) “যে সংসারে পতি ও পত্নী পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট, সে সংসারে সুখ চিরস্থায়ী ।”

(১৫) “অপত্যলাভ, শাস্ত্রীয় ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যাগ-যজ্ঞ), একনিষ্ঠ কর্ম্ম, উচ্চতম দাম্পত্য-সুখ, স্বীয় এবং পিতৃলোকের স্বর্গবাস এ সকলই পত্নীর উপর নির্ভর করে ।”

(১৬) “পতির পরদারবিমুখতা এবং পত্নীর পাতিব্রতাই

(১৩) মৃত্যে ভর্তৃরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।

স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

৫ম অঃ, ১৬০ ।

(১৪) নন্তুষ্টৌ ভাৰ্য্যয়া ভর্তৃ। ভত্ৰ। ভাৰ্য্যা তথৈব চ ।

যশ্মিন্শ্বেব কুলে নিত্যং কলাগং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥

৩য় অঃ, ৬০ ।

(১৫) অপত্যং ধর্ম্মকাৰ্য্যাণি শুক্ৰবা রতিরুত্তমা ।

দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥

৯ম অঃ, ২৮ ।

(১৬) অন্তোন্তোত্তাভাভীচারৌ ভবেদাবরণাস্তিকঃ ।

এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসুয়োঃ পরঃ ॥

৯ম অঃ, ১০১ ।

দাম্পত্য-জীবনের মুখ্য ধর্ম ; মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই ধর্মোচরণই পতি-পত্নীর কর্তব্য ।”

অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণ বলিয়াছেন :—

১। “রমণীগণের পবিত্রতালাভের শক্তি অসামান্য ; তাঁহারা কখনই (সম্পূর্ণ) অপবিত্র হন না ।”

২। “রমণীর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পবিত্র ।”

৩। “পুরুষ শক্তিস্বরূপ, নারী সৌন্দর্য্যাস্বরূপিণী ; পুরুষ বিচারবুদ্ধিস্বরূপ, সে বিচারবুদ্ধি দ্বারা শাসনকার্য্য নির্বাহিত হইয়া থাকে । নারী প্রজ্ঞাস্বরূপিণী, সে প্রজ্ঞা দ্বারা বিচারবুদ্ধি নিয়মিত হইয়া থাকে ।”

৫। “যিনি নারীর অভিসম্পাতগ্রস্ত, তিনি ঈশ্বরেরও অভিসম্পাতগ্রস্ত বুদ্ধিতে হইবে ।”

৬। “যে কোন নারীর অশ্রুপাতের কারণ হয়, সে সেই অশ্রু দ্বারা আহুত ভগবানের বোধানলে দগ্ধ হয় ।”

৭। “যে ব্যক্তি স্ত্রীজাতির দুর্দশায় উপহাস করে, ঈশ্বরও তাহার উপাসনায় উপহাস করিয়া থাকেন ।”

৮। “নারীর প্রার্থনা, সঙ্গীত ভগবানের কর্ণে বড়ই মধুর ; গুণগানে ঈশ্বরের সন্তোষবিধান করিতে হইলে রমণীর সাহচর্য্য ব্যতিরেকে করিবে না ।”

৯। “নারীকে অবলা জানিয়া তাহাদিগকে নির্যাতিতা ও পিতৃধনে বঞ্চিতা করা অপেক্ষা ঘৃণ্য পাপ আর নাই ।”

সান্নিধ্যে আনন্দ অনুভব করেন । কৃষিকর্মে রমণীকে কদাচ
নিযুক্ত করিবে না ।”

১১। “সাধবী স্ত্রী একই পতির ভজনা করেন ; ধার্মিক
পুরুষেরও একাধিক পত্নী গ্রহণ করা উচিত নহে ।”

আদর্শ স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতে লিখিত আছে,—

“পত্নী পুরুষের অর্দ্ধভাগিনী ও তাহার উত্তম শ্রদ্ধা ।
প্রেমময়ী বনিতা মানবের চির ধর্ম-অর্থ-কাম-প্রসবিনী । সতী
নারী স্বর্গস্থখসাধনায় সর্বোচ্চ সহায় । সুভাষিনী স্ত্রী
নির্জনে সঙ্গিনী, মন্ত্রণায় পিতা, দুঃখে মাতৃসমা, এই সংসাররূপ
অরণ্যমধ্যে বিশ্রামের স্থল ।”

আশ্চর্যের বিষয় যে, খৃষ্টান মিশনারিগণ এই সকল
নীতিকে অতি ভয়াবহ ঘৃণাতি বলিয়া থাকেন । কিন্তু আজও
যুরোপের কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোককে গরু-ঘোড়ার
সহিত লাঞ্জে জুড়িয়া দেয় আর ক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা শ্রমজনক
কর্মে নিযুক্ত করে ।

হিন্দু-আইন (Hindu Law) অনুসারে মাতার সম্পত্তি
অবিবাহিতা কন্যা পায়—পুত্র পায় না। “স্ত্রীধন” অর্থাৎ
যৌতুকস্বরূপ স্ত্রী যাহা পায়, তাহাতে স্বামীর কোন হাত
নাই। ভারতে স্বামী বা পুত্রের ঋণের জন্ত স্ত্রী বা মাতা দায়ী
হন না। সন্তানের উপর পিতার যেমন অধিকার, মাতারও
ঠিক তদ্রূপ ।

ভারতীয় সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি ২৫ বৎসর ভারত-প্রবাস করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় নারী সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছেন, “ভারত-মহিলাগণের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে আমার মনে হয়, উহা আমাদের স্ত্রীলোকদিগের হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল। ভারতীয় নারীগণ সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারেন এবং বিধবাগণ সর্বদাই স্বামীর সম্পত্তির অংশবিশেষ প্রাপ্ত হন।”

খৃষ্টান মিশনারি নয়, একরূপ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণশীল কয়েকজন ভারতপ্রবাসী আমেরিকান মহিলা ঐ উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। সাধারণ লোকে অনেক সময় বলিয়া থাকে, হিন্দু আইনে হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। এক জন ইংরাজ ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কি বলেন দেখা যাউক :—“সাক্ষাৎ পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাবে বিধবা পত্নী স্বাবর সম্পত্তির আজীবন স্বত্ব এবং অস্বাবর সম্পত্তির পূর্ণ স্বত্ব প্রাপ্ত হন। কন্যাগণ নিজ নিজ অংশের পূর্ণ স্বত্বের উত্তরাধিকারিণী। পুত্র থাকিলে মাতা ও কন্যাগণ নিজ নিজ অংশের উত্তরাধিকারিণী হন এবং পত্নীর জন্য তাহার “স্ত্রীধন” থাকে। ঐ “স্ত্রীধন” বহুপ্রকারে লব্ধ হইয়া থাকে,—স্ত্রীর জীবদ্দশায় উহাতে স্বামীর কোন হাত থাকে না; মৃত্যু হইলে স্ত্রীর উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ত হন—উত্তরাধিকার-নির্বাচনে নারী উত্তরাধিকারিগণের দাবীই সর্বপ্রথমে বিবেচিত হয়।”*

ভারতীয় বিবাহপদ্ধতির বিরুদ্ধে বহু বাক্যব্যয় হইয়াছে । বিশেষ করিয়া এই দেশে (আমেরিকায়) আমি উহার বিরুদ্ধে বহু আপত্তি শ্রবণ করিয়াছি । এ কথা সত্য যে, হিন্দুগণ গন্ধর্ব-বিবাহকে (Marriage by courtship) সর্বোচ্চ বা সর্বোত্তম বিবাহপদ্ধতি বলিয়া মনে করেন না । তাঁহারা বলেন, এই প্রণালীর বিবাহ সাধারণতঃ কামবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য হইয়া থাকে । হিন্দুদের এইরূপ ধারণা যে, দুইটি আত্মার আধ্যাত্মিক সম্মিলনরূপ ভিত্তির উপর বিবাহ-পদ্ধতি স্থাপিত হওয়া উচিত ; নীচপ্রবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়সুখভোগের উপর নহে । বিবাহবন্ধন অতি পবিত্র হওয়া বিধেয় । বিবাহকে দুইটি আত্মার অচ্ছেদ্য পবিত্র বন্ধন বলিয়া হিন্দুগণই সর্বপ্রথম ধারণা করিয়াছিলেন । মৃত্যুতে এ সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না, এই ধারণাটি বহু হিন্দু স্ত্রীর হৃদয়ে বদ্ধমূল । তাঁহারা পতির মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন না, আধ্যাত্মিক কর্তব্য সকল সম্পাদনের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন ।

শ্রীমতী ষ্টিল (Miss Steele) বলেন, “আমি বহু ‘বাল-বিধবা’ দর্শন করিয়াছি, যাঁহারা নিজ বৈধব্যতেই মহা গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন ।” বিবাহকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করা উচিত নয় । তদপেক্ষা জীবনের উচ্চতর ও মহত্তর উদ্দেশ্য সমূহ রহিয়াছে—মৃত্যু আসিবার পূর্বেই সে সমুদয় সাধন করিতে হইবে । ভারতের হিন্দু সমাজে

শাস্ত্রানুযায়ী বৈধমিলনের পক্ষপাতী। কিন্তু বংশরক্ষার জন্য তাঁহারা ঐ নিয়মের কিস্কিৎ শিথিলতা ঘটিতে দেন। হিন্দু-শাস্ত্রে বলে যে, স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে পুরুষ তাহার প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক কেবল বংশরক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে।

শাসনবিধি যাহাতে কোন ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী না হয়, এইরূপ এক সমাজ গঠন করাই হিন্দু ব্যবস্থাপকগণের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্যই তাঁহারা সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র বিধি নির্দেশ করেন। ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও প্রবৃত্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ভারতের হিন্দু বিবাহ-বিধি সমূহের ব্যবস্থা বহুমুখী করা হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম-শাস্ত্র-কর্তৃগণ বুঝিয়াছিলেন যে, সকলের পক্ষে এক বিধি খাটিতে পারে না। সমাজে যে যত উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাহার জন্য তত কঠোর নিয়মের ব্যবস্থা। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, একই স্মৃতিকার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু আবার উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের পক্ষে ঐরূপ বিবাহের বিপক্ষে বহু যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ প্রায় সকলেই পুনরায় বিবাহ করিতে পারে; তবে উহা স্বামী বা স্ত্রীর নিজ নিজ রুচির অধীন। হিন্দুশাস্ত্রে মৃতপত্নীক এবং বিপত্নীক বা পত্নী কর্তৃক পরিত্যক্ত পুরুষদিগের আয় বিধবা এবং পতি-ত্যাগী স্ত্রীলোকদিগেরও

পুনর্বিবাহের বিধান রহিয়াছে। * শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী (ইচ্ছা করিলে) যদি স্বামী রাজদ্বারে দণ্ডাই, পাপাসক্ত, উন্মাদ, পুরুষহীন, জাতিচ্যুত বা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সেই স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্বামী বহুকালাবধি বিদেশে নিরুদ্ধেণ থাকিলেও স্ত্রী ইচ্ছা করিলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন। Roman Law (রোমক আইন) তেও এই সকল ভিন্ন (Divorce) বিবাহভঙ্গের অপর কোন কারণ নির্দিষ্ট হয় নাই। সেইরূপ, পত্নী যদি মাতাল, অসতী, কুষ্ঠী এবং পতি ও সন্তানগণের প্রতি নিষ্ঠুরা হয়, তাহা হইলে স্বামীও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন ; কিন্তু মতের অমিল হইল, অথবা দুই জনের মধ্যে এক জনের, অপর এক তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল, এরূপ স্থলে হিন্দুশাস্ত্র (Divorce) বিবাহভঙ্গের অনুমোদন করিয়া বাস্তিচারের প্রশ্রয় কখনও দেয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতে সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় বাল্য-

* বৈদিক যুগে হিন্দুজাতির মধ্যে যে বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে বহু প্রমাণ ও যুক্তি আছে। সংস্কৃত ভাষায় বহু প্রাচীনকাল হইতেই “দিবিশ্ত”, “পরপূর্বা”, “পৌনর্ভব” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে “দিবিশ্ত” বলে। “পরপূর্বা” অর্থে যে নারী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে এবং “পৌনর্ভব” অর্থে দ্বিতীয় স্বামীর উরষ্যকাত সন্তান বুঝায়। এইরূপ শব্দগুলিই যথেষ্ট প্রমাণ। অল্প প্রমাণের আর আবশ্যকতা কি ? “Indo Aryans” by Rajendra Lal Mitra, Vol II, P. 155.

বিবাহ-প্রথা প্রচলিত এবং উহাকে হিন্দুধর্ম সমর্থন করে। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। ধর্ম স্পষ্টাক্ষরে বাল্যবিবাহ নিষেধ করেন। বাল্যবিবাহ কেবল বাগ্‌দানের নামান্তরমাত্র। প্রকৃত বিবাহ-ব্যাপারের কয়েক বৎসর পূর্বে বাগ্‌দানক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কোন বিশেষ কারণ থাকিলে, বাগ্‌দান ক্রিয়ার পরে তিন চারি বৎসর অতীত হইলে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। উত্তর-ভারতে বর এবং কন্যা উভয়ে বিবাহ উপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, প্রকৃত বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। এই প্রকৃত বিবাহ সঙ্গীত, বাগ, ভোজ ও যৌতুকাদি উপহার-দান সহকারে সম্পন্ন হয়। বিবাহকাল না আসা অবধি বাগ্‌দত্তা স্ত্রী পিতৃগৃহেই অবস্থান করে। দক্ষিণাত্যের প্রথা আর্য্যাবর্তের মত নয়, সেখানে সমাজে অনেক প্রকার ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে এবং অতি অল্পবয়সেই সেখানে বালিকা বধূকে পতির নিকট প্রেরণ করা হয়। হিন্দু আইন (Hindu Law) অনুসারে পতির মৃত্যু হইলে বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর পুনর্বিবাহে বাধা নাই; কিন্তু শাস্ত্র বলেন, বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিলে যেরূপ পাপস্পর্শ করে, সেইরূপ বাগ্‌দত্তার পুনর্বিবাহেও পিতামাতার পাপস্পর্শ হয়।

উচ্চবংশীয় কন্যাগণ বয়ঃ চিরকাল অবিবাহিতা থাকিবেন, তথাপি হীনবংশজাত অথবা স্বগোত্রীয়, কিংবা অযোগ্য এবং নিরক্ষর মুর্থ পাত্রকে বিবাহ করিবেন না। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ।

হিন্দুধর্মশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহের বর্ণনা ও আলোচনা
রহিয়াছে । * তন্মধ্যে উভয় পক্ষের মাতাপিতার সম্মতিক্রমে যে
বিবাহ, তাহাই সর্বোচ্চ বিবাহ বলিয়া বিবেচিত,—প্রেমে

* ব্রাহ্মো দৈবগুণৈবায়ঃ প্রাজাপত্যস্তথাহুরঃ ।
গাকর্বেণ রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহমঃ ॥
যো যন্ত ধর্মো বর্ণস্ত গুণদোষো চ যন্ত যো ।
তদঃ সর্বং প্রক্যামি প্রসবে চ গুণাগুণান্ ॥
ষড়ানুপূর্য্য বিপ্রস্ত ক্ষত্রস্ত চতুরোহবরান্ ।
বিহুশূদ্রয়োস্ত তানৈব বিহ্যাক্ষ্যানরাক্ষসান্ ॥
চতুরো ব্রাহ্মণস্তাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিহুঃ ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়ৈশ্চকমাহুরং বৈশূদ্রয়োঃ ॥
পক্ষানাস্ত ত্রয়ো ধর্ম্যা দ্বাবধর্ম্যৌ স্মৃতা বিহ ।
পৈশাচশ্চাহুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন ॥
পৃথক্ পৃথগ্ মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ ।
গাকর্বেণ রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্যৌ ক্ষত্রস্ত তৌ স্মৃতৌ ॥
আচছাদ্য চার্চয়িত্বা চ ক্রতশীলবতে স্বয়ন্ ।
আহুর দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
যজ্ঞে তু বিততে সমাগৃহ্মিজ্ঞে কশ্ম কুর্কতে ।
অলঙ্কৃতা স্মৃতাদানং দৈবং ধর্মঃ প্রচক্ষতে ॥
একং গোমিথুনং দ্বৈ বা বরাদাদায় ধর্ম্যতঃ ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্থো ধর্মঃ ন উচ্যতে ॥
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষা চ ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
জ্যোতিভো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাহুরো ধর্ম্য উচ্যতে ॥
ইচ্ছয়াম্ভোন্তসংযোগঃ কন্যায়ান্চ বরস্য চ ।
গাকর্বে স তু বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥
হত্বা ছিৎত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশপ্রাং কদতীং গৃহাৎ ।
প্রসহ কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিক্র্যতে ॥

পড়িয়া বিবাহবন্ধন নহে। প্রাচীন কালে যখন হিন্দুরাজগণ দেশ শাসন করিতেন, তখন স্বয়ংবর প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল। এই প্রথানুসারে কন্যা স্বয়ং পতি নির্বাচন করিতেন। ঠাহারা (Sir Edwin Arnold) সার এডুইন অনল্ড-কৃত (Light of Asia) “এসিয়ার আলো” নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের বিবাহকথা স্মরণ হইতে পারে। হিন্দুগণ যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইলেন, তখনও যদি ঐ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বর্ণসাক্ষ্য নিবারণ করা অসম্ভব হইত। তাই ঠাহারা উক্ত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া অল্পবয়সের পুত্রকন্যার বাগ্‌দান-প্রথা অবলম্বন করিলেন, দেশের সর্বত্র অবশ্য বাগ্‌দানপ্রথা প্রচলিত নাই।

খৃষ্টান মিশনারিগণ হিন্দু-নারীর নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। আমার বলিতে হুঃখ হয়, আমার স্বদেশবাসী কয়েকটি স্ত্রীলোকও খৃষ্টানী দলে নাম লিখাইয়া, উক্ত মিশনারি নিন্দুকদের সহিত একযোগে হিন্দু-নারীর দোষারোপে নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনারা যদি ভারত-মহিলাদের প্রকৃত অবস্থা সকল জানিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে মিশনারি এবং স্বধর্মত্যাগী ভারতীয় খৃষ্টানগণের শতকরা নিরানব্বইটি উক্তি অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। সর্বত্র দেশেই হুঃশীলা স্ত্রীলোক আছে ; ভারতেও আছে। কিন্তু হিন্দুনারীদের একেবারেই সত্য নাই, এইরূপ দায়িত্বহীন ব্যাপকোক্তি, জঘন্য হুঃশীলা

অপেক্ষাও যদি হীন কিছু থাকে, তবে তাহাই। পণ্ডিত-
রমাবাদী বলিয়াছিলেন, “আমি আমার মেয়েদের কাহাকেও
কোন ভারতীয় পরিবারে রাখিয়া বিশ্বাস পাই না। সে দেশের
দুর্নীতি অতি ভয়াবহ।” Fitchburg Sentinel, 18th
April, 1898,

বিশ্বাদিগের আশ্রদাহে ধর্মের অনুমোদন ছিল না।
উহার অন্য কারণ ছিল। উহার প্রকৃত তথ্য এই—যখন
মুসলমানগণ ভারতবর্ষ জয় করে, তখন তাহারা বিজিত
সৈনিকগণের বিধবা পত্নীদের প্রতি যেকোন ঘোর পণ্ড-
ব্যবহার করিত, তাহাতে তাহারা (ঐ বিধবাগণ) স্বয়ংই
মরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করিয়া মৃত্যুবরণ করিত। অনেক
সময় বলা হয়, খৃষ্টান সরকার সতীদাহ দমন করিয়াছেন।
কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ করিয়াছিলেন এক হিন্দু
মহাত্মা—রাজা রামমোহন রায়। অবশ্যই রামমোহন তদীয়
ভাবসমূহ সমাজে চালাইবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য গ্রহণ
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কেন না, ভারত তখন পরাধীন।
দেশের কোন কোন অংশবিশেষে মাত্র ঐ প্রথা
প্রচলিত ছিল এবং দেশের শিক্ষিত হিন্দুসমাজ উক্ত প্রথার
সমর্থনকারী পুরোহিতকুলের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করিয়া
আসিতেছিলেন। এমন কি, কোন কোন স্থলে বল-
প্রয়োগপূর্বক উহার উচ্ছেদসাধনেরও চেষ্টা হইয়াছিল।
কিন্তু সরকারী সাহায্য ব্যতীত একে উড়া দানবপুত্র হইল না

বলিয়া, বড় লর্ড লর্ড বেণ্টিঙ্কের নিকট আবেদন প্রেরণ করা হয় এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে এক আইন প্রবর্তিত হয়। এইরূপে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে হিন্দুগণ নিজেরাই কার্যাতঃ ঐ অশুভের দমন করেন।

(Sir M. M. Williams) সার মনিয়র মনিয়র উইলিয়মস্ বলেন,—“প্রধানতঃ এই প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার (রাজা রামমোহন রায়ের) তীব্র সমালোচনার কশাঘাত এবং তৎপ্রবর্তিত ভীষণ আন্দোলনই, অবশেষে ১৮২৯ সালে, সমগ্র ব্রিটিশভারতে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদসাধনের কারণ হয়।” [vide “Brahmanism and Hinduism,” p. 482] ভারতের কোন কোন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-সমাজে নারীর অবাধ মিলন নিষিদ্ধ। ধর্ম্মানুশাসন উহার কারণ নহে। উহার অন্ত্রবিধ কারণ রহিয়াছে। মুসলমানদিগের পণ্ড-ব্যবহার হইতে আত্মরক্ষার্থই ঐ রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। “পর্দাপ্রথা” অর্থাৎ আবরণ ব্যতিরেকে স্ত্রীলোককে বাহিরে না যাইতে দেওয়ার প্রথা, ভারতে মুসলমান কর্তৃক প্রবর্তিত; উহার উদ্ভব হিন্দুদের মধ্যে হয় নাই। ভারতে বহুস্থান আছে, যেখানে পর্দা-প্রথার অস্তিত্বই নাই। সেখানে পুরুষনারী অবাধে মিশিতে পারে, এক গাড়ীতে ভ্রমণ করে এবং পর্দা ব্যতিরেকেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত বাহিরে চলা-ফেরা করে।

(Sir M. M. Williams) সার মনিয়র মনিয়র

উইলিয়মস্ বলেন,—“অধিকন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, যে সকল
প্রদেশে মুসলমান বিজেতৃগণের উৎপাত হয় নাই, তথায় উক্ত
বিজয়ী মুসলমান-ভীতি-প্রসূত নারীর অন্তরাল-অবস্থান-
প্রথা ও অজ্ঞতার মাত্রা তত অধিক নহে।”

মিশনারীদিগের সেই পুরাতন কাহিনী সকলেই গুনিয়া-
ছেন যে, হিন্দুমাতা সন্তানকে গঙ্গায় কুমীরের মুখে ফেলিয়া
দেয়। মাতা কুম্ভবর্ণা, তিনি একটি শুভ্র শিশুকে কোলে
লইয়া নিঃশব্দে এক প্রকাণ্ড কুমীরের আগমন প্রতীক্ষা
করিতেছেন,—এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী চিত্র বহু রবিবাসরীর বিদ্যা-
লয়ের পুস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছে। কোন কোন স্থানে দরিদ্রা
হিন্দু জননী মৃত শিশু-সন্তানের সংস্কারের ব্যয়বহনে অক্ষম
হইয়া, উহাকে নদী-তীরে প্রক্ষেপ করিয়া থাকে—সম্ভবতঃ
ঐ ঘটনা হইতে উক্ত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

ধর্ম্মধ্বজী খৃষ্টান মিশনারীদিগের ভারতকে খৃষ্টান করি-
বার প্রবল প্রয়াসই জগন্নাথের রথের গল্পের সৃষ্টির কারণ।
Sir M. M. Williams (সার মনিয়র মনিয়র উইলিয়মস্)
বলেন,—“জগন্নাথের রথের নীচে না কি লোকে আত্মহত্যা
করে, ইহা ব্যাকুল ভীতির সহিত উহা বর্ণনা করা মিশনারী-
দিগের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু মৃত্যু ঘটিলে, দুর্ঘটনা
বশতঃই ঘটে, কেন না, আত্মহত্যা তাহাদের শাস্ত্রের বাক্যার্থ
ও মর্ম্মার্থ উভয়েরই বিরোধী।—“Brahmanism and
Hinduism”

শিশুকন্যা-হত্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতা রমাবাসী নিজেই লিখিয়াছেন,—“যদিও শিশুকন্যা-হত্যা ধর্ম্মানুমোদিত নয় এবং বিবেকী লোক উহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন না—তথাপি ভারতের অমুক অমুক স্থানে সমাজ-সাধারণ উহা নীরবে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছে, কোনরূপ শাস্তি প্রদান করে নাই !—“High Caste Hindu Woman” P. 26.

পণ্ডিতা সম্ভবতঃ জানেন না যে, আমেরিকার (New York) নিউইয়র্ক এবং অগ্ন্যাগ্ন বড় বড় সহরের রাস্তা ও খালি জায়গায় প্রতিবৎসর কতগুলি জারজ শিশুর মৃতদেহ কুড়াইয়া পাওয়া যায়। ঐরূপ দুষ্টকারীদের সম্বন্ধে আমেরিকান সমাজ কি করে? ভারতে যত অগ্ন্যাগ্ন হয়, সকলই যদি ধর্ম্মের উপর আরোপ করা হয়, তাহা হইলে আমেরিকার ঐ সমস্ত পাপের বোঝা কি খৃষ্টান-ধর্ম্মেরই স্বন্ধে নিক্ষেপ করা সমভাবে যুক্তিযুক্ত হয় না?

উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-মহিলাগণ সাধারণতঃ নিজ মাতৃ-ভাষাতেই লেখা-পড়া শিক্ষা করেন, তবে তাঁহারা প্রকাশ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন না। হিন্দুধর্ম্মও স্ত্রী-শিক্ষায় বাধা প্রদান করেন না; বলেন, মাতাপিতা, ভ্রাতা এবং স্বামীর কর্তব্য কন্যা, ভগ্নী এবং স্ত্রীকে শিক্ষিতা করা। অতএব হিন্দুনারীদিগের মধ্যে যদি অজ্ঞতা বর্ত্তমান থাকে, তাহা তাহাদের ধর্ম্মের দোষ নয়,

মালাবার (Malabar) প্রদেশে সাত জন মহাকবির গৌরব করিয়া থাকে—তন্মধ্যে চারি জন নারী । তাঁহাদের এক জন (Avyar) যে নৈতিক ভাব-সমূহ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা “জীবনের ধ্রুবনীতি”-বোধে বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা দেওয়া হয় । মহিলা অক্ষশাস্ত্রজ্ঞা লীলাবতীর লেখা অত্যাপি হিন্দুদিগের দেশী বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তক ।

খৃষ্টান মিশনারিগণ প্রায়ই বলেন, স্ত্রীলোকের আত্মা নাই, তাহাদের মুক্তিও হইবে না—হিন্দুধর্ম না কি এইরূপ শিক্ষা দেয় । বিপরীত পক্ষে হিন্দুর প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ ঐরূপ নিদাক্ষণ মিথ্যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করে । যাহারা ভগবদগীতা অথবা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে আত্মার লিঙ্গালিঙ্গভেদ নাই ; আর স্ত্রী পুরুষ সকলেই, শীঘ্র বা বিলম্বে, ধর্ম্মের সেই পরমগতি—মুক্তি লাভ করিবে । ভারতবর্ষই নারীকে সর্বপ্রথম ধর্ম্মশিক্ষয়িত্রীর সম্মান দেয় । ভারতই সর্বপ্রথমে তাঁহাদের নিমিত্ত সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের অধিকার দেয় । যাহারা বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার পত্নী বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের সজ্জনায়িকা হইয়াছিলেন । আজও শত শত হিন্দু সন্ন্যাসিনী বিদ্যমান । হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করেন । হিন্দুগণ পবিত্র বিমল আধ্যাত্মিকজীবন-সম্পন্ন নারীকে কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করেন, উনবিংশ শতাব্দীর

সাধুশ্রেষ্ঠ হিন্দুমহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী তাহারই জীবন্ত আদর্শস্বরূপা হইয়া আছেন।

যাহা ভারত ভিন্ন অপর কোনও দেশে এমন দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত ও স্বীকৃত হয় নাই, অবশেষে শ্রীভগবানের সেই অপূর্ব মাতৃভাবের কথা অনুধ্যান করিলে, হিন্দুধর্মের নারীর স্থান কোথায়, তাহা স্পষ্টতর উপলব্ধি হইবে। ভারতে মাতার এতদূর সম্মান যে, হিন্দুগণ ভগবৎশক্তিকে পার্থিব মাতার রূপে না দেখিলে তৃপ্তিলাভ করেন না। তাঁহারা বলেন, “সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে”—এক মাতার গৌরব সহস্র পিতাপেক্ষাও অধিক। তাই হিন্দু সেই পরমাত্মাকে জগজ্জননী বলিতে ভালবাসেন। হিন্দুধর্ম্যানুসারে, প্রত্যেক স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা হউন, অল্পবয়স্কা হউন, এ জগতে সেই মহামায়ার প্রতিনিধিস্বরূপা। অগ্ন্যায়ু ধর্ম্মে যিনি “সৃষ্টিকর্তা”, মহামায়া তদপেক্ষাও মহান্। তিনিই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বা প্রজাপতিরও প্রসূতি। জগতে এমন আর কোনও দেশ নাই, যেথায় প্রত্যেক জীবিতা মাতা ব্রহ্মময়ীর অবতার বলিয়া পূজিতা হন। প্রতি গ্রামেই এমন এক একটি অধিষ্ঠাতৃদেবী আছেন, যিনি গ্রামবাসী সমস্তানাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাও ভারতের বৈশিষ্ট্য।

সর্বশক্তিমতী জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে হিন্দুসাধকের হৃদয় হইতে প্রতিদিন যে প্রার্থনা উথিত হয়, তাহা শ্রবণ করুন—

“বিষ্ণাঃ সমস্তান্তব দেবি ভেদাঃ

দ্বিম্নঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।

ত্বয়ৈকুয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যাপরা পরোক্তিঃ ॥”

—চণ্ডী ।

আত্মশক্তি জননি ! তুমি সকল স্তব-স্তুতির অতীত,
বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে তুমি ব্যাপ্ত । অনন্তজ্ঞানের আদিভূত
কারণ । তুমি মা, তোমা হইতেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি ।
তুমি প্রত্যেক নারীমূর্তিই আশ্রয় করিয়া আছ এবং নারীগণ এ
জগতে তোমারই প্রাণময়ী প্রতিমা ।

পরিশিষ্ট

ভারতবর্ষের শিক্ষা ও রাজনীতি

[১৯০৬—১৯২৮]

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের ইতিহাসের ধারা এক দ্রুতগতির পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। অতীত গৌরবের তুলনায় হঠাৎ প্রবাহিত সেই ধারা যখনই পথে রাজশক্তির স্তম্ভ প্রতিবন্ধকে প্রতিহত হয়, তখনই বিক্ষোভে ক্ষীত হইয়া ভীষণ আর্ন্তনাদ করিয়া দুকূল প্লাবনে স্বকীয় বিক্ষুব্ধ বেগ পর্য্যবসিত করে। তরুণ ভারত বুঝিতে পারিয়াছে, 'নিজ ভূমে সে পরবাসী' এবং মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা ও তাহার সফলতা সম্পাদনের জন্য বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র এবং তদানুযায়িক অগাধ উপকরণাদি তাহাকে লাভ করিতেই হইবে। কিন্তু রাজশক্তি তাহাতে সম্মত হইবার নহে। তাই অসহায় প্রজাশক্তির সহিত প্রবল রাজশক্তির প্রতি পাদক্ষেপেই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া নানা বিভাগে নানাবিধ আন্দোলন ও পরিবর্তনের সৃষ্টি করে। ইহাই উল্লিখিত সময়ের ইতিহাসের বিশিষ্ট ধারা। প্রথমতঃ আমরা শিক্ষা বিভাগে ঘাহা ঘাহা পরিবর্তন

সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া পরে রাজনৈতিক বিভাগীয় পরিবর্তনগুলির কথঞ্চিৎ আভাস পাঠকদিগকে দিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব ও তৎপ্রতীকারার্থ ইংরাজ-শাসনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা কেহ কেহ জগতের সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু গত দেড় শত বর্ষের ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অগ্ণাত্য দেশের তুলনায় বিদেশীয় শাসক-সম্প্রদায় ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে কিছুমাত্র সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ-ভারতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গণনাতে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি হাজারে মাত্র ৭২ জন লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে হাজারে ১ শত ১২ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী। বলা বাহুল্য, এই অতি সাধারণ শিক্ষালাভ ও জনসাধারণের চেষ্টার ফল। দেশীয় করদ ও মিত্ররাজ্যসমূহের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, বিদেশী শাসনতন্ত্র জনসাধারণের অজ্ঞতার জন্য কি পরিমাণে দায়ী। একমাত্র ব্রহ্মদেশ ভিন্ন (যেখানে ফুডি-চঙ বা প্রাচীন আমলের মন্দির-পাঠশালাতেই বহু লোকের সাধারণ শিক্ষালাভ হইয়া থাকে) ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের অন্তর্গত যে কোন প্রদেশ অপেক্ষা কতিপয় দেশীয় মিত্ররাজ্যের অর্থায়িতা প্রভৃতি নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা বেশী। ত্রিবাঙ্কুরে শতকরা

২৪ জন, বরোদাতে শতকরা ৭০'৫ ও মহীশূরে ১৬ জন লিখিতে ও পড়িতে পারে। আমেরিকাধিকৃত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৭০'৫ জন পুরুষ ও ৬১ জন নারী লিখনপঠনক্ষম ছিল। স্বাধীন জাপানে শতকরা ৯৮ জন পুরুষ ও ৯৬ জন নারী লিখিতে ও পড়িতে পারে। সুবিজ্ঞ ইংরাজ জাতির ১ শত ৫০ বৎসরের আন্তরিক চেষ্টার ফলে শিক্ষানুতিতে আজ ভারতের স্থান কোথায় !

স্থাপিত শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনা ও অগ্রাগ্র দিকে শিক্ষা-প্রসারের জন্য গবর্ণমেন্ট ১৯০৬-১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিন কোটি টাকা, ১৯১৬-১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ছয় কোটি ও ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে তের কোটি টাকা রাজস্ব হইতে ব্যয় করিয়াছেন। তথাপিও ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে সর্বসমেত শিক্ষা বাবদ ব্যয় গবর্ণমেন্টের মোট ব্যয়ের ৪৭'৯ অংশ মাত্র। কিন্তু দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সম্বলহীন জেলা বোর্ড প্রভৃতি হইতে শতকরা ১৩'১ টাকা, ছাত্র-বেতন হইতে ২২'৪ টাকা এবং অগ্রাগ্র দিক্ হইতে ১৬'৬ টাকা রাজকোষে সংগৃহীত করা হইয়াছে। ভারতীয় প্রজাবর্গ নানাপ্রকারে জন প্রতি ৫১/০ আনা রাজস্ব দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় করিয়া থাকেন জন প্রতি ৭/০ আনা মাত্র। বলা বাহুল্য, জাপানে শিক্ষার-জন্য জন প্রতি ব্যয় ৮ টাকা ও এমন কি, ডেনমার্কের মত যুরোপের একটি অতি ক্ষুদ্র দেশেও

আমাদের এই হতভাগ্য দেশে দেশীয় ও যুরোপীয় ছাত্রের
 স্কুল শিক্ষার বাবদ সরকার কর্তৃক জন প্রতি ব্যয়ের তারতম্য
 দেখিলে অতীব বিস্মিত হইতে হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী
 গবর্ণমেন্ট প্রতি বাঙ্গালী ছাত্রের জন্য ২৥৭/০ আনা এবং প্রতি
 যুরোপীয় ছাত্রের জন্য ১ শত ৩ টাকা চারি ১০ আনা ব্যয়
 করিয়াছেন ! আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ব্যয়িত
 অর্থ যথাযথ শিক্ষাপ্রদানকার্যে সম্যক ব্যয়িত হয় না, ইহার
 অধিকাংশই অধিকারী কুটীরবাসী গ্রাম্য ছাত্রদিগের প্রাসাদোপম
 ছাত্রাবাসাদি ও বিদ্যালয়ের জন্য অট্টালিকাদি নির্মাণকার্যে এবং
 বিদেশীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদিগের অত্যধিক
 বেতন প্রদানে ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে ।

এইরূপে শিক্ষার জন্য নির্ধারিত অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের
 বিভিন্ন শাখায় ভারতবাসীকে সুশিক্ষিত করিয়া ভারতের
 প্রকৃত কল্যাণসাধনের জন্য যথোপযুক্তভাবে বণ্টন করা হয়
 না। ভারত গবর্ণমেন্টের সংবাদবিতরণকর্তা মিঃ কোটম্যান
 বলেন, “শিল্পশিক্ষাও একপ্রকার অনাদৃত রহিয়াছে……।
 ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের সাড়ে ৮৭
 হাজার ছাত্রের মধ্যে ৭০ হাজার আর্ট ও সায়েন্স কলেজে
 এবং ৮ হাজার আইন অধ্যয়ন করিতেছে। মাত্র ৯ হাজার
 ৫ শত ছাত্র, চিকিৎসা-শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, বাণিজ্য-বিজ্ঞান ও
 শিক্ষকতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতেছে এবং মাত্র ৬ শত ৪১
 জন কৃষি, ১ শত ১৯ জন জীবন-রক্ষা ও ২ শত ৭২ জন

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা করিতেছে।* ফলে এই শিক্ষার দ্বারা দেশের অন্ন-সমস্যার অথবা বেকার-সমস্যার কোন প্রকার সমাধান হইতেছে না। সেই কারণে বর্তমানে এই শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের জন্ত দেশবাসীদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের সভায় মহামতি গোখলে দেশে অল্পপরিমাণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব করেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তখন অর্থভাবের অজুহাত দেখাইয়া তাহা গ্রহণ করিতে পরাধু্য হইলেন। তথাকথিত খরচ কমান সত্বেও কয়েক বৎসর পরে ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের শতকরা ২৮ টাকা সামরিক বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। কিছু দিন হইল, গণপ্রতিনিধিগণ আর্টটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই প্রদেশে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে বিহার ও উড়িষ্যা, মে মাসে বাঙ্গালার ও জুন মাসে যুক্তপ্রদেশে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে ও মাদ্রাজ প্রদেশে এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হয় এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশ নূতন

* India in 1926—27 by J. Coatman, Director of Public Information, Government of India.

শাসনতন্ত্রের কতকগুলি আইন-কানূনের সুযোগ লাভ করিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছে। সরকার প্রথমতঃ নানাবিধ কারণ দর্শাইয়া প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে স্থায়ী সামর্থ্যভাব ও অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু অতঃপর বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার ব্যয়ভার বর্তমানে ক্রমশঃ স্থানীয় জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির উপর হস্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন এবং তজ্জন্ত প্রদেশসমূহে বিশেষ শিক্ষা-কর ধার্য্য করিবার আয়োজনও করিতেছেন। মোটের উপর দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচারের প্রতি বর্তমানে বিশেষভাবে জনসাপারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা এষ্ট সময়ের এক বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে নূতন কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিবার প্রস্তাব পাশ করেন, কিন্তু দেশে তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতাবশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সার মাইকেল্ স্ট্রাডলার (লীডন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার)-এর সভাপতিত্বে স্ত্রার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার জীয়া উদ্দীন আহাম্মদ ও অপর চারি জন ইংলণ্ডদেশীয় সভ্য লইয়া 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠিত হয়। তাঁহারা নানা স্থান পরিভ্রমণ ও নানা কলেজ পরিদর্শন করিয়া ও রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দুই বৎসর পরে তাঁহাদের কমিশনের বিশাল রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। তখন (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে)

ভারতবর্ষে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তাহাদের প্রত্যেকের কলেজ ও ছাত্রসংখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল ; যথা—

বিশ্ববিদ্যালয়	কলেজ-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
কলিকাতা—	৫৮	২৮,৬১৮
মাদ্রাজ—	৫৩	১০,২১৬
বোম্বাই—	১৭	৮,০০৯
পাঞ্জাব—	২৪	৬,৫৫৮
এলাহাবাদ—	৩৩	৭,৮০৭

স্ট্রাডলার কমিশন যত্নবশত প্রকাশ করিলেন যে, বর্তমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বাষিক শ্রেণীর শিক্ষার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া বোর্ড (Board of Secondary and Intermediate Education) গঠিত করিতে হইবে, এবং কলেজের প্রথম দুই বৎসরের শিক্ষার পরিচালনা ও তাহার আয়-ব্যয়াদি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যভার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অপসারিত করিয়া সরকারের হস্তেই ন্যস্ত হইবে। তাহাদের মতে ইংরাজী ভাষাকে সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাবাহন-(medium) রূপে ব্যবহার করিলে চলিবে না, কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্য ও অক্ষশাস্ত্রের জ্ঞান ইংরাজী ভাষার সহায়তায় প্রদত্ত হইবে ; এতদ্বিন্ন অন্যান্য সমুদয় বিষয় মাতৃভাষাতেই পড়াইতে হইবে, বেতনাদি-বৃদ্ধি দ্বারা শিক্ষক-

সরকারের সাহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া তাঁহারা সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক কতকগুলি প্রস্তাব করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরস্পরের মধ্যে অধ্যাপক আদান-প্রদানের পরামর্শ দেন। উপরন্তু মুসলমানদিগের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষার কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহারা মোসলেম সভ্যতা আলোচনার জন্য ঢাকাতে এক বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত করিবার ব্যবস্থা দেন। অতঃপর সরকার শিক্ষকদিগের বেতন-বৃদ্ধি, শিক্ষার বাহন-ভাষা পরিবর্তন বা অধ্যাপক আদান-প্রদান প্রভৃতি কমিশনের সুচিত্তিত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত না করিয়া তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক প্রস্তাবগুলিই কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রাউলার কমিশনের জন্য এত অর্থব্যয় জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকাংশে দেশীয় খ্যাতনামা মনীষিগণের স্বাধীন মতানুসারে পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ প্রতিভা, সার রাসবিহারী ঘোষ ও সার তারকনাথ পালিতের বদান্যতা ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের সমবেত চেষ্টায় বি, এ উপাধির পর উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হাতেই অর্পিত হয়। তদবধি বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন, বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্রের উচ্চাঙ্গ শিক্ষা প্রদান করিয়া ও প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের মৌলিক গবেষণার সহায়তা করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার শ্রীম্পন্ন করিয়া

আসিতেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকারী এক নূতন আইনের ফলে গবর্ণর জেনারেলের পরিবর্তে বাঙ্গালার গবর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শতকরা ৮০ জন মনোনীত সভ্য লইয়া বাঙ্গালার সরকারী দপ্তরের অধীন হইয়া পড়ে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয় এবং ইহা কোন প্রকার মৌলিক গবেষণাদিতে কৃতিত্ব না দেখাইয়া কিংবা মোসলেম সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়াও সরকারী অর্থে দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতেছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অস্তিত্বের বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াও সরকারের চিরন্তন অর্থাতাবের জ্রুকুটি হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না।

অবশিষ্ট চারিটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এক আইনে পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের হাত হইতে তথাকথিত মুক্তিলাভ করিয়া স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী গঠিত হয়। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিজামের ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এক ফরমানের বলে গঠিত হয়। উর্দু এখানে শিক্ষার বাহন, কিন্তু ইংরাজী অবশ্য-পাঠ্য বিষয়। মহীশূরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে নূতন প্রণালীতে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গৌরব বিখ্যাত দার্শনিক শ্রীযুত ব্রজেননাথ শীল প্রথম হইতেই ইহার ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অপরিমিত উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টায় কানীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, শুধু শিক্ষা-পরিচালনা নহে। এই কয়েক বৎসরে ইহা হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্ররূপে জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, অধিকন্তু ইহার এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাচ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইতোমধ্যে আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সার সৈয়দ আহাম্মদের এংলো ওরিয়েণ্টাল স্কুলের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আগা খাঁর চেষ্টায় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা সংগৃহীত হয়, কিন্তু ভারতের অন্ত কোন স্থানের কলেজকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব ভারত-সচিব গ্রহণ করিলেন না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-সভা (কানী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত) শুধু আলিগড়ের কলেজ লইয়া সম্মুখে থাকিতে সম্মত হইলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এক তদন্ত সমিতি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দলাদলি নিবারণের জন্য অধিকতর যুরোপীয় অধ্যাপক ও পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন।

সকল শুদ্ধ ভারতবর্ষে আজ ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে ;—

পাটনা (১৯১৭), রেঙ্গুন (১৯২০), [বার্মানদিগের

আন্দোলনের ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এক নূতন নিয়মানুসারে জনসাধারণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন করিবার ক্ষমতা লাভ করে] ঢাকা (১৯২০), দিল্লী (১৯২২), [প্রাদেশিক গবর্ণ-মেন্টের পরিবর্তে ভারত গবর্ণমেন্টই ইহার পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন], নাগপুর (১৯২৩), অন্ধ্র (১৯২৬) । [তেলেগু ভাষাভাষীদিগের জন্য], ও আগ্রা (১৯২৬) । ২০ লক্ষ টাকার এক দানের উপর নির্ভর করিয়া একটি “আল্লাবাট” তামিল বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে । ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের অর্থ দ্বারা বাঁচিয়া আছে এবং অপর কয়েকটি শুধু সাধারণের দানের ভিত্তির উপর গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে । সরকারের প্রদত্ত মিশ্র শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিষ্ঠান অস্তিত্বলাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ‘শান্তি নিকেতন’ (বোলপুর), গুরুকুল ও সবর-মতির বিদ্যালয়ত্রয় এবং দক্ষিণাত্যে অধ্যাপক কার্ত্তের নারী-বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) বিশ্ব ব্যাপিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছে । ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন-সংস্কার আইনানু-সারে বর্ত্তমানে শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে । কিন্তু সরকার হইতে প্রয়োজনমত অর্থ না পাওয়ায় ও স্বকীয় চিন্তানুযায়ী স্বাধীনভাবে শিক্ষা-প্রচারের পশ্চাতে সরকারের আনুকূল্য না থাকায়, তাহারা অতি সামান্য কার্য্যই করিতে পারিয়াছেন । এতদ্ব্যতীত যুরোপীয়দিগের

দিয়াছেন এবং বস্তুতঃ এ দেশবাসীর শিক্ষার অর্থ দ্বারা বিদেশীয় ছাত্রেরাই জাঁকজমকের সহিত শিক্ষালাভ করিতেছে ।

ভারতের নেতৃবর্গ মনে করেন, বর্তমান শিক্ষা-সমস্যা দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার সহিত এমনই ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, স্বরাজলাভ ভিন্ন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার সম্পূর্ণ অসম্ভব । স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টার অসাকল্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বরাজ ভিন্ন এ বিষয়ে জাতীয় উন্নতিসাধনের আশা সুদূর-পর্যন্ত । সেই জন্য কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন, “শিক্ষা এখন থাকুক, আগে স্বরাজ লাভ করি, (Education may wait, but Swaraj cannot) । সুতরাং স্বরাজ লাভের জন্য এই কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশে কি চেষ্টা হইয়াছে, এবার তাহারই পর্যালোচনা করা যাউক ।

রাজনীতিক্ষেত্রে এই কয় বৎসরে ইতিহাস আপনার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছে । নব-জীবনের তোরণে এক মহাজাতির প্রগতি আমলাতন্ত্রের শাসনে নানা ভাবে নিতান্ত বাধা পাইয়াছে ; আমলাতন্ত্র ‘অসার খেলনা’ দিয়া একটা জাগ্রত জাতিকে ভুলাইতে চাহিয়াছেন ; স্বাধীনতার সৈনিকদল নানা ভাবে লাঞ্ছনা পাইয়াছেন এবং দমননীতির সহায়ক ‘বে-আইনি আইন’ ও কঠোর শাসনে একটা বিশাল জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু জাগ্রত ভারত কিছতেই নিরস্ত

সম্প্রদায় হিসাবে চাকুরী বিতরণ-প্রথা এই কয় বৎসরে পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভারতের গলে দৃঢ়তর করিয়াছে এবং এক দলী মেকদুগবিহীন খয়ের খাঁ অর্থ ও তথাকথিত সম্মানে প্রলুব্ধ হইয়া স্বাধীনতার সমরে জাতির প্রেরণাকে খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই এই সময়ের নিতান্ত শোচনীয় দৃশ্য ।

লর্ড কর্জেন তাঁহার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা আইনের জন্য লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করিয়া তিনি মুসলমানদের নূতন মুসলমান প্রদেশের লোভ দেখাইলেন এবং তাহারাই যে সরকারের “প্রিয়পাত্র” এ কথা জানাইলেন, তখন সারা বাঙ্গালার সঙ্গে মুক্ত ভারত এই অপমানের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া এমন করিয়া দাঁড়াইলেন যে, লর্ড কর্জেনের বৃথা আশ্বালন আকাশে মিলাইয়া গেল—বঙ্গভঙ্গ রদ হইল । ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ সার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলের এক বিরাট সভায় ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার বড়লাটের উপর অনাস্থাজনক প্রস্তাব পাশ হয় । ভারত-সচিবের বঙ্গভঙ্গে সম্মতির সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিল, এবং ৩০শে আশ্বিন সন ১৩১২ তারিখে রাথিবন্ধন উৎসবে জনসংখ্যের অভূতপূর্ব উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল । বিলাতী

নীতির নিন্দা করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে দাদাভাই নোরোজী সভাপতির অভিভাষণে স্বরাজের কথা উচ্চকণ্ঠে উল্লেখ করিলেন, তৎকালীন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যানের কথায় বলিলেন যে, “সু-শাসন কখনও স্বরাজের সমান হইতে পারে না।” সিপাহী-বিদ্রোহের পর প্রথমবার ভারত আবার অসন্তোষ ঘোষণা করিল। বঙ্গ ও মারাঠা তিলক ও অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এক হইয়া ভারতবর্ষে নব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিল। এ দিকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীরা ও গরমপন্থীরা পৃথক হইয়া গেলেন এবং পর বৎসরের কংগ্রেস হইতে বক্তৃতা ও আবেদন-নিবেদনের জন্য নরমপন্থীদের রাখিয়া, গরমপন্থীরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তরুণদল বাঙ্গালায় ‘যুগান্তর’ ও পুনায়ে ‘কেশরীর’ অনুপ্রেরণায় চরম বিদ্রোহের পথে গুপ্ত সমিতির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নিঃসমানুদত্তী সুগঠিত দলের ভারতে ও ভারতের বাহিরে গুপ্ত-হত্যার কাজ এক বিলাতী রাষ্ট্রবিদের মতে প্রতিভাশালী উচ্চ যুবকদের * লইয়া ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল এবং তিলক ও বাঙ্গালার ৬ জন নেতাকে তাঁহারা নির্বাসনে পাঠাইলেন।

ইহার পরেই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিন্টোমলি শাসন-সংস্কার আইন বে-সরকারী সভ্যদের ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক

সভায় প্রবেশের পথ খুলিয়াছিল ; এক জন ভারতীয়কে বড়লাটের পরিচালনা পরিষদে (Executive Council) ঢুকিতে দেওয়া হইল এবং বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে দুই জন ভারতীয়ের স্থান হইল । এই সামান্য, অনুদার সংস্কারে ভারতের জাতীয় দল মোটেই সন্তুষ্ট হইলেন না । স্মার ভালেণ্টাইন চিরলের কথায় মলি-সংস্কার শুধু ব্যবস্থাপক সভা-গুলিকে সামান্য নির্বাচনের প্রথা দ্বারা প্রসারিত করে এবং তাহাদের শুধু মত প্রদানের (যাহা গ্রহণ করিতে সরকারের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না) ক্ষমতা রাখিয়াও যে আলোচনা কংগ্রেসেই শুধু হইত, তাহার সুবিধা করিয়া দেয় । কিন্তু জাতীয় আন্দোলন থামিল না, কারণ, স্বাধীনতার প্রেরণা সহজে নিভে না । ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে মহা সমারোহে দরবার করিয়া সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে ভারতের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী করা হইল ; উদ্দেশ্য—লোকের মনে রাজভক্তির উদ্রেক করা । কিন্তু দিল্লীর সমারোহের সময় অর্দ্ধাহারী ভারত-বর্ষ ছুভিক্ষের অনাহারে জর্জরিত । সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ করিলেন, আসাম প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন এবং বিদ্রোহের কেন্দ্র কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী সরাইয়া লইয়া গেলেন । গরম-পন্থীদের ইহাতে কাজের জোর কমিল না । পরন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান নেতৃগণ মুসলীম লীগের প্রবর্তন করিয়া কংগ্রেসের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন । লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে

বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ অনেককে খুশী করিয়াছিল, এবং মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হইল, তখন ভারত সৈনিকরাই ফ্রান্সে যুদ্ধের প্রথম অগ্ন্যুৎসার বুক পাতিয়া লইয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড (তখন স্তার) সিংহ মহাশয় সাম্রাজ্যের বিপদে ভারতকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বাঁললেন, যেন অতঃপর ইংরাজের ধর্ম্যবুদ্ধি ভারতের গ্ৰায্য দাবী পূরণ করিতে পারে। বিপদের সময় মুসলমানদিগকে ইস্লামের ক্ষতিকর কিছু করা হইবে না—আশ্বাস দিয়া এবং ভারতকে অনেক আশার কথা বলিয়া, অন্য সমস্ত ইংরাজ উপনিবেশ বা প্রদেশের অপেক্ষা বেশী সৈন্ত ও অর্থ ভারত হইতে ইংলণ্ড পাঠিয়াছিল; কিন্তু বিপদের পর ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় নাই। এই সময় এক দল হিন্দু ও মুসলমান দেশপ্রেমিক আন্তর্জাতিক গণ্ডগোলের সুবিধা লইয়া অন্য দেশের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সরকার সন্ধান পাইয়া নূতন আইনের সাহায্যে বহু দেশপ্রেমিককে নির্বিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী আস্‌কুইথ বাঁলিলেন যে, “এখন হইতে ভারতীয় সমস্তকে নূতন চোখে দেখিতে হইবে।” ইহাতে প্রথমে আশান্বিত হইলেও যখন “নূতন চোখে” সমস্তার সমাধানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন তিলক তাঁহার “স্বরাজ” কাগজে এবং শ্রীমতী বেষেণ্ট তাঁহার “নিউ ইণ্ডিয়া” কাগজে স্বাধীনতা-সদৃশ আবেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে “কোমাগাতা মারু” জাহাজে এক ক্যানাডাপ্রবাসী শিখদলের কয় জন ফিরিয়া আসিয়া বজ্রবজ্রে পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গায় হতাহত হয় এবং এই ঘটনায় ভারতকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। এক বৎসরের ভিতর শ্রীমতী বেশেণ্টের স্বায়ত্ত-শাসন সভার Home Rule League পঞ্চাশটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। যুদ্ধে আর এক দিকে ইংরাজ সজাগ হইয়া উঠেন, শিল্প কমিশন যুদ্ধের সময় ভারতের পাট ও অন্যান্য জিনিস দিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগানর কাজ দেখিয়া বলেন যে, ভারত-বর্ষে যে শিল্প বিদেশীরা ইচ্ছা করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল, তাহা সরকারী চেষ্টায় বাঁচাইয়া তোলা দরকার; ইংলণ্ডও বুঝিতে পারে যে, ভারতের সামগ্রীর ব্যবহারের উপরই তাহার সাম্রাজ্য-শক্তির দৃঢ়তা নির্ভর করে এবং জাতীয় আন্দোলনের ফলে ভারত যেন শীঘ্র হাতছাড়া না হয়, তজ্জন্য ইংলণ্ড আর এক কিস্তি ‘সংস্কার’ দিয়া ভারতকে সুখী করিবার প্রয়াস পান।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ভারত-সচিব মর্টেমু পাল-মেন্টে বক্তৃতাতে বলেন যে, ভারতে ইংরাজশাসন-নীতি হইতেছে শুধু রাজ্য-শাসনের সকল বিভাগে ভারতীয়দের সুবিধা দেওয়া নহে, পরন্তু ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক অংশ হিসাবে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত-শাসনে শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে স্বরাজ-শাসনের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি নিজের ভারতে আসিয়া বড় লাঠি

করেন, তাঁহাদের প্রস্তাবমত আইন পার্লামেন্টে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে যখন উপস্থিত করা হয়, তখন শ্রীমতী বেশেণ্ট বলেন যে, “ভারতের জন্ত চিরন্তন দাসত্ব শুধু বিদ্রোহেই যাহার অবসান সম্ভব” এমন ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাতী পার্লামেন্টের দুই সভার দ্বারা অদল-বদলের পর আইন হইয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এক “ডু ইয়ার্কি” বা দ্বৈরাজ্য-শাসন আনিয়া দিল, তাহাতে প্রদেশগুলিতে শিক্ষা স্বাস্থ্য, জিলা বোর্ড ইউনিয়নে তদ্বির প্রভৃতি বিষয় ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; কিন্তু অর্থ বিষয়ে এক দল সরকারী ও সরকার-মনোনীত সদস্যের ভোটের দড়া-দড়ী দিয়া এই মন্ত্রীদিগকে এমন ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইল, যেন তাঁহারা সরকারের লুকুম তামিল ছাড়া বেশী নড়া-চড়া না করিতে পারেন। যদিও মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট বিশদভাবে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের বিষফলের কথা বলিয়াছেন, তবুও নূতন আইনে ঐ বিষয়ই ভারতের দেহে ছড়ান হইয়াছে। ইহার ফলে গত কয়েক বৎসরে এক দল স্বার্থান্ধ চাকুরী-মোহাচ্ছন্ন লোক বিদ্রোহ-বহি ছড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি করিয়া ভারতকে হীন করিয়াছে। নূতন সংস্কার আইন কাউন্সিল অব ষ্টেট, লেজিস্লেটিভ এসেমব্লি ও চেম্বার অব প্রিন্সেস নামে যে তিন সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখানে সরকার গলাবাজির সুবিধাই দিয়াছেন; কারণ, যখনই এই সভাগুলির প্রস্তাব গভর্ণমেন্টের সুবিধাজনক হয় নাই, তখনই বড় লাট তাঁহা এক কলমের খোঁচায় রদ করিয়া

দিয়াছেন। আর ব্রিটিশ ভারতের ২৫ কোটি লোকের ভিতর
 • মাত্র ৭৪ লক্ষ লোক প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা পাইয়াছেন।
 এই আইন পাশের সঙ্গে সরকার রাউলার্ট কমিটী নামক বিদ্রোহ
 তদন্তের এক কমিটীর প্রস্তাবমত দুইটি আইন করেন, যাহাতে
 বিনা বিচারে গভর্ণমেন্ট যাহাকে ইচ্ছা অনির্দিষ্ট কালের জন্য
 (interned) আটক করিয়া রাখিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী
 এই সময় তাঁহার সত্যাগ্রহ মন্ত্র লইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকায় অপূর্ব
 শক্তি দেখাইয়া ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল এই দীক্ষা লইবার দিন ধার্য
 হয় এবং রাজনৈতিক সমস্তা আলোচনার জন্য শিখ উৎসবের
 দিনে আহৃত জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত এক নিরস্ত্র জন-
 সঙ্ঘকে ইংরাজের এক জন সেনাপতি জেনারেল ডায়ার ভাল
 লক্ষ্যস্থল মনে করিয়া গুলী করিয়া নৃশংসভাবে (সরকারী হিসাবে)
 ৩ শত ৭৯ জনকে খুন এবং ১ হাজার ২ শত জনকে জখম করেন।
 শুধু তাহাই নহে, তাহাদের কোন ডাক্তারের সাহায্য দিয়ার
 দরকারও মনে করেন নাই। তাহার পর পাঞ্জাবের নর-নারীর
 উপর যে অনাচার আচরণ করা হয়, তাহা ভারত কখনও
 ভুলিতে পারিবে না। সরকারের তদন্ত-সমিতি অবশ্য ডায়ারের
 কার্যের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এক মান-
 হানির মোকদ্দমায় (Tilak Vs. Chirol) এক বিলাতী জজ
 ডায়ারকে সমর্থন করেন, যদিও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা আবার তাঁহার

হইয়াছিল, তাহার প্রতীকার কখনও হয় নাই। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ, চুনকা শাসন-সংস্কার এবং খালিফতের উপর অত্যাচার ভারতকে আবার মহাত্মার নেতৃত্বে স্বরাজের জন্ত পাগল করিয়া তোলে। ইংরাজের আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং কাপড় বর্জন ও স্বদেশী চরকা-মন্ত্র গ্রহণ এই চারি মন্ত্র লইয়া মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং লাল লজপত রায় প্রভৃতির প্রবর্তিত অসহযোগ ভারতে এমন আন্দোলন সৃষ্টি করিল যে, সরকার এক গোল-বৈঠক ডাকিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু নেতারা তাহা গ্রহণ না করিয়া আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ করিবার জন্ত যখন দেশকে তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছেন, এমন সময় মহাত্মা গান্ধী চৌরিচৌরার দাঙ্গার সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া বার্দোলী আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধের প্রথম প্রচেষ্টাকে বন্ধ করিয়া দেন। কিছু কাল পরেই তাঁহাকে ৬ বৎসরের জন্ত জেলে পাঠানো হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ছোট বড় বহু চেলা সরকারের দণ্ডনীতির কল্যাণে তাঁহার পূর্বেই বন্দী হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রাজ-ভাতা ডিউক অব কনট যখন দিল্লীর তিন সভার দ্বারোদ্বাটন করেন, তখন দিল্লীর পথ জনহীন এবং বহু দিল্লীবাসী ৬ মাইল দূরে মহাত্মার বাগী গুনিতেছে। নির্জন রাজধানীতে রাজপিতৃব্য তাঁহার বক্তৃতা সমাপন করেন। তৎপরে ইংরাজ যুবরাজ এ দেশে জনগণের অভ্যর্থনা না পাইয়াই ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন।

প্রথম তিন বৎসর কোন অসহযোগী সংস্কারদত্ত সভাগুলিতে
 যান নাই। এক দল স্বার্থান্ধ অথচ অদূরদর্শী লোক লইয়া
 যন্ত্রের মত এই সভাগুলি সরকারের কথামত এই কয় বৎসর
 চালিত হয়, কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও
 পণ্ডিত নেহেরু গভর্ণমেণ্টের সভাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া
 অবিরত বাধা প্রদান ও বাহিরে দেশকে স্বরাজ অভিযানের
 জন্য প্রস্তুত করার প্রস্তাব লইয়া কংগ্রেসকে স্বরাজ্যদলের
 কর্মপদ্ধতিতে রাজী করাইয়া লন। দেশ উৎসাহের
 সহিত তাঁহাদের কথামত কাজ করে এবং এসেমব্লী ও
 বিশেষতঃ বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক
 সভায় সরকার, নির্বাচিত প্রতিনিধির সহিত যুদ্ধে বার
 বার হারিয়া গিয়া দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতের
 বিরুদ্ধে আপনার মত বহান রাখিয়া সংস্কারের অলীকতা
 দেখাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মূডি-
 ম্যান সংস্কার তদন্ত কমিটিতে যে সব মন্ত্রীরা লোকমতের
 বিরুদ্ধে সংস্কার শাসনে কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে
 স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, শুধু যে মেকী সংস্কারের ব্যবস্থায় কোন
 কাজ অসম্ভব, তাহা নহে, সরকার স্বায়ত্ত-শাসন দিবার নাম
 করিয়া নিজ হাতে আরও বেশী ক্ষমতা লইয়াছেন ; কেন না,
 সাধারণতঃ গভর্ণররা তাঁহাদের পরিচালন সভা (Executive
 Committee) মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারেন না, কিন্তু

এক কলমেব পৌঁছায় তাঁহারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বৈচ্ছাচারীদের মত কাজ করিবার ক্ষমতা সংস্কার আইন অনুসারে পাইয়াছেন। স্বরাজ্যদলের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস হইতে, কংগ্রেস আবার জোরে দেশে তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতেছে এবং কিছুকাল হইল, বার্দোলী তালুকে আবার ট্যাক্স অনাদায়ের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে অনেকবার অনেক উপায়ে বন্ধুত্ব রক্ষার সুবিধা দিয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডের নির্বুদ্ধিতা ও দণ্ডনীতি ভারতের বন্ধুভাব হরণ করিয়া লইয়াছে। বিশেষ করিয়া সরকার বিনা বিচারে বাঙ্গালার প্রায় ২ শত স্বদেশ-প্রেমিককে আটক করিয়া রাখিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া দিয়া গত কয়েক বৎসরে ভারতের ঘরে ঘরে এবং যুবকদের ভিতর এক বিতৃষ্ণা জাগাইয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে সে দিন সাত জন পার্লামেন্টের খেতাব সভ্যকে ভারতের স্বাধীনতাসনের যোগ্যতা বিচার করিতে পাঠাইয়া ভারতকে যে অপমান করিয়াছে—এই সকলের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বদল কংগ্রেসের পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু যে এই কমিশন কংগ্রেস চাহে না, তাহা নহে, কংগ্রেস ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্ত আর ইংরাজ সৈন্যদল ভারতে রাখিতে চাহে না; ভারতবর্ষের উন্নতির জন্ত ইংরাজের শাসন ও ইংরাজবণিকের শোষণ চায় না; দাস-তৈয়ারীর কলস্বরূপ শিক্ষা চাহে না। কংগ্রেস ইংরাজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত

গোরা সৈন্তের পিছনে বার্ষিক ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চাহে না ; যে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ইংরাজ এঞ্জিনিয়ার * বলিতে বাধ্য হন যে, গভর্ণমেন্ট দায়িত্বজ্ঞানশূন্য কাজ করিয়া অসংলগ্ন ব্যবস্থার দ্বারা ম্যালেরিয়া ও মৃত্যুতে দেশকে ছারখার করিয়া দিতেছে, সে জলসেচের জন্য ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চায় না এবং যে রেলওয়ে নীতির ফলে ভারতকে অনাহারী করিয়া ভারতের সামগ্রী বিদেশে সহজে যাইতে পারে এবং বহু শ্বেতাঙ্গ ভারতের অন্তে পুষ্ট হইয়া ভারতীয় যাত্রীর অপমান এবং ভারতীয় ব্যবসায়ের ক্ষতিসাধন করিতে পারে, সেই রেলের পিছনে কংগ্রেস ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চাহে না ; যে জাতি-সঙ্ঘের (League of Nations) সভার শতকরা ৬ শত ৬০ খরচ দিয়াও নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা পায় নাই এবং ইংলণ্ডের অধিক খাজনা দিয়াও লীগের আফিসে—যেখানে ইংলণ্ড ইংরাজের জন্য ২ শত ১৭টি চাকুরী আদায় করিয়াছে ও ভারতীয়দের জন্য মাত্র ২টি পাইয়াছে, কংগ্রেস ভারতকে সে জাতি-সঙ্ঘের সভ্য হইতে দিতে চাহে না ; এক কথায়—জাগ্রত ভারত স্বরাজ চাহিতেছে । তাই গত মাদ্রাজ কংগ্রেস (১৯২৭) সঙ্কল্প করিয়াছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতালাভই ভারতের লক্ষ্য ।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেস যে উদ্দেশ্যকে কংগ্রেসের বলিয়া

* Sir William Willcocks at the British Indian

নির্ধারিত করে, তাহা এই—“যে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার উদ্দেশ্য হইতেছে, ভারতীয়দের দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনপ্রাপ্ত প্রদেশগুলির ত্রায় শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয়দের সুবিধা ও দায়িত্বে সেই প্রদেশগুলির সমান অধিকার ভোগ, এই উদ্দেশ্য আইনসম্মতমতে বর্তমান শাসন-যন্ত্রের ক্রমিক সংস্কারসাধন করাইয়া, জাতীয় একত্বসাধন করিয়া, গণবুদ্ধি প্রবোধিত করিয়া এবং দেশের মানসিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্পের উন্নতিসাধন করিয়া সফল করিতে হইবে ;” ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আরও সংক্ষেপে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য “ভারতবাসী দ্বারা সকল বৈধ এবং শান্তিসম্মত উপায় স্বরাজলাভ বলিয়া” মানিয়া লন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস বলিয়াছেন যে, “পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতালাভই ভারতবাসীর উদ্দেশ্য।”

আজ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সকল দল সাইমন কমিশন বর্জনের উপলক্ষে একত্র হইয়া স্বরাজ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অধিনায়কত্বে সর্বদল-সম্মেলন (মে, ১৯২৮) লক্ষ্যোতে ভারতের ন্যূনতম দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। জগতের সকল ত্রায়শক্তি এই স্বাধীনতা-সমরে ভারতের চতুর্দিকে একত্র হউক, যেন স্বাধীন ভারত দৃপ্তভাবে শীঘ্রই তাহার বাণী জগৎ-সভায় প্রচার করিতে সমর্থ হয়।